লোহাগাড়ার
ইতিহাস ও ঐতিহ্য

মোহাম্মদ ইলিয়াছ

লোহাগাড়ার
ইতিহাস ও ঐতিহ্য

Chunati.com
Pioneer in village based website

লেখক

মোহাম্মদ ইলিয়াছ
সহযোগী অধ্যাপক
আলহাজ্ব মোস্তফিজুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
মোবাইল: ০১৭১৬-৮২৩৫৯০
ই-মেইল: milias08@gmail.com

যে বিদ্যার্থী জ্ঞানান্বেষণে গৃহ থেকে বহির্গত হয়, আল্লাহ তা'য়ালা বেহেশতে তাঁকে একটি উচ্চ আসন প্রদান করবেন। তাঁর প্রতি পদক্ষেপই আনন্দময়, তার প্রত্যেকটি নতুন শিক্ষার জন্য পুরষ্কার আছে।

– বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)

Chunati.com
Pioneer in village based website

লোহাগাড়ার
ইতিহাস ও ঐতিহ্য

Chunati.com
Pioneer in village based website

প্রকাশক

মোহাম্মদ ফিজনূর রহমান
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
মোবাইল: ০১৮৫১-৮২৬১৫৩
ই-মেইল: rfiznur@gmail.com

লোহাগাড়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য

সার্বিক তত্ত্বাবধান

এম আজিজুল হক

দারোগা পাড়া, চুনতি, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

sanimgroup@gmail.com

পরিকল্পনা

ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ ইউসুফ

চেয়ারম্যান, নক্‌শা ইঞ্জিনিয়ারিং

লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

প্রকাশকাল

অক্টোবর ২০১৫

গ্রন্থস্বত্ব

প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

কম্পিউটার কম্পোজ

মোঃ নাছির উদ্দীন মুন্না

জননী কম্পিউটার

লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

মুদ্রণে

সার্ভার স্টেশন

আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

শুভেচ্ছা মূল্য

দুইশত পঞ্চাশ টাকা

তথ্য সংগ্রহে সহযোগিতা

যাঁরা বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের কাছে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

১. **মোহাম্মদ ইউছুফ**, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ, সৌদিয়া পরিবহন।

২. **সাত্তার সিকদার**, মানবাধিকার কর্মী ও সাংবাদিক, কলাউজান, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

৩. **তুষার কান্তি বড়ুয়া**, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উজ্জীবন।

৪. **মো: মিজানুর রহমান,** এনায়েত উকিল বাড়ী, চুনতি, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

৫. **বেলাল উদ্দীন চৌধুরী**
শিক্ষার্থী (আইন বিভাগ), প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।

Chunati.com Pioneer in village based website

লেখকের কথা

ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাক্ষী চট্টগ্রামের লোহাগাড়া। ঐতিহাসিক এ এলাকাটি আরাকান, ত্রিপুরা, মোঘল, আরমেনীয়, পর্তুগীজ ও ইংরেজসহ বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর শাসনে ছিল। এখানে আগমন ঘটেছে বহু সুফী-সাধকের। কিন্তু কালের পরিক্রমায় আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে অঞ্চলটির অনেক অজানা কথা। এ অজানা কথাকে জানার জন্য প্রয়োজন হয় অনুসন্ধানী দৃষ্টি। খুঁজে নিতে হয় ইতিহাস। একদিন সে ইতিহাস আপন মহিমায় উঠে আসে সমাজের খোলা জানালায়।

অবিভক্ত সাতকানিয়ার এ লোহাগাড়া ১৯৮১ সালের ২০ মে আলাদা থানায় রূপান্তরিত হয়। ১৯৮৫ সালে উন্নীত হয় উপজেলায়। ফলে ইতিহাস, ঐতিহ্য ও কিংবদন্তীর বিভিন্ন নিদর্শন বিচার-বিশ্লেষণ করে **"লোহাগাড়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য"** শীর্ষক একটি গ্রন্থ বের করার আমার প্রবল আশা-আকাঙ্খা ছিল দীর্ঘদিনের। অবশেষে সে আশা বাস্তবে পরিণত হল। দীর্ঘ এক বছরের প্রচেষ্টার ফল আমার লেখা **"লোহাগাড়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য"** গ্রন্থ। তথ্য-উপাত্ত ও শব্দ বিন্যাসের ভিত্তিতে মননশীলতার মাধ্যমে গ্রন্থটিকে সাজানো হয়েছে। নেয়া হয়েছে ইতিহাস সম্পর্কিত বিভিন্ন বই, লেখক ও গবেষকদের সহযোগিতা। উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের অফিসার, উপজেলার ৯টি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পরামর্শ নেয়া হয়েছে। তথ্য সংগ্রহে আমি উপজেলার গ্রাম-পাড়া ও জনপদে ঘুরেছি। আশা করি, গ্রন্থটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। পাঠক প্রিয় হবে। আগামী প্রজন্মসহ সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে।

একটি গ্রন্থ প্রকাশ করা দুরূহ ব্যাপার। অফুরন্ত কর্মব্যস্ততার মাঝেও অসময়কে সময়ের মূল্য দিয়ে গ্রন্থটি প্রকাশ করা হয়েছে। মেধা, শ্রম, অর্থ ও আন্তরিকতার ঘাটতি ছিল না গ্রন্থটি প্রকাশের ক্ষেত্রে। গ্রন্থটি প্রকাশে আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ ফিজনূর রহমান। সাহস ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন অনেকেই। তাঁদের প্রতি থাকছে আমার আন্তরিকতা ও সীমাহীন কৃতজ্ঞতা।

"লোহাগাড়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য" গ্রন্থটি প্রথম সংস্করণ। ফলে গ্রন্থটি পড়ে অনেকের বুঝার দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন হতে পারে। কেননা ইতিহাসে কোন কথার শেষ নেই। আজ যা সিদ্ধান্ত করা হয়, নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হলেই হয়তো তা পুনর্বিবেচিত হতে পারে। সঠিক তথ্য পেলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের প্রত্যয় ব্যক্ত করছি। অপর দিকে, শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এ গ্রন্থে তথ্য-উপাত্তসহ অনেক বিষয়ে অপূর্ণতার অবকাশ থাকতে পারে। ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য পাঠকদের প্রতি অনুরোধ রইল। তাই বলি, সফলতা পাঠকের, বিফলতা আমার।

বিনীত-

তারিখ: লোহাগাড়া
অক্টোবর, ২০১৫

(মোহাম্মদ ইলিয়াছ)
০১৭১৬-৮২৩৫৯০

প্রকাশকের কথা

চট্টগ্রাম জেলার সর্বদক্ষিণের উপজেলা লোহাগাড়া। ভূ-প্রাকৃতিকভাবে অঞ্চলটি পাহাড়ি অঞ্চল ও পাহাড়তলীয় পললভূমিতে বিভক্ত। ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ুর অন্তর্গত অঞ্চলটিতে নয়টি ইউনিয়ন ও তেতাল্লিশটি গ্রাম রয়েছে। ১৯৮১ সালের ২০শে মে সাতকানিয়া থেকে বিভক্ত হয়ে আলাদা থানায় পরিণত হয়। ১৯৮৫ সালে উন্নীত হয় উপজেলায়। এলাকাটি ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের আকরভূমি। ইতিহাসের নানা বাঁকে এ এলাকার অবদান অনস্বীকার্য। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আর ভৌগলিক অবস্থান লোহাগাড়া উপজেলাকে ভিন্ন সত্ত্বা দান করেছে। সময়ের পরিক্রমায় এগিয়ে চলা। এই জনপদ সমৃদ্ধ হয়েছে ইতিহাস পর্যালোচনার মধ্যে দিয়ে।

লোহাগাড়া অঞ্চলের ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। একটি অঞ্চলের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সন্ধান অত্যন্ত কঠিন কাজ। লোহাগাড়া অঞ্চলের আনাচে-কানাচে এখনো আছে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর নানান প্রাচীন স্থাপনা ও ঐতিহ্য। অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা প্রাচীন স্থাপত্যগুলো থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিভিন্ন লেখকের বইয়ের সহযোগিতায় **"লোহাগাড়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য"** নামক একটি বই প্রকাশ হয়েছে। বইটির লেখক লোহাগাড়া উপজেলা সদরস্থ আলহাজ মোস্তফিজুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ ইলিয়াছ। লেখক বইটি প্রস্তুতকরণে তথ্য-উপাত্ত ও তাঁর স্বীয় গবেষণাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আমার মনে হয়, লোহাগাড়ার ইতিহাসে এটি সর্বপ্রথম এ অঞ্চলের ইতিহাস সম্পর্কিত বই।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে লোহাগাড়া অঞ্চলের ইতিহাস ও ঐতিহ্য তুলে আনা অত্যন্ত ব্যয় বহুল কাজ। লেখক মূল্যবান সময় ব্যয় করে নিরলস পরিশ্রমে তাঁর লেখনির মাধ্যমে বইটি লিখেছেন। অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। এজন্য আমি তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বইটি প্রকাশে যাঁরা বিভিন্নভাবে তথ্য-উপাত্ত এবং অন্যান্যভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। **"লোহাগাড়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য"** বইটি আগামী প্রজন্মের কাছে শিক্ষনীয় হবে। ইতিহাসের পাতায় বইটি মাইলফলক হয়ে থাকবে। পাঠক প্রিয় হবে। **"লোহাগাড়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য"** নামক বইটি প্রথম সংস্ককরণ। বইটির সকল তথ্য-উপাত্ত ও শব্দ বিন্যাস প্রকাশক সংরক্ষণ ও সংশোধন করার অধিকার রাখে। এ গ্রন্থে কোন তথ্য অপূর্ণতা থাকলে সঠিক তথ্য পেলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের প্রচেষ্টা থাকবে।

আশা করি, **"লোহাগাড়া ইতিহাস ও ঐতিহ্য"** নামক বইটি পাঠক, লেখকসহ সর্বমহলের কাছে চেতনা সৃষ্টিসহ নতুনভাবে চিন্তা করার ক্ষেত্র সৃষ্টি করবে।

(মোহাম্মদ ফিজনূর রহমান)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

লোহাগাড়ার মানচিত্র

লোহাগাড়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য
মোহাম্মদ ইলিয়াছ

উৎসর্গ

আমার শ্রদ্ধাভাজন পিতা
মরহুম মাওলানা মোজাহেরুল হক
এর স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা নং-

প্রথম অধ্যায়: ১২-২১

প্রসঙ্গ- কথা- প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী এমপি, প্রফেসর ড. মুঈনুদ্দীন আহমদ খান, প্রফেসর ড. শব্বির আহমদ, প্রফেসর ড. সুকোমল বড়ুয়া, ঐতিহাসিক লোহাগাড়া, এক নজরে লোহাগাড়া উপজেলা।

দ্বিতীয় অধ্যায়: ২২-৩৪

প্রাচীন কথা, পরিষদ ও সভা, পরিবার ও বিবাহের বিভিন্ন রীতি, বিজ্ঞান, কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, স্থাপত্য শিল্প, নাটক ও সাহিত্য এবং চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি।

তৃতীয় অধ্যায়: ৩৫-৪৪

লোহাগাড়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং লোহাগাড়া থানা ও উপজেলা প্রতিষ্ঠার ইতিহাস।

চতুর্থ অধ্যায়: ৪৫-৫২

উপজেলার ইউনিয়নের নামকরণের ইতিহাস- বড়হাতিয়া ইউনিয়ন, আমিরাবাদ ইউনিয়ন, পদুয়া ইউনিয়ন, চরম্বা ইউনিয়ন, কলাউজান ইউনিয়ন, লোহাগাড়া ইউনিয়ন, পুটিবিলা ইউনিয়ন, চুনতি ইউনিয়ন ও আধুনগর ইউনিয়ন।

পঞ্চম অধ্যায়: ৫৩-৬১

উপজেলার কিছু প্রাচীন স্থাপত্য ও নিদর্শন-মোহাম্মদ খান ছিদ্দিকী (রহ.) নায়েবে উজির জামে মসজিদ, খাঁ'র মসজিদ, ছোট ও বড় মিয়াজি জামে মসজিদ, চুনতি আউলিয়া মসজিদ, খাঁ'র দিঘী, মুলুক শাহ দিঘী, লোহার দিঘী, মগ দিঘী, মছদিয়া জ্ঞান বিকাশ বিহার, ঠাকুর পাহাড় ও ঠাকুর বিহার, মগধেশ্বরী মন্দির, কংসদিঘী, রাজারখিল, মগকাটা পুকুর, লক্ষীজনার্দ্দন মন্দির, সুখছড়ী কালী মন্দির ও রাস মহোৎসব এবং গাব গাছ।

ষষ্ঠ অধ্যায়: ৬২-৭৪

উপজেলার কিছু প্রাচীন জনপদ- গৌড়স্থান, রাজঘাটা, সুখছড়ী, হাজারবিঘা, উজিরভিটা, কিল্লার আন্দর, মছদিয়া , নারিশ্চা, ইয়াছিন পাড়া, কুশাঙ্গের পাড়া ও হাদুর পাড়া, হাজীর রাস্তা, মল্লিক ছোবহান, আরকান সড়ক, চুনতি ঈদগাহ পাহাড় ও শাহ সুজা, সুফী মিয়াজী পাড়া, ইউসুফ মৌলভী পাড়া, আখতারাবাদ, বড় মাওলানা পাড়া, ডেপুটি পাড়া, মুন্সেফ পাড়া, শুকুর আলী মুন্সেফ ও মুন্সেফ বাজার, কাজীর ডেবা ও জান মোহাম্মদ সিকদার পাড়া এবং মোহাম্মদ খান নায়েবে উজির।

পৃষ্ঠা নং-

সপ্তম অধ্যায়: ৭৫-৭৭
উপজেলার অন্যান্য প্রসঙ্গ, লোহাগাড়ার অবস্থান ও আয়তন, প্রশাসনিক কাঠামো, যাতায়াত ব্যবস্থা, জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি ও সেচ ব্যবস্থা।

অষ্টম অধ্যায়: ৭৮-৯২
ইউনিয়ন ভিত্তিক মৌজার নাম ও আয়তন, জনসংখ্যা ও ভোটার, লোহাগাড়ার আদি পরিবার, উপজেলার কিছু ঐতিহ্যবাহী পরিবার- মিয়াজী পরিবার, সিকদার পরিবার, কাজী পরিবার, ছিদ্দিকী পরিবার, ডেপুটি পরিবার, শুকুর আলী মুন্সেফ পরিবার, ইউসুফ মৌলভী পরিবার, দারোগা পরিবার। আঞ্চলিক ভাষা ও পীর আউলিয়ার দেশ।

নবম অধ্যায়: ৯৩-৯৮
মুক্তিযুদ্ধে লোহাগাড়া, মুক্তিযোদ্ধা ঘাঁটির স্মৃতিসৌধ, মুক্তিযুদ্ধের বিজয় মেলা, স্মৃতিসৌধ ও শহীদ মিনার।

দশম অধ্যায়: ৯৯-১০৪
শিক্ষা ক্ষেত্রে লোহাগাড়া, নারী শিক্ষা, লোহাগাড়ার ক্রীড়াঙ্গন, অর্থনৈতিক জোন লোহাগাড়া- কৃষি জমি, পানি ও মৎস্য সম্পদ, যুব কার্যক্রম, পেশা, অভিবাসন, হাট-বাজার, বিদ্যুৎ, প্রাণি সম্পদ, কুটির শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, মানব সম্পদ, জনপ্রতিনিধি (সংসদ সদস্য) ও উপজেলা চেয়ারম্যান।

একাদশ অধ্যায়: ১০৫-১১৭
উপজেলার বৌদ্ধ জনপদ ও ঐতিহ্য, ভৌগলিক ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যমন্ডিত অঞ্চল লোহাগাড়া, খাল ও ছড়ার দেশ লোহাগাড়া, কৃষির দেশ লোহাগাড়া, উপজেলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, প্রাকৃতিক গবেষণা কেন্দ্র, প্রাকৃতিক সম্পদ, চুনতি বন্যপ্রাণি অভয়ারণ্য, পদুয়া ফরেষ্ট রেঞ্জ, চুনতি- ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাক্ষী এবং সংবাদপত্রে লোহাগাড়া।

দ্বাদশ অধ্যায়: ১১৮-১৪৫
লোহাগাড়ার পীর আউলিয়া- হযরত শাহপীর (রহ.), হযরত দরবেশ শাহ (রহ.), হযরত মাওলানা আব্দুল হাকিম (রহ.), হযরত সুফী সৈয়দ ফতেহ আলী ওয়াইসী (রহ.), হযরত সুফী সৈয়দ আবু মুছা কলিমুল্লাহ (রহ.), মাওলানা শাহ আতাউল্লাহ হোসাইনী (রহ.), আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.), আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ মুফাদ্দলুর রহমান (রহ.), হযরত শাহ ছুফি পেঠান শাহ (রহ.), হযরত মাওলানা শাহ হাফেজ আহমদ (রহ.), হযরত আল্লামা শাহ মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.), মাওলানা শাহ হাবিব আহমদ (রহ.)।

পৃষ্ঠা নং-

লোহাগাড়ার হযরত আজমগড়ী (রহ.)'র খলিফাগণ- হযরত মাওলানা ফজলুল হক (রাহ.) ও হযরত মাওলানা নজির আহমদ (রহ.)। শাহ সুফী মাওলানা মোহাম্মদ কুতুব উদ্দীন, হযরত মাওলানা মোহাম্মদুর রহমান (রহ.) এবং হযরত শাহপীর (রহ.) ও হযরত পেঠান শাহ (রহ.) স্মরণে মরমী গান।

ত্রয়োদশ অধ্যায়: ১৪৬-১৪৯

সেক্টর কমান্ডার শহীদ মেজর নাজমুল হক, লোহাগাড়ায় বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের কয়েকজন ব্যক্তিত্ব এবং কবি সুফিয়া কামাল ও তাঁর চুনতির বংশধর।

চতুর্দশ অধ্যায়: ১৫০-১৫৩

প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান- চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা ও দক্ষিণ সাতকানিয়া গোলামবারী মডেল উচ্চ বিদ্যালয়।

পঞ্চদশ অধ্যায়: ১৫৪-১৫৯

সফল ব্যাক্তিত্ব- আলহাজ্ব মোস্তাফিজুর রহমান সওদাগর, আলহাজ্ব মো: নুরুল ইসলাম, মেজর জেনারেল মিয়া মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন বীরবিক্রম-পিএসসি ও শিল্পী হালিমা খান (বেলা খান)।

ষোড়শ অধ্যায়: ১৬০-১৬১

চুনতি ডট কম ও সহায়ক গ্রন্থ।

সপ্তদশ অধ্যায়: ১৬২-১৮৪

চিত্রে লোহাগাড়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রথম অধ্যায়

প্রসঙ্গ-কথা

Chunati.com
Pioneer in village based website

তুমি যতই শিক্ষালাভ কর না কেন, সব সময় মনে রাখবে তোমার আরো অনেক শিখার বিষয় আছে।

- হযরত আলী (রা.)

প্রসঙ্গ-কথা

চট্টগ্রাম জেলার ভৌগলিক ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত একটি উপজেলা লোহাগাড়া। ১৯৮১ সালে সাতকানিয়া থেকে বিভক্ত হয়ে এটি আলাদা থানায় রূপান্তরিত হয়। ১৯৮৫ সালে উন্নীত হয় উপজেলায়। এ এলাকাটির উত্তরে সাতকানিয়া উপজেলা ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা, পূর্বে লামা উপজেলা, দক্ষিণে বান্দরবান পার্বত্য জেলা, লামা-চকরিয়া উপজেলা এবং পশ্চিমে বাঁশখালী ও সাতকানিয়া উপজেলা। ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ুর অন্তর্গত সুবাদে অঞ্চলটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভরপুর। যুগে যুগে অঞ্চলটিকে আরাকান, ত্রিপুরা, মোঘল, পর্তুগীজ ও ইংরেজসহ বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী শাসন করেছে। ফলে অঞ্চলটিতে রয়েছে ইতিহাস, ঐতিহ্য ও কিংবদন্তীর বিভিন্ন নিদর্শন। ইতিহাস থেকে জানা যায়, বৃহত্তর চট্টগ্রামে ৩ হাজার বছর পূর্বের কোন ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া যায়নি। দক্ষিণ চট্টগ্রামের এই অঞ্চলে আরাকানী ও পাহাড়িরা সুপ্রাচীনকাল থেকে বসবাস করত। ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দে ফখরুদ্দিন মোবারক শাহের শাসনামলে মুসলমানরা সর্বপ্রথম চট্টগ্রাম জয় করেন। তখন থেকে চট্টগ্রামে মুসলিম ও হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন আসতে শুরু করে। দক্ষিণ চট্টগ্রামের এ লোহাগাড়া অঞ্চলে মাত্র কয়েকশত বছর পূর্বের ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়ার কথা জানা গেছে।

১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলে চট্টগ্রাম বিজয়ের পর শঙ্খ নদী পর্যন্ত মোঘলদের অধিকারে আসে। ওই সময়ে ২ জন হাজারী সেনাপতির নেতৃত্বে দোহাজারীতে দূর্গ স্থাপিত হয়। লোহাগাড়াসহ দক্ষিণ চট্টগ্রামে পাহাড়িদের উৎপাত ও আরাকানীদের ঠেকানোর জন্য এ ব্যবস্থা নেয়া হয়। ওই সময়ে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দলে দলে লোক সাতকানিয়া-লোহাগাড়াসহ দক্ষিণ চট্টগ্রামে এসে বসতি স্থাপন করে। ফলে লোহাগাড়া অঞ্চল ঐতিহাসিকভাবে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। ঐতিহাসিক, গবেষক ও লেখকদের কাছে এ অঞ্চলটি গুরুত্বপূর্ণ বটে। কিন্তু এ পর্যন্ত এ অঞ্চলের ইতিহাস লেখার কেউ উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। অবশ্য বর্তমানে প্রশংসনীয় উদ্যোগটি গ্রহণ করেছেন অধ্যাপক মোহাম্মদ ইলিয়াছ। ইতিহাসের ছাত্র না হয়ে তিনি লোহাগাড়ার ইতিহাস লেখার সাহস দেখিয়েছেন। তাঁর লিখিত **"লোহাগাড়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য"** নামক বইয়ে তিনি লোহাগাড়া অঞ্চলের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বইটির বিভিন্ন লেখায় তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। ইতিহাস রচনা করা কঠিন কাজ। এ কাজের জন্য সময়, অর্থ ও গবেষণার প্রয়োজন হয়। লেখক অধ্যাপক মোহাম্মদ ইলিয়াছ **"লোহাগাড়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য"** নামক বই লিখে সে কঠিন কাজটি করেছেন। তিনি বইটিতে লোহাগাড়া অঞ্চলের প্রাচীন কথা, প্রাচীন স্থাপত্য, লোহাগাড়ার ইতিহাস ও পীর-আউলিয়াদের বৃত্তান্তসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা তুলে ধরেছেন। এ জন্য তাঁকে আমি মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আশা করছি, বইটি সর্বমহলের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। পরিশেষে এ গ্রন্থের প্রকাশক লোহাগাড়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ ফিজনূর রহমানসহ সংশ্লিষ্টদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী)
সংসদ সদস্য-২৯২, চট্টগ্রাম-১৫ (সাতকানিয়া-লোহাগাড়া)

প্রসঙ্গ-কথা

লোহাগাড়া চট্টগ্রাম জেলার অন্যতম উপজেলা। ভৌগলিক ও প্রাকৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি মনোরম একটি অঞ্চল। যুগে যুগে এ অঞ্চলটি আরাকান, ত্রিপুরা, মোঘল, আরমেনীয়, পর্তুগীজ ও ইংরেজসহ বিভিন্ন জাতির শাসনে ছিল। চট্টগ্রামে নবম, দশম ও একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত পাল বংশ অর্থাৎ বৌদ্ধ শাসনাভুক্ত ছিল। তারপর শাসন করে আরাকান রাজারা। সোলতানী আমলে ফখরুদ্দিন মোবারক শাহের শাসনামলে ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দে মুসলমানরা সর্বপ্রথম চট্টগ্রাম দখল করেন। এ সময়ের পর হতে চট্টগ্রামে মুসলিম ও হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন আসতে থাকে। এর পূর্বে পাহাড়িরা এখানে বসবাস করেছে।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, বঙ্গদেশে তিন হাজার বছর পূর্বের পর্যন্ত ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া যায়। বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলে এত পূর্বের কোন ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া যায়নি। লোহাগাড়ায় মাত্র কয়েকশত বছর পূর্বের ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। তবে, এ কথা ঠিক যে, দক্ষিণ চট্টগ্রামে আরাকানী ও পাহাড়িরাই সুপ্রাচীনকাল থেকে বসবাস করত। মুসলমান কর্তৃত্ব স্থাপনের পর থেকে দক্ষিণ চট্টগ্রামে (সাতকানিয়া-লোহাগাড়া-বাঁশখালী) কৃষি ও বসবাসের ক্ষেত্র বিস্তৃতি লাভ করে। ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে মোঘলদের চট্টগ্রাম দখলের পর শঙ্খ নদী পর্যন্ত তাদের অধিকারভুক্ত হয়। আরাকান রাজা চন্দ্র সুধম্মার (১৬৫২-১৬৮৪) মৃত্যুর পর আরাকান রাজ্যে দেখা দেয় অরাজকতা। তখন দক্ষিণ চট্টগ্রামের আরাকানী শাসনকর্তা ছিলেন বান্দরবানের বোহমংহারিও। ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলে চট্টগ্রাম বিজয়ের পর ২ জন হাজারী দোহাজারীতে অবস্থান নেন। পাহাড়িদের উৎপাত ও আরাকানীদের ঠেকানোর জন্য দোহাজারীতে সেনাদের দূর্গ স্থাপন করা হয়। এ সময়ে বাহির থেকে দলে দলে লোক লোহাগাড়ায় এসে বসতি স্থাপন করে।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)'র আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে অবসান হয় অন্ধকার যুগের। এ সময়ে পথ পরিক্রমায় এদেশে আগমন ঘটে বহু সুফি-সাধকের। এ দেশের বিভিন্ন স্থানে কত পীর-আউলিয়া এসেছেন তার সঠিক তথ্য এখনো পর্যন্ত জানা সম্ভব হয়নি। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ন্যায়ভিত্তিক মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠায় পীর-আউলিয়াদের ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

একটি অঞ্চলের ইতিহাস রচনা করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। এ কাজের জন্য প্রয়োজন হয় অর্থ ও প্রবল ইচ্ছা। প্রয়োজন রয়েছে গবেষণারও। লোহাগাড়ার ইতিহাস রচনার জন্য এ পর্যন্ত কোন চেষ্টা আমার জানামতে হয়নি। এ ক্ষেত্রে অধ্যাপক মোহাম্মদ ইলিয়াছ **"লোহাগাড়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য"** শীর্ষক গ্রন্থ রচনা করার যে সাহস নিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তাঁর লিখিত গ্রন্থটি বহু তাৎপর্যমন্ডিত ও বৈশিষ্ট্যের দাবিদার। তিনি গ্রন্থটিতে লোহাগাড়ার ইতিহাস, ইউনিয়নের ইতিহাস, প্রাচীন স্থাপত্য, পীর-আউলিয়াগণের জীবনের মূল্যবান ইতিহাসসহ বহু ঘটনা তুলে ধরেছেন। ফলে গ্রন্থটি পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। এ জন্য আমি লেখককে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। গ্রন্থটির প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্টদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সাফল্য কামনা করি।

(প্রফেসর ড. মুঈনুদ্দীন আহমদ খাঁন)
শিক্ষাবিদ ও গবেষক

প্রসঙ্গ-কথা

পাক ভারত উপমহাদেশ তো বটেই, দক্ষিণ এশিয়ার সর্বাধিক চারিত বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন **"বাঙ্গালাহ"** অঞ্চলটি চট্টগ্রাম বন্দরকে নিয়ে জগত বিখ্যাত মহিমায় অধিষ্ঠিত। **"বাঙ্গালাহ"** এলাকার চট্টগ্রাম অঞ্চলটির উত্তর-দক্ষিণ দিগন্তে বিস্তৃতির সাথে বিশাল বনাঞ্চল এবং সুবিস্তৃত সমুদ্রতট সংলগ্ন এলাকাটি দক্ষিণে মায়ানমার (বর্তমানে মিয়ানমার) তথা আরাকান রাজ্য পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে।

লোহাগাড়া উপজেলা এখানকার প্রায় মধ্যবর্তী অঞ্চল নির্দেশক প্রাচীন মধ্যযুগীয় ঐতিহাসিক সময়কালের সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এক অধ্যায় বিশেষ। মোঘল বিদ্রোহী রাজকুমার সুজা আরাকানে পলায়নের সময় দোহাজারীর **"দাহ হাজারী"**র শাসক তাঁকে পাঁচ হাজার ঘোড়া এবং চার হাজার খচ্চর দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। অনুরূপভাবে আধুনগরের আধু খাঁ পাঁচ হাজার ভারবাহী জন্তু-জানোয়ার দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। বলা বাহুল্য, পলায়নপর মোঘল রাজকুমারকে দেয়া সাহায্য বহরের যেকোন রাজকীয় সৈন্য বহরের সাথে তুলনীয়। তাই প্রয়োজনে দীর্ঘ রাস্তা তৈয়ার করতে হয়েছিল। লোহাগাড়ার এ সাহায্য বহর ঐতিহাসিক ঘটনার স্মারক। তখনকার লট বহরের একজন আমির নাম ফাযিল খাঁ ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ঈদগাহ নামক স্থান থেকে ফেরত আসেন চুনতি বিট সংলগ্ন ডেপুটি বাজারে। যাত্রা বিরতীর সময় হুইচ্চা ঘোনার একজন সাহস করে মরণাপন্ন সুদর্শন লোকটিকে চিড়া-দই খাইয়ে সেবা করে ভাল করেন। উল্লেখ্য, বর্তমান চুনতি গ্রামটি তখন প্রতিষ্ঠা পায়নি বলে ফাযিল সাহেব বাধ্য হয়ে পাহাড়ি লোকালয়ে আশ্রয় নেন। তাই লোহাগাড়া উপজেলার সর্বাধিক শিক্ষিত রশিদেরঘোনা খ্যাতি অর্জন করে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধের এ ঐতিহাসিক ঘটনা লোহাগাড়া উপজেলার ঐতিহাসিক প্রাচীনতা ও কৌলিন্য নির্দেশ করে।

প্রায় ১৭৮৮ সনের ঘটনা, সাতকানিয়া লোহাগাড়ার এক **"বাজার ব্যবসায়ী"** মাদ্রাজ গিয়ে সাতকানিয়া থেকে আকিয়াব অঞ্চল ব্যাপী বাকি টাকা নগদায়নের শর্তে পাঁচ বছর নগদ টাকা ছাড়া ব্যবসা করার অনুমতি প্রাপ্ত হয়। এ ঘটনা এখানকার ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তৃতি ও প্রাচীনত্বের পরিচয় বহন করে। সুদূর উত্তরে ত্রিপুরা রাজ্য দিল্লি সালতনাত ও মোঘল সাম্রাজ্যকে পরিবেষ্টন করতঃ আরাকান রাজ্যের মগা শক্তি ডাচ-ওলান্দাজ ও সামুদ্রিক অপশক্তিগুলো দীর্ঘদিন ধরে উপকূলীয় মুসলিম রাজন্য বর্গের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত থাকে। লোহাগাড়া উপজেলার কর্ণধার দোহাজারী (দাহ হাজারী) এবং আধু খাঁ দীর্ঘকাল পর্যন্ত মোঘল শক্তির দক্ষিণ প্রান্তীয় সহায়ক শক্তি স্বরূপ বিদ্যমান ছিল। ফলে লোহাগাড়া অঞ্চল ঐতিহাসিকভাবে পরিচিত।

একটি অঞ্চলের ইতিহাস রচনা করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। প্রয়োজন হয় অর্থ ও প্রবল ইচ্ছা শক্তির। প্রয়োজন হয় গবেষণার। লোহাগাড়ার ইতিহাস রচনা করার ক্ষেত্রে অধ্যাপক মোহাম্মদ ইলিয়াছ যে দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তাঁর লিখিত **"লোহাগাড়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য"** গ্রন্থটি আমাদেরকে চিন্তা করার সুযোগ তৈরি করেছে। গ্রন্থটি আগামী প্রজন্মের কাছে শিক্ষনীয় হবে। পাঠক সমাজে প্রশংসিত হবে। পরিশেষে বইটির প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্টদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(প্রফেসর ড. শব্বির আহমদ)
শিক্ষাবিদ ও গবেষক

প্রসঙ্গ-কথা

যে কোন ইতিহাস-ঐতিহ্য অতীতকে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং বর্তমান ও আগামীর জন্য একটি পথনির্দেশক সূবর্ণরেখা তৈরি করে। ঐতিহ্য, সমাজ, জাতি ও সভ্যতার সাক্ষর বহন করে। ঐতিহ্য ও ইতিহাসে যে জাতি যত বেশি উন্নত সে জাতি তত বেশি সমৃদ্ধ এবং সুসভ্য। সুতরাং ঐতিহ্যে মানুষের চিন্তা-চেতনা, রুচিবোধ, সৃজনশীলতা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি এবং সামগ্রিক মূল্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। এজন্যই আমাদের পূর্বপুরুষেরা ঐতিহ্যের প্রতি অধিক যত্নবান ছিলেন।

ঐতিহ্যের ইতিহাস মৌলিক উপাদান, যা জাতির ভিত্তি। বর্তমানে জাতির শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য-ইতিহাস চর্চা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। এটা যেভাবেই হোক আবার পুনরুদ্ধার করতে হবে। নতুবা জাতীয় সম্প্রদায় হিসেবে আমরা নিঃশেষ হয়ে যাব। উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছিলেন, **'বাঙালি আত্মবিস্মৃত জাতি। আমাদের উৎস কোথায় হইতে তাহা আমরা জানিতে চাহিনা, আমরা অনুসন্ধানও করিতে চাহিনা'**। তাইতো আমেরিকার চার্লস ভি গারভিনও পুনঃঐতিহ্য অনুরাগের উপর জোর দিয়েছিলেন। আমরাও আজ গারভিনের মতো সে ঐতিহ্য অনুরাগে উজ্জীবিত হয়েছি। অন্যদিকে ষোড়শ শতকের ফরাসি দার্শনিক লা রশফুকো বলেছিলেন, **'অতীত ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের প্রতি অনুসন্ধানী হও, তাহলে বিশাল ঐতিহ্য মূল্যবোধ নির্মাণ করা সম্ভব'**। জনৈক গ্রীস ইতিহাসবিদ বলেছিলেন, **'একটি ভৌগোলিক সীমারেখায় বসবাসকারী জাতি-গোষ্ঠী, সম্প্রদায় যখন তার ইতিহাস-ঐতিহ্য ভুলে যায় তখনই ঐ অঞ্চল বা জনপদের সীমারেখা কাল মেঘে আচ্ছাদিত হয়।'**

বৃহত্তর সাতকানিয়া-লোহাগাড়া ব্রিটিশ ভারতীয় সময় থেকে একটি শিক্ষিত জনপদ হিসেবে অভিহিত, যেখানে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ তিন সম্প্রদায়ের অনেক কৃতি ও খ্যাতিমান জন্মগ্রহণ করে এ জনপদকে করেছে গৌরবান্বিত। এখনো সে ধারা বহমান। এ দু'অঞ্চলের ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রীতিও আজ অনুকরণীয়। ধর্মীয় ঐতিহ্যে, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও শিল্প-বাণিজ্যে এমনকি সামাজিক ও সাংগঠনিক নেতৃত্ব দানেও এ দু'থানার জনগণ আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশসহ বহির্বিশ্বের নানা অঙ্গণে অগ্রণী ভুমিকা পালন করছে। লোহাগড়ার ভিক্ষু শান্তপদ মঙ্গোলিয়ার উলানবাটরে এশিয়ার শান্তির দূত হিসেবে অভিধাপ্রাপ্ত হয়েছেন। অতীতে ফা হিয়েন, হিউয়েন সাং ও ইৎ সিং প্রমুখ প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজকেরা প্রাচীন বাংলায় এসেছিলেন আমাদের ঐতিহ্য অনুসন্ধানের জন্য। তেমনি ইঙ্গ-মার্কিন, তুর্কী, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকেরাও এসেছিলেন এখানকার শিল্প-সাহিত্য অনুসন্ধান, সাম্রাজ্য বিস্তার ও এদেশের নানা সম্পদ আহরণের লোভে।

সাতকানিয়া-লোহাগাড়া পাহাড় ও সাগর ঘেঁষা বাংলাদেশের দক্ষিণ জনপদের একটি অপরূপ সৌন্দর্য্য ভরা অংশ, যেখানে রয়েছে বহু প্রাচীন ঐতিহ্যের আধার। ঊনবিংশ-বিংশতো বটেই একবিংশ শতকেও এখানকার ইতিহাস-ঐতিহ্যে ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে নবজাগৃতির ধারা সৃষ্টি করে চলেছে। এরকম একটি সুন্দর প্রয়াসের জন্য লেখক অধ্যাপক মোহাম্মদ ইলিয়াছকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। এছাড়া শিক্ষা ও ঐতিহ্য-অনুরাগী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ ফিজনূর রহমানকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা। মহৎ এ উদ্যোগের জন্য সংশ্লিষ্ট অন্যদেরকেও জানাই সাধুবাদ। এ গ্রন্থের প্রকাশনা শুভ হোক, **"লোহাগড়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য"** অমর হোক।

প্রফেসর ড. সুকোমল বড়ুয়া
শিক্ষাবিদ ও গবেষক

ঐতিহাসিক লোহাগাড়া

প্রাচীনকাল থেকে চট্টগ্রাম অঞ্চল আরাকানী শাসনের অধীনে ছিল। আরাকানী চন্দ্র-সূর্য বংশ চট্টগ্রাম অঞ্চলে দীর্ঘকাল রাজত্ব করে। তখন চট্টগ্রাম অঞ্চলে (লোহাগাড়াসহ) হিন্দু-বৌদ্ধ অধিবাসীদের আগমন ঘটে। খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকে আরব দেশ থেকে বণিকরা ব্যবসার উদ্দেশ্যে চট্টগ্রামে আসেন। সে সময় থেকে আরাকানে মুসলমানদের আগমন ঘটে। ১৩৪০ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার সুলতান ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ (১৩৩৮-১৩৪৬ খ্রি.) চট্টগ্রাম জয় করে মুসলিম শাসন ব্যবস্থা চালু করেন। ঐ সময়ে হযরত বদর শাহ (রহ.) সহ বার জন আউলিয়া চট্টগ্রাম বিজয়ের অভিযানে ছিলেন। হযরত পীর বদর শাহ (রহ.)-এর চাটি বা চেরাগই **'চাটগাঁও'** বা **'চাটিগাঁও'** নামের মূল উৎস। ইতিহাসবিদদের মতে, সবচেয়ে খ্যাত নাম চাটিগাঁও ক্রমবিবর্তনে চাটিগ্রাম এবং পরিশেষে **'চাটগাঁও'** ও **'চট্টগ্রাম'**।

আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.)-এর শাসন আমলে চট্টগ্রাম অঞ্চল চারটি বিভাগে বিভক্ত ছিল। নির্ধারিত সীমানায় প্রত্যেক বিভাগে একেক জন শাসনকর্তা নিযুক্ত হতেন। প্রথম বিভাগ মীরসরাই থানা নিয়ে গঠিত (পরাগ খান ও ছুটী খান), দ্বিতীয় বিভাগ সীতাকুণ্ড থান নিয়ে গঠিত (হামিদ খান), তৃতীয় বিভাগ কর্ণফুলী নদীর উত্তর দিকস্থ চট্টগ্রাম (হামজা খান) ও চতুর্থ বিভাগ দক্ষিণ দিকস্থ চট্টগ্রাম (খোদাবখশ খান)। ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে নবাব শায়েস্তা খা (১৬৬৬-১৬৭৮, ১৬৮০-১৬৮৮ খ্রি.)-এর পুত্র বুজুর্গ উমেদ খানের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম দখল ও আরাকানী শাসনের অবসান হয়। তখন চট্টগ্রামের নামকরণ হয় 'ইসলামাবাদ'। এ সময়ে শঙ্খ নদী পর্যন্ত মোঘলদের অধিকারে চলে আসে।

আরাকান রাজা সুধম্মার (১৬৫২-১৬৮৪ খ্রি.) মৃত্যুর পর আরাকান রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ঐ সময়ে দক্ষিণ চট্টগ্রামের শাসন কর্তা ছিলেন বোহমং হারিও। তার মৃত্যুর পর তার পৌত্র কংলা প্রু দক্ষিণ চট্টগ্রামের আরাকানের শাসনকর্তা হন। সে সময় আরাকানীরা বঙ্গোপসাগরের উপকূলবাসীদের প্রতিনিয়ত অত্যাচার করলে মোঘল বাহিনী শঙ্খ নদীর দক্ষিণ অংশে অভিযান শুরু করে। অভিযানে নেতৃত্ব দেন দোহাজারী দূর্গের সেনাপতি আধু খা ও তার পুত্র সেনাপতি শের জামাল খা। মোঘল বাহিনীর আক্রমণে আরাকানী বাহিনী পরাজিত হয়ে গভীর অরণ্যে পালিয়ে যায়। ধারণা করা হয়, সে সময় লোহাগাড়া অঞ্চলে উভয় পক্ষের বহু সৈন্য হতাহত হয়। আধু খা পাহাড়ী এলাকায় লোহার দণ্ড গেঁড়ে বিজয় পতাকা উত্তোলন করেন। চারিদিকে যতদূর পর্যন্ত পতাকাটি দেখা যেত সে পর্যন্ত আধু খা'র বিজয় এলাকার সীমানা ছিল বলে জনশ্রুতি রয়েছে। বিজয় স্তম্ভের পাশে স্থাপন করা হয় মোঘল সৈন্যদের গড় (দূর্গ)। এ লোহার দণ্ড ও গড়কে কেন্দ্র করে এলাকাটি নামকরণ হয় **'লোহারগড়'**। পরবর্তীতে লোহারগড় পরিমার্জিত হয়ে **'লোহাগাড়া'** নামকরণ হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

ভৌগলিক কারণে লোহাগাড়া ঐতিহাসিক স্থান হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। প্রকৃতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান পাহাড়, অরণ্য, নদী, খাল ও ঝিল রয়েছে অঞ্চলটিতে। অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ ও নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে দেশসহ বহির্বিশ্বের কাছে অঞ্চলটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

তথ্যসূত্র :

১. বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল- প্রফেসর আবদুল করিম
২. শতবর্ষে চট্টগ্রাম সমিতি (১৯১২-২০১১ সাল)
৩. মোঘল সাম্রাজ্যের বিলুপ্ত অধ্যায় দোহাজারী- জামাল উদ্দিন

সংসারে যেখান হতে ইতিহাস শুরু হয় তার অনেক পরে অধ্যায় হতে লিখিত হয়ে থাকে।

- বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Chumati.com
Pioneer in village based website

এক নজরে লোহাগাড়া উপজেলা

(১) (ক) উপজেলার নাম: লোহাগাড়া (খ) জেলার নাম: চট্টগ্রাম (গ) উপজেলার আয়তন: ২৫৮.৮৭ বর্গকিলোমিটার (ঘ) লোকসংখ্যা: ২,৭৯,৯১৩ জন (বিবিএস-২০১১) (ঙ) পৌরসভার সংখ্যা: নাই (চ) ইউনিয়নের সংখ্যা: ৯টি (ছ) দূর্গম ইউনিয়নের সংখ্যা ও নাম: ৩টি- চরম্বা, পুটিবিলা ও চুনতি (জ) ডাক বাংলার অবস্থান: চট্টগ্রাম জেলা পরিষদের অর্থায়নে উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ১টি মনোরম ডাক বাংলা রয়েছে (ঝ) অন্যকোন উন্নতমানের রেষ্ট হাউস থাকলে তার বর্ণনা: বনবিভাগের একটি উন্নতমানের রেষ্ট হাউস আছে। (ঞ) জেলা সদর থেকে উপজেলা সদরের দূরত্ব (কি: মি:) এবং সচরাচর ব্যবহৃত যানে যাতায়াতের দূরত্ব: ৭০ কিলোমিটার, সময়: ১.৩০ ঘন্টা (ট) উপজেলা টেলিফোন ব্যবস্থা: ডিজিটাল।

(২) (ক) উপজেলা এলাকার সংসদ সদস্যের নাম: প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী (খ) উপজেলা চেয়ারম্যানের নাম: এডভোকেট ফরিদ উদ্দীন খান (গ) ভাইস চেয়ারম্যানের নাম: অধ্যাপক নুরুল আবছার (ঘ) মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানের নাম: গুলশান আরা বেগম।

(৩) গ্রাম: ৪৩টি (৪) মৌজা ৪০টি (৫) কলেজ ৪টি (৬) মাধ্যমিক বিদ্যালয়: ২৯টি (৭) মাদ্রাসা: ২৬টি (৮) ভোকেশনাল প্রতিষ্ঠান: ৩টি (৯) টেকনিক্যাল কলেজ: ২টি (১০) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১০০টি (১১) এবতেদায়ী মাদ্রাসা: ৪৭টি (১২) সাক্ষরতার হার: ৬৫% (১৩) হাসপাতাল: ১টি, বেড সংখ্যা: ৫০টি (১৪) স্বাস্থ্যকেন্দ্র: ৪টি (১৫) পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র: ০৫টি (১৬) হাটবাজার: ১৯টি (১৭) তহসিল অফিস: ৩টি (১৮) আদর্শ গ্রাম: ০২টি (১৯) স্বল্প মূল্যে আবাসন প্রকল্প: ১টি (২০) কৃষি জমি: ৩৯,৫১৭ একর (২১) অকৃষি জমি: ৬,৫৫৭.৯৫ একর (২২) কর্মরত এনজিও: ১১টি (২৩) পাকা রাস্তা: (ক) মহাসড়ক: ২৫.৫ কি. মি. (খ) সড়ক ২১.৬৬ কি.মি. (গ) কাঁচা রাস্তা: ৫৯৮.৬৮৫ কি.মি. (২৪) সামাজিক সংগঠন: (ক) ক্লাব: ২৬টি (খ) পাঠাগার: ১টি (গ) এতিমখানা: ২০টি (ঘ) মক্তব: ২১৫টি (২৫) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান: (ক) মসজিদ: ৪০২ টি (খ) মন্দির: ২৭টি (গ) বৌদ্ধ বিহার: ২১টি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাচীন কথা

Chunati.com
Pioneer in village based website

প্রতিটি মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড়। যেখানে স্বপ্ন নেই সেখানে চেতনা নেই আর যেখানে চেতনা নেই সেখানে ভাল কিছু সংগঠিত হতে পারে না।

- এপিজে আবদুল কালাম
ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি ও প্রখ্যাত বিজ্ঞানী

প্রাচীন কথা

ঐতিহাসিকগণের মতে, বাংলাদেশে আদিমযুগের নেই কোন ইতিহাস। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি। হার্বার্ট রিজলির মতো নৃ-তত্ত্ববিদরা মন্তব্য করেছেন **"মোঙ্গল ও দ্রাবিড়"** মানব ধারার রক্তের মিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছে বাঙালি জাতি। বিশেষজ্ঞগণ রিজলির মতবাদ গ্রহণযোগ্য মনে করেন না। কেননা, বাঙালিদের চোখের ভাঁজ, নাকের গঠন, চুলের আকৃতি মোঙ্গলিদের থেকে ভিন্ন। অন্যদিকে দ্রাবিড় জাতির অস্তিত্ব পন্ডিতগণ অস্বীকার করেছেন। মোঙ্গল ও দ্রাবিড় কোন মানব গোষ্ঠী নয় বলে পন্ডিতগণ মনে করেন।

নৃ-তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকগণ বাঙালি জাতিকে অস্ট্রিক বলেছেন। রমেশ চন্দ্র মজুমদার এ মতবাদ মেনে নেননি। তার মতে নিষাদ জাতি থেকে বাঙালি জাতির সৃষ্টি হয়েছে। কেননা নিষাদ জাতি কৃষি কাজ দ্বারা জীবনযাপন করত। বাঙলা ভূ-খন্ডে আর্য নামে সর্বশেষ জাতি প্রাধান্য বিস্তার করে। আর্য জাতির উৎপত্তি স্থান হল পোল্যান্ডে। তারা ভারত ভূ-খন্ডে প্রবেশ করে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু এবং পাঞ্জাবের বিশাল এলাকায় বসতি স্থাপন করে। পর্যায়ক্রমে তারা বাংলায় প্রবেশ করে। খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বিখ্যাত চীনা পর্যটক হিউয়েন সাং বাংলাদেশে আসেন। তিনি এদেশে বৌদ্ধ বিহার দেখতে পান। এতে বুঝা যায় যে, ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে এদেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ছিল। রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মতে, অশোকের পূর্বেই বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হয়। সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে বাংলার উত্তরাঞ্চল পুন্ড্রনগর (মহাস্থান, বগুড়া) নামে পরিচিত ছিল। তাঁর আমলে খননের ফলে চিহ্নযুক্ত মুদ্রা পাওয়া গেছে। কৃষাণ আমলে বাংলাদেশে কিছু কিছু মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে বাংলার অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের অবসান হয় মগধে গুপ্ত শাসন (খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী) প্রতিষ্ঠার পর। ধারণা করা হয় গুপ্ত শাসনের গোড়ার দিকে বাংলায় স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সমুদ্র গুপ্তের শাসনামলে এ গুপ্ত রাজ্য বিস্তার লাভ করে। ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে বাংলায় কোন অখন্ড রাজ্য ছিল না। এ সময়ে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বঙ্গ, পুন্ড্র, রাঢ়, গৌড়, সমতট, হরিকেল ইত্যাদি নামে বিভিন্ন জনপদ গড়ে ওঠে। গুপ্ত শাসন অবসানের পর বাংলায় দুটি স্বাধীন রাজ্যের সৃষ্টি হয়। এগুলো হচ্ছে বঙ্গ ও গৌড়। প্রাক্ মুসলিম যুগে বাংলার ইতিহাসে পাল বংশের অভ্যুত্থান ঘটে। অষ্টম শতাব্দীতে পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল বাংলার ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করে। রাজ বংশীয় শাসন শুরু হয় পাল বংশ থেকে। ধারণা করা হয় প্রায় চারশত বছর পাল বংশীয় রাজারা বাংলা শাসন করেন। আর চন্দ্র বংশীয় রাজারা শাসন করেন দেড়শ বছর। পাল বংশের রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। চন্দ্র বংশীয় রাজাদের শাসন কার্য চলে পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব বাংলায়। তারপর একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অভ্যুত্থান হয় সেন বংশের। সেন বংশের রাজারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন।

পালযুগে ইউনিয়নগুলো খন্ডন, ভাগ, আবৃত্তি, চতুরক ও পাটক নামে ছিল। মনে করা হয় পাটক থেকে পাড়ার উৎপত্তি হয়েছে। পাল যুগের শাসন ব্যবস্থা সেন যুগেও ছিল বহাল। ১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কি সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি বাংলায় হিন্দু সেন বংশীয় শাসনের অবসান ঘটিয়ে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। বখতিয়ার খলজি নদীয়া বিজয়ের পূর্বে আরব, পারস্য, তুঘলক ও মধ্য এশিয়া থেকে বহু সুফি-সাধক পীর আউলিয়া এদেশে আসেন। সুলতানি ও মোঘল আমলে বাংলায় সর্বত্র মসজিদ, সমাধি, মিনার, সরাইখানা, প্রাসাদ, দূর্গ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাংলার প্রথম স্বাধীন সোলতান ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ'র (১৩৩৮-৪৯ খ্রী:) আমলে আফ্রিকার বিশ্ব বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা বাংলাদেশে আসেন ১৩৪৫-৪৬ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি চট্টগ্রাম থেকে হযরত শাহজালাল (র:) এর সাথে দেখা করতে সিলেটে যান। তাঁর আমলে সুফি-দরবেশ এদেশে আসেন। চর্তুদশ শতাব্দীতে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার ফলে মধ্যপ্রাচ্য, ইরান ও ভারতবর্ষ থেকে এদেশে আসেন অসংখ্য সুফী-সাধক ও ধর্ম-প্রচারক। ঐতিহাসিক ড. আবদুল করিমের মতে, চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে চট্টগ্রাম,সিলেট ও সোনরগাঁও অঞ্চলে যাতায়াত করতেন বহু সুফী-সাধক। অন্যদিকে সোলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ বাংলায় দীর্ঘ ১৬ বছর (১৩৪২-১৩৫৮ খ্রীষ্টাব্দ) রাজত্ব করেন। তার আমলে বাংলায় ইসলাম প্রচার সহজ হয়। তিনি ফকির, দরবেশ ও পীর আউলিয়াদেরকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানান এবং স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ করেন দেন। পঞ্চম শতাব্দীতে ইলিয়াস শাহী বংশের সোলতান গিয়াস উদ্দীন আজম শাহের (১৩৯৩-১৪১০ খ্রী:) আমলে বাংলাদেশে শিক্ষা-দীক্ষা, সাহিত্য, শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের চরম উন্নতি লাভ করে। ঐ সময়ে এদেশের জনগণের মধ্যে প্রচলন ছিল বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়ার। নাটক তাদের আনন্দ দান করত। বিভিন্ন পোশাকে সজ্জিত হয়ে বাদ্যযন্ত্র সহকারে পরিবেশন হত যাত্রা-গল্প। ১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ২০০ বছর এদেশে স্বাধীন সোলতানগণ শাসনকার্য পরিচালনা করেন। সোলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তার পুত্র সিকান্দর শাহ বাংলায় ৩৫ বছর শাসন কার্য পরিচালনা করেন। ঐ সময়ে চট্টগ্রামসহ পার্শ্ববর্তী অনেক অঞ্চল আরাকানী সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। প্রায় ৩শ বছর ব্যাপী আরাকানী মগরা বৃহত্তর চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে বসবাস করে স্বাধীনভাবে। ত্রয়োদশ-চর্তুদশ শতাব্দীতে ভারতের মগধ হতে বৌদ্ধ ধর্মের উৎখাতের সময় বহু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী নারী-পুরুষ আসেন চট্টগ্রামে। ইতিহাস থেকে জানা যায়, বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলার ফেনী পর্যন্ত এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের কিছু অংশ একসময় আরাকানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঐ সময় বর্তমানে মিয়ানমার রাষ্ট্র আরাকান ও বার্মা দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজ বোধফ্রা আরাকান আক্রমণ করে আরাকানের অধিকার নেন। ওই সময় আরাকানী সৈন্যরা পরাজিত হলে অনেক মগ, রাখাইন সম্প্রদায় আরাকান ত্যাগ করে পটুয়াখালী, বরিশাল, বান্দরবান ও কক্সবাজারসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে।

১৭৪০ থেকে ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ১৬ বছর বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব ছিলেন আলীবর্দি খাঁ। তিনি অত্যন্ত কৃতিত্ব ও সাফল্যের সাথে পরিচালনা করেন শাসন

কার্য। জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে রাজ্যের বিভিন্ন প্রশাসনিক পদে তিনি যোগ্য লোকদের নিয়োগ করতেন। তাঁর আমলে দেশের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু জমিদার গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়। ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দীন হুসাইন শাহ বাংলার সিংহাসনে বসেন। তিনিও চট্টগ্রাম অধিকার করেন। ১৬১৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর ভারতের শাসনকর্তা ছিলেন। ঐ সময়ে রাজা মংপিউ চট্টগ্রাম দখল করেন। ১৬৬৬ সালে মোঘল সুবেদার শায়েস্তা খাঁ বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তাঁর পুত্র উমেদ খাঁনের দক্ষ যুদ্ধ পরিচালনায় তিনি চট্টগ্রাম বিজয় করেন। ওই সময়ে চট্টগ্রাম ছিল আরাকান রাজ্যের অধীনে। শায়েস্তা খাঁ চট্টগ্রামে পর্তুগীজদের সহযোগিতায় আরাকানীদের হাত থেকে চট্টগ্রামকে বাংলায় সংযুক্ত করেন। চট্টগ্রামের নতুন নাম রাখেন ইসলামাবাদ। তারপর চট্টগ্রামে বসবাসকারী আরাকানী মগদের উপর বাঙালিদের চরম অসন্তোষ বিরাজ করে। ঐ সময়ে বহু মগ হতাহত হয়। মগরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ধন-সম্পদ মাটির নিচে গেঁড়ে (পুঁতে) রেখে চট্টগ্রাম ত্যাগ করে নিজ ভূমি আরাকানে চলে যায়। আর মোঘলদের শাসন মেনে কিছু বৌদ্ধ রয়ে গেল স্বদেশে। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব আলীবর্দি খাঁ (১৭৪০-১৭৫৬ খ্রী:) এর শাসনামলে দোহাজারী এক দূর্গের দক্ষিণের হাজারী (অধ্যক্ষ) ছিলেন আধু খাঁ। আধু খাঁ'র দু'পুত্র শের জামাল খাঁ ও রহমত খাঁ। এ দু'পুত্রের নামে জামাল খাঁন ও রহমতগঞ্জ নামকরণ হয়। আধু খাঁ'র শেষ বংশধর ছিলেন করিমুন্নেছা। তিনি (আধু খাঁ) ওই সময়ে শঙ্খের দক্ষিণ প্রান্ত (সাতকানিয়া, বাঁশখালী, লোহাগাড়া, চন্দনাইশ, আনোয়ারা, পটিয়া) নবাবের কাছ থেকে তাঁর শেষ বংশধর করিমুন্নেছার নামে জমিদারী লাভ করেন। আধু খাঁ ও করিমুন্নেছা শঙ্খের দক্ষিণ অংশে লোকজনদের উপকারে রাস্তাঘাট নির্মাণ, পানীয় জলের জন্য দিঘী খনন ও মসজিদ নির্মাণ করেন। যেমন আধুনগরের খাঁন হাট, খাঁন দিঘী, খাঁন মসজিদ, মছদিয়ার খাঁন দিঘী ও চুনতির খাঁন মসজিদ অন্যতম। জনশ্রুতি আছে, আধু খাঁ ও তাঁর বংশধররা চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে ২২টি মসজিদ ও ২২টি দিঘী খনন করেছেন। ১৬৬৬-১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চট্টগ্রাম দক্ষিণ অঞ্চল মোঘলদের অধীনে ছিল। শেষ কয়েক দশক স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার অধীনে ছিল। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের পরাজয়ের পর মীর কাশেম (১৭৬০-১৭৬৪ খ্রী:) ইংরেজদেরকে চট্টগ্রামসহ তিনটি জেলার দেওয়ানী প্রদান করেন। প্রকৃতপক্ষে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ হতে এতদঅঞ্চলে ইংরেজ কর্তৃত্ব আসে। ইংরেজরা ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পর্যন্ত এতদ্অঞ্চলে ১৮৭ বছর শাসন করেন।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। বাংলার ইতিহাস- ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান।
২। চট্টগ্রামের ইতিহাস- ড. আবদুল করিম।
৩। ঐক্য: সাতকানিয়া- লোহাগাড়া বৌদ্ধ ঐক্য পরিষদ সংবর্ধনা স্মারক-২০০৮।

পরিষদ ও সভা

মৌর্য রাজাদের আমলে **"পরিষদ"** এর প্রথম উদ্ভব ঘটে। সেই সময়ে রাজ্য পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল **"পরিষদ"** নামে পরিচিত রাজার মন্ত্রী পরিষদের উপর। এই পরিষদের কাজ ছিল গোটা শাসন ব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা। অশোকের রাজত্বকালে একটি অনুশাসন ছিল যে, পরিষদ রাজার 'অনুপস্থিতিতে ও সময়ে সময়ে মিলিত হতে পারে। তবে অশোকের নির্দেশ ছিল জরুরী অবস্থায় সভার আয়োজনের কথা অবশ্যই তাঁকে জানাতে হবে।

অপরদিকে এ যুগে **'সভা'** এর উৎপত্তি ঘটেছিল। গোড়ার দিকে সভা ছিল অভিজাতদের ও জনসাধারণের প্রতিনিধিদের সমাবেশ। যাতে সম্পন্ন হত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কর্তব্যাদি। কিন্তু মৌর্য যুগে এ সভা বিবর্তিত হয়ে পরিণত হল রাজনৈতিক এক পরিষদের রাজ সভায়। রাজা অশোক রাজসভার সদস্যদের উদ্দেশ্য করে ভাষণ দিতেন।

ওই সময়ে গোটা দেশকে চারটি প্রধান বিভাগে ভাগ করা ছাড়াও, প্রত্যেকটি বিভাগকে কয়েকটি জনপদ করে ভাগ করা হত। প্রদেশ ও আহালে (জেলা) ভাগ করা হত। গ্রামগুলি ছিল বিভাগীয় শাসন ব্যবস্থার নিম্নতম ভিত্তি। **'রজ্জুক'** নামে প্রধান রাজকর্মচারীরা শাসন করতেন জনপদসমূহ।

পর্যায়ক্রমে পরিষদ ও সভা বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে গড়ে ওঠে পরিবর্তিত রূপে। একেক দেশে একেক ধরনের পরিষদ ও সভার আয়োজন হয়।

জেলায় প্রধান প্রধান শহরে থাকত মন্ত্রণালয় গৃহ। যেখানে রাজকর্মচারীরা নিয়মিতভাবে সমবেত হতেন সভার অনুষ্ঠানে। মোঘল আমলে প্রধান প্রশাসনিক বিভাগ ছিল রাজস্ব সম্পর্কিত বিভাগ। এ বিভাগের প্রধান ছিলেন "দেওয়ান"। আর রাজস্ব আদায়কারী কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ছিলেন বেশির ভাগই হিন্দু ধর্মাবলম্বীর।

বাংলাদেশে ইউনিয়ন পরিষদ এ উপমহাদেশের প্রাচীনতন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান। গ্রাম-চৌকিদারি আইন ১৮৭০ এর মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী সময়ে সময়ে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে পরিবর্তন হয়েছে। এক সময়ে ইউনিয়ন পরিষদের নাম ছিল পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েতের সদস্য ছিল ৫ জন। পঞ্চায়েত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মনোনীত হতেন। উপনিবেশিক শাসনামলে রাজস্ব আদায় দিয়ে কার্যক্রম হয়। পর্যাযক্রমে ইউনিয়ন পরিষদ আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রকল্প বাস্তবায়ন ইত্যাদি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। ইউনিয়ন পরিষদে ১ জন চেয়ারম্যান, ৯ জন সদস্য ও ৩ জন সংরক্ষিত মহিলা সদস্য থাকেন। যাঁরা প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন।

(তথ্য সূত্র: ইউনিয়ন পরিষদ অপারেশন ম্যানুয়েল)

পরিবার ও বিবাহের বিভিন্ন রীতি

মগধ ও মৌর্য যুগে পিতৃশাসিত যৌথ পরিবার ছিল। ওই সময়ে রাজ্যের কয়েকটি অঞ্চলে এক বিবাহ ছাড়াও নানা রীতির বিবাহ প্রচলন ছিল।

ওই সময়ে বিবাহ অনুষ্ঠান পরিণত হত সম্পত্তি হস্তান্তরের এক ধরনের চুক্তিতে। স্ত্রীকে ক্রয়মূল্য দিয়ে কিনতে হত। বিবাহের পর স্ত্রী পরিণত হত স্বামীর অস্থাবর সম্পত্তিতে। স্বামী স্ত্রী বিক্রির কিংবা জুয়া খেলায় বাজি ধরে স্ত্রী হারানোর নানা কাহিনী ছিল ওই সময়ে। স্ত্রীলোকের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। বিবাহের পর স্ত্রী হত স্বামীর অধীন। স্বামীর মৃত্যুর পর হয়ে পড়তেন পুত্রের অধীন। ওই সময়ে আট ধরনের বিয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন-

কন্যা সম্প্রদান (ব্রহ্ম বিবাহ), পুরোহিতকে কন্যা সপ্তদান (দৈব বিবাহ), কন্যা ক্রয় (আর্য বিবাহ), সমচুক্তির ভিত্তিতে বিবাহ (প্রজপত্য বিবাহ), স্থিরকৃত কন্যাপণ দিয়ে কন্যা ক্রয় (আসুর বিবাহ), কন্যা অপহরণের ভিত্তিতে বিবাহ (রাক্ষুস বিবাহ), ঘুমন্তকন্যাকে বলপূর্বক অপহরণ (পৈশাচ বিবাহ) এবং স্ত্রী পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে বিবাহ (গান্ধব বিবাহ)।

বর্তমানে বাংলাদেশে বিবাহ পদ্ধতি ধর্মীয় অনুশাসন ও পারিবারিক আইনের ভিত্তিতে হয়। মুসলমানরা মুসলিম শরীয়াহ ও আইন অনুযায়ী এবং হিন্দু-বৌদ্ধরা তাদের ধর্মীয় অনুশাসন অনুযায়ী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

বিজ্ঞান

বৈদিক (অতীত) যুগে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রথম অঙ্কুরোদগম হয়। সেই অতীত যুগে গণিতের জ্ঞানের কথাও বৈদিক সাহিত্য থেকে জানা যায়। এ যুগে মাপ-জোকের বিভিন্ন নিয়ম প্রচলন ছিল। চিকিৎসা-বিজ্ঞান অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তরে পৌঁছেছিল। খ্রীষ্ট জন্মের পরবর্তী প্রথম শতাব্দীগুলোতে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি হয়েছে। বিশেষ করে গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, ভেষজ ও রসায়ন শাস্ত্র। বিজ্ঞানের বেশ কয়েকটি শাখায় গ্রন্থ এ সময়ে প্রকাশিত হয়। ধর্মীয় ও অন্যান্য দালানের নির্মাণ কাজে গণিত ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিজ্ঞান। প্রাচীন ও মধ্যযুগের শুরুতে আর্যভট্ট, বরাহমিহির এবং ব্রহ্মগুপ্তের মত গণিতজ্ঞ পন্ডিতের নানা আবিষ্কারে আধুনিক বিজ্ঞানের নানা সাফল্য সূচিত হয়েছে। পিথ্যাগোরাসের জ্যামিতি উপপাদ্যটি ওই সময়ের। আর্যভট্ট দুই অজ্ঞাত রাশি বিশিষ্ট একঘাত সমীকরণের মৌল সমাধান উদ্ভাবন করে ছিলেন। প্রাচীন ভারতীয়রা শূন্য সংখ্যা ব্যবহার করে গণনার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। পরে আরব দেশীয়রা তাদের গণনায় শূন্য ব্যবহার করেন। তারপর অন্যান্য দেশের মানুষরা শূন্য সংখ্যা গ্রহণ করেন। আর্যভট্টের অনুসারীরা সেকালে ত্রিকোণামিতির সাইন ও কোসাইন এর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

গুপ্ত যুগের পন্ডিতরা পরিচিত ছিলেন গ্রহ-নক্ষত্রের চলাচলের সঙ্গে। সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের কারণও তাঁরা জানতেন। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে রসায়ন শাস্ত্রের প্রথম বেশ কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। চিকিৎসা শাস্ত্রও ওই যুগে দ্রুত বিকাশ লাভ করে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে চিকিৎসা শাস্ত্রের গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ওই সময়ে চিকিৎসা শাস্ত্রের গ্রন্থে মানুষের দেহে পাঁচটি প্রধান উপাদান- মাটি, জল, আগুন, বাতাস ও ইথর উল্লেখ ছিল। চিকিৎসা শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখা যেমন- শিশুরোগ, স্নায়বিক রোগ, কর্ণ ও স্বরযন্ত্র প্রদাহের চিকিৎসা এবং ঔষুধ প্রস্তুত সেই সময়ে বিকশিত হয়েছিল। তারপর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞানের এই উৎকর্ষতা ছড়িয়ে পড়ে।

কৃষি

মগধ ও মৌর্য যুগে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল লোহার খনির ব্যাপ্তি ও আধিক্য। কৃষিক্ষেত্রে লোহার ব্যবহার হত। ওই সময়ে লোহা দিয়ে কৃষির যন্ত্রপাতি বিশেষ করে লাঙলের ফলা তৈরি করতে শুরু করেছিল মানুষ।

জনশ্রুতি আছে, সবচেয়ে প্রাচীন বৌদ্ধ পুঁথিগুলির মধ্যে একটি "সুত্ত-নিপট"- এর এক উপাখ্যানে বলা হয়েছে- এক ব্রাহ্মণ লাঙল দিয়ে জমি চাষ করেছিল। সেই লাঙলের ফলা এমনভাবে গরম হয়েছিল যে, জলে ডুবিয়ে ঠান্ডা করতে হল। তখন থেকে শুরু হয় কৃষিকাজ।

কুশান ও গুপ্ত যুগ দুটি কৃষির অধিকতর উন্নতি হয় বলে ধারণা করা হয়। রাষ্ট্রের তরফ থেকে কৃষকদের তখন উৎসাহিত করা হত অনাবাদী ও জঙ্গল কেটে সাফ করা জমিতে চাষাবাদ করতে। যারা জঙ্গল কেটে সাফ করে চাষ করতেন তাদেরকে ওইসব জমির মালিকানা দেয়া হত।

মোঘল আমলে জনসাধারণ ছিলেন উপজাতি ও জাতিগোষ্ঠীতে বিভক্ত। বিভিন্ন ভাষাভাষী ও বিভিন্ন ধর্ম-মতের বিভক্ত ছিল তারা। জনসংখ্যার অধিকাংশই বাস করতেন গ্রামীণ সমাজের সংকীর্ণ স্থানে। কৃষকরা রাষ্ট্রকে খাজনা দিতেন ভূমি-রাজস্ব হিসেবে। এই আমলে একেকটি গ্রামের ছোট এক ভূ-খন্ডের বা সমাজের দায়িত্বে থাকতেন সমাজ প্রধান বা মোড়লেরা। মোড়লের অন্তর্গত আবাদী জমির খাজনা ধার্য ও আদায় করতেন তারা।

মোঘল আমলে দুই ধরনের জমি ছিল। যথা খালিসা ও জায়গির। সকল বিজিত ভূ-খন্ড, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জমি খালিসার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

খালিসা জমি ছিল পুরোপুরি রাষ্ট্রের সম্পত্তি। অন্যদিকে জায়গির ভূ-সম্পত্তি হল শর্তাধীনে বিলি করা জমি। এ আমলে ব্যক্তিগত জমির মালিকও ছিলেন। যাদেরকে বলা হতো জমিদার। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে যারা মোঘল সাম্রাজ্যের কর্তৃক মেনে নিতেন এবং যারা কর বা সেলামি দিতে রাজি হতেন তাদের জমিদার খেতাব দেয়া হত। তবে মোঘলদের অনবরত আক্রমণ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ বাংলার কৃষকদের জীবন-নিরাপত্তা

বিপর্যয়ের মুখে পতিত হয়েছিল। বাংলার মোঘল শাসনকর্তা ও প্রভাবশালী সেনাধ্যক্ষরা বিজিত ভূ-খন্ডকে এমনভাবে ব্যবহার করতেন যেন রাজ্যটি তাদের নিজস্ব। তাঁরা খেয়াল খুশিমতো জায়গির বিলি করতেন। নিয়োগ দিতেন রাজস্ব আদায় কর্মচারী।

ব্যবসা-বাণিজ্য

খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দীতে যন্ত্রের সাহায্যে ছাপ দেয়া মুদ্রা দেখা যায়। এই মুদ্রাগুলোর বেশির ভাগই ছিল তামা কিংবা রূপার তৈরি। মগধের এবং মৌর্য রাজাদের আমলে পূর্বের চেয়ে আরও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। নতুন-নতুন রাস্তা-ঘাট তৈরি হয়। তখন থেকে রাজ্যের রাজধানীর মধ্যে স্থাপিত হয় স্থলপথ ও বিশেষ ধরনের বাণিজ্য পথ। ওই সময়ে বণিকরা দেশের একেকটি বিশেষ অঞ্চলে একেকটি ধরনের পণ্য বেচাকেনা করত। স্থলপথ ছাড়াও নদী ও সমুদ্রপথে তখন ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু হয়েছিল।

গুপ্তযুগে রাষ্ট্রের তরফ থেকে বিশেষভাবে নজর দেয়া হত রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার দিকে। ওই সময়ে নদী ও সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান অঞ্চল। সেখান থেকে বিভিন্ন বাণিজ্য পথে ব্যবসা-বাণিজ্য অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে দেয়া হত। **'পেরিপ্লুস মারিস এরিথ্রিই'**তে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বঙ্গোপসাগরের উপকূল ধরে জাহাজ চলাচল করত। জাহাজের মালিকরা যাতায়াত করতেন সিন্ধুদেশ, বঙ্গদেশ ও করমন্ডল উপকূলে। এসব বাণিজ্যপথে পশমী কাপড়-চোপড় আনা হতো উত্তরাঞ্চল থেকে। রেশম আনা হতো পূর্বাঞ্চল থেকে এবং কাপড়-চোপড় ও ঘোড়া আনা হত পশ্চিম অঞ্চল থেকে।

মোঘল আমলে উপ-মহাদেশের সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলসমূহে ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নত হয়ে উঠেছিল। মোঘল আমলে হজ করতে সমুদ্র পথে মক্কায় যেতে চাইলে পর্তুগীজদের কাছ থেকে অনুমতির প্রয়োজন হত। যার কারণে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরে পর্তুগীজদের আধিপত্য মেনে নিতে হয়েছিল মোঘলদেরকে। মোঘলদের বেশ কিছু বাণিজ্য জাহাজ ছিল। কিন্তু কোন নিজস্ব নৌ-বহর ছিলনা। এ আমলে সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকাসমূহে বেশি সংখ্যক ধনী বণিকরা বাস করতেন। ফলে বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য ও কারুশিল্প অত্যন্ত উন্নত ছিল। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে বাংলার জমিদাররা ভূ-সম্পত্তির বাহুবলে স্বাধীন রাজ্যে পরিণত করতে সর্বদা সচেষ্ট ছিল। ফলে বাংলার জমিদারদেরকে বশ্যতা স্বীকার করতে মোঘলদের ৪ বছর (১৬০৮-১৬১২ খ্রী:) সময় লেগেছিল। সপ্তদশ শতকে বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্য, কুটির শিল্প বেড়ে যায়। বড় বড় গ্রাম ও শহরগুলোতে বেড়ে ওঠে কারিগরদের সংখ্যা ও বসতি।

১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজরা প্রথম বাংলাদেশে আগমন করেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত পর্তুগীজ জাতি এদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি কাজ ও ধর্ম প্রচার ইত্যাদি করেন। পর্তুগীজদের মধ্যে অনেকেই এদেশে বিবাহ করে স্থায়ী বসবাস শুরু করেন। এসব স্থায়ী বাসিন্দারা কৃষিক্ষেত্রে অবদান রাখে। তাঁরা এদেশে বাহির থেকে গোল আলু, বাদাম, তামাক, পেঁপে, আনারস, কামরাঙ্গা, পেয়ারা, জলপাই ইত্যাদি এনে চাষাবাদ শুরু করে।

স্থাপত্য শিল্প

কুশান ও গুপ্ত যুগে স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ ঘটে। ওই সময়ে বেশিরভাগ ধর্মীয় ও অন্যান্য অট্টালিকা তৈরি করা হয়েছে কাঠ দিয়ে। বর্তমানে এসবের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। এছাড়াও গুপ্ত যুগে পাথর দিয়েও অট্টালিকা তৈরি করা হয়েছিল। গুপ্তযুগে চারু ও ভাস্কর্য শিল্প ছাড়াও অন্যান্য শিল্পের অগ্রগতি ঘটে।

অন্যদিকে দিল্লীর সুলতান শাহীর আমলে মুসলমানদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ শুরু হয়। ওই সময়ে তিনি মসজিদ, মিনার, সমাধিসৌধ ও মাদ্রাসা নির্মাণ করেন।

মোঘল আমলে যারা কারিগরী শিল্প তৈরি করতেন তাদেরকে তৈরির বিনিময়ে দেয়া হত ফসলের এক ভাগ কিংবা একটুকরো জমি। ফলে মোঘল আমলে স্থাপত্য শিল্পের প্রসার লাভ করে। সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে অন্যান্য সকল শিল্পের চেয়ে স্থাপত্য শিল্প নির্ভরশীল ছিল। ওই সময়ে স্থাপত্য শৈলীর বিচারে দালানগুলো ছিল নিরাভরণ, সরল চাঁদের। দালানে মুসলিম স্থাপত্য শৈলীর পাশাপাশি স্থান পেত ভারতীয় শিল্পীর ঐতিহ্য। মিনারগুলো নির্মিত হত ইট গেঁথে ও তার ওপর চুনের প্রলেপ দিয়ে। বাংলাদেশে কিছু কিছু মসজিদ, মন্দির, ও বসত বাড়ি কারুকার্য দ্বারা নির্মিত হলেও অন্যান্যগুলো তৈরি হতো সাধারণভাবে। বিশেষ করে ইটের গাঁথুনি দিয়ে তৈরি ও চুনকাম করা। দেয়ালগুলোতে জানালা থাকত খুব কম এবং তাও আবার সংকীর্ণ। তবে বর্তমানে স্থাপত্য শিল্পের উন্নতি সাধনে এর পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। চেষ্টা করা হয় বিভিন্ন দালান নির্মাণে নির্মাণশৈলী প্রয়োগ করার।

নাটক ও সাহিত্য

কুশান ও গুপ্ত যুগে মূলত সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। সাহিত্য রচনার উপর ভিত্তি করে এ সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। লোকগীতি অনুযায়ী বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতা এবং লেখক, নাট্যকার ও দার্শনিক পন্ডিত অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত সৌন্দরানন্দ ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। চীনা পরিব্রাজক ইত্সিঙ এর মতে, ওই সময়ে পন্ডিত অশ্বঘোষের কাব্যখানি পাঠকের হৃদয়ে আনন্দ দান করে। পাঠক বার বার তা পাঠ করেও ক্লান্তিবোধ করতেন না। কালিদাসের 'শকুন্তলা' নাটকটি হল সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পকৃতির এক নমুনা। কালিদাসের সকল কার্য ও নাটকের মূল কেন্দ্রে আছে আবেগ-অনুভূতি, ভাবনা-চিন্তা ও আনন্দ বেদনার অভিব্যক্তি। অশ্বঘোষের কাব্য নাটকের তুলনায় কালিদাসের কাব্য তাৎপর্যপূর্ণ।

দিল্লীর সুলতান শাহীর আমলে ফার্সী ভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করে। ওই সময়ে সাহিত্য বিশেষ করে কবিতা ফার্সী ভাষায় রচিত হতে লাগল। সুলতান শাহীর আমলে প্রধান কবি ছিলেন আমির খসরু (১২৫৩-১৩২৫ খ্রী:)। কেবল ফার্সী ভাষাতে নয়,

উর্দু ভাষাতেও খসরু কবিতা লিখতেন। মোঘল আমলে সংস্কৃতি বিশেষ করে সাহিত্য সৃষ্টি কেবলমাত্র বাদশাহের দরবারেই সীমাবদ্ধ ছিল না। আঞ্চলিক ভাষায় ও সাহিত্য রীতিতে প্রকাশ ঘটেছিল সংস্কৃতি। ওই যুগে সাহিত্যের সবচেয়ে প্রভাবশালী ধরণটি ছিল "ভক্তিবাদী কাব্য" বলে ধারণা করা হয়। আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত লোকজগীতিগুলো মধুর সুরে গেয়ে শুনাতেন ভক্তরা ও কবিরা। এসব গানের অনেকগুলো এখনও পর্যন্ত লোকগীতি হিসেবে টিকে আছে। আকবরের শাসনামল থেকে শুরু করে পরবর্তী মোঘল আমলে শ্রেষ্ঠ ভক্তিবাদী কবি ছিলেন তুলসি দাস (১৫৩২-১৬২০ খ্রীষ্টাব্দ)। যাঁর রচিত "রামচরিত মানস" নানাবিধ হিন্দি কথাবুলিতে রূপান্তরিত হয়ে গীত হত হিন্দুদের উৎসবগুলোতে। বাংলায় ওই যুগে বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী রচিত চৈতন্যজীবনী কাব্য "শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত" এবং মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর "চন্ডীমঙ্গল" কাব্য।

আঠারো শতকে বাংলা সাহিত্যের আরও প্রসার ঘটেছিল। এ কালে প্রধান কবিদের মধ্যে বাংলায় অন্যতম সামন্ত, নদীয়া, রাজার সভাকবি "রায় গুণাকর" ভারতচন্দ্র রায় ও রাম প্রসাদ সেন। বাংলা গদ্যের সত্যিকার পথিকৃৎ ছিলেন রামমোহন রায়। বাংলা গদ্যের আধুনিকীকরণে তাঁর অবদান অবিস্মরনীয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত "সংবাদ কৌমুদী" পত্রিকায় তিনি সামাজিক সমস্যা নিয়ে লিখতেন। রাম মোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত বিকাশ-মান বাংলা গদ্য উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ অবধি অনুসৃত হয়েছিল। উনিশ শতকের চল্লিশ দশকের "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকায় লেখক বিশেষ করে অক্ষয় কুমার ধর ও মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর এবং পঞ্চাশের দশকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাতে বাংলা গদ্য তার সমৃদ্ধ রূপ লাভ করে।

আঠারো শতকে মঞ্চের বদলে আবৃত্তির জন্য নাটক লিখিত হয়। প্রাচীন ভারতে জনপ্রিয় নাটকগুলো মেলায় মঞ্চস্থ হত। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ নাগরিকদের জন্য কলকাতায় কোম্পানীয় উদ্যোগে একটি রঙ্গমঞ্চও প্রতিষ্ঠিত হয়। উনিশ শতকের চল্লিশ দশকের মধ্যে কলিকাতায় অনেকগুলো রঙ্গমঞ্চ গড়ে ওঠেছিল। যেগুলোতে বাংলায় অভিনয় চলত। উনিশ শতকের পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে রাম নারায়ণ তর্কা লঙ্কারের "কুলীনকুলসর্বস্ব", মাইকেল মধুসুদন দত্তের "কৃষ্ণকুমারী" শর্মিষ্ঠা, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রৌ" একেই কি বলে সভ্যতা এবং দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ, সধবার একাদশী" ইত্যাদি ঐতিহাসিক ও সামাজিক সমস্যামূলক আধুনিক নাটক ও অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চের অগ্রগতি সাধিত হয়। ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ "ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে বাংলা নাটক ও থিয়েটারের যাত্রা শুরু হয়। অতপর বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে গ্রাম-গঞ্জে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সামাজিক নাটক পুরোদমে শুরু হয়। বর্তমান যান্ত্রিক উন্নতি সাধনের ফলে গ্রামাঞ্চলে মঞ্চস্থ নাটক পরিবেশন নেই বললেই চলে। দেশের বড় বড় শহরগুলোতে বিশেষ করে ঢাকা ও চট্টগ্রামসহ অন্যান্য বিভাগীয় শহরে মঞ্চস্থ নাটক ও থিয়েটার পরিবেশিত হতে দেখা যায়।

বাংলা ভাষার উন্নয়নেও অবদান রাখে পর্তুগীজরা। অনেক পর্তুগীজ শব্দ যেমন- বালতি, ছবি, সাবান, তোয়ালে, আলপিন, বারান্দা, জানালা, কেদারা ইত্যাদি শব্দ বাংলায় স্থান পায়। বাংলা গদ্যের প্রথম বই লিখেন পর্তুগীজরা। অন্যদিকে বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ ও অভিধান রচনা করে তাঁরা।

অস্বীকার করার উপায় নেই, বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি ও বিকাশ হয় মুসলিম শাসনামলে। কেননা চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন রচনা বের হওয়া পর্যন্ত কোন বাংলা কাব্য এ যাবৎ বের হয়নি। চর্যাপদের সময় দ্বাদশ শতক এবং শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন চতুর্দশ শতকের শেষ সময় থেকে পঞ্চদশ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত। ফলে প্রায় দুইশত বছর ধরে বাংলা সাহিত্যের কোন কাব্য রচনা বের হয়নি। বাংলাদেশে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত না হলে বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি হত না।

মধ্যযুগের সাহিত্য ধর্মকেন্দ্রিক। আর প্রাচীনকালে এদেশে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ ধর্ম চালু ছিল। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর হিন্দুদের অবস্থা ফিরে আসে। হিন্দুরা মুসলমানদের সাথে মিলেমিশে বসবাস করে এবং সহযোগিতা করে। তারপর সৃষ্টি হয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি। সোলতানী আমলে কৃত্তিবাস, মালাধরাস, পরমেশ্বর, শ্রীকরনন্দ, দ্বিজশ্রীধর, চন্ডীদাস, বিজয় গুপ্ত ও বিপ্রদাস পিপিলাই ইত্যাদি হিন্দু কবিরা কাব্য রচনা করেন। বলার অপেক্ষা রাখে না, বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কবিগণ সকলেই হিন্দু। মুসলিম সোলতানগণ তাদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা করত। পরে মুসলিম কবিরাও কাব্য রচনা করেন বাংলা সাহিত্যে। উদাহরণস্বরূপ- শাহ মোহাম্মদ সগির সোলতানী আমলে কাব্য রচনা করেন বলে জানা যায়। (তথ্য সূত্রঃ ১। ভারতবর্ষের ইতিহাস, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো।)

চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি

পূর্ব বাংলার দক্ষিণ অঞ্চলের পুরাতন একটি জেলার নাম চট্টগ্রাম। তিন পার্বত্য জেলাসহ চট্টগ্রাম জেলা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৬৬৬ সালে। ১৮৬৪ সালে চট্টগ্রাম পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ জেলার উত্তরে ফেনী জেলা ও ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, দক্ষিণে কক্সবাজার জেলা, পূর্বে বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলা এবং পশ্চিমে নোয়াখালী জেলা ও বঙ্গোপসাগর।

প্রাচীনকালে চট্টগ্রাম সভ্যতার গোড়াপত্তন ঘটে। প্রাচীনকাল থেকে চট্টগ্রাম বন্দর বিশ্বব্যাপী পরিচিত ছিল। নবম শতাব্দীতে চট্টগ্রাম বন্দর আরব বণিকদের ব্যবসার কেন্দ্র ছিল। ওই সময় এ এলাকা "দ্বার-ই-বঙ্গ বা বঙ্গের দরজা নামেই পরিচিত ছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীতে মুসলমানরা চট্টগ্রামে আসার আগ পর্যন্ত এ অঞ্চল আরাকান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সোলতান ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ (১৩৩৮-১৩৪৯ খ্রিঃ) বাহরাম খানের মৃত্যুর পর সোনারগাঁও এর সিংহাসনে বসেন। ১৩৪০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি চট্টগ্রাম অঞ্চল দখল করেন। ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানীরা আবার দখল করে চট্টগ্রাম অঞ্চল।

এ সময় থেকে মোঘল শাসনের আগ পর্যন্ত উক্ত অঞ্চল দখলে ছিল পর্তুগীজ ও মগদের। ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে শায়েস্তা খান পর্তুগীজদের বিতাড়িত করে এ অঞ্চল দখল করে। তখন চট্টগ্রামের নামকরণ করা হয় ইসলামাবাদ। পন্ডিত ও ঐতিহাসিকগণ চট্টগ্রামকে নানা নামে অবহিত করেছেন। যেমন (১) আদর্শ দেশ (২) সূক্ষ্ম দেশ (৩) কীং বা কানেল (৪) রম্যভূমি (৫) চিতাগাঁও (৬) চিৎগাঁও (৭) চট্টল (৮) চৈত্যগ্রাম (৯) সপ্তগ্রাম (১০) চট্টলা (১১) চক্রশালা (১২) চন্দ্রনাথ (১৩) চরতল (১৪) চিতাগঞ্জ (১৫) চাঁটগাঁও (১৬) শ্রী চট্টল (১৭) সাতগাঁও (১৮) সীতাগাঙ্গ (১৯) সতের কাউন (২০) পুষ্পপুর (২১) রামেশ (২২) কর্ণবুল (২৩) শহরে সবুজ (২৪) পার্বতী (২৫) খোর্দ আবাদ (২৬) Portogrando (২৭) ফতেয়াবাদ (২৮) আনক (২৯) রোশাং (৩০) চঁড়িয়া (৩১) ইসলামাবাদ (৩২) মগ রাজ্য এবং (৩৩) Chittagong.

গবেষক আবদুল হক চৌধুরী তাঁর "বন্দর শহর চট্টগ্রাম" গ্রন্থে চট্টগ্রামের ১৪টি নাম উল্লেখ করেছেন। এগুলো হলো (১) চৈত্যগ্রাম (২) চতু গ্রাম (৩) শ্যাংগাঙ্গ (৪) চট্টল (৫) চিৎতৌং গৌং (৬) চাটি গ্রাম (৭) চাটি গাঁ (৮) চতকাঁও/চাটগাঁও (৯) সুদ কাওয়ান (১০) চাটিকিয়াং (১১) শাতজাম (১২) চাটিগাম (১৩) জেটিগা (১৪) চইট্রেগং। ঐতিহাসিকরা চট্টগ্রামের নামের উৎপত্তি সম্পর্কে ৩২টি সম্ভাব্য নামের বিবরণ দিয়েছেন। সুদ কাওয়ান, চতগাঁও, চাটিগ্রাম, চা-টি-কিয়াং, শাতজাম, চাটিগাম, চাটিকান, জেটিগা ইত্যাদি। তবে চাটগাঁও, চাটিগাও বা চাটিগ্রাম থেকে চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি হয়েছে।

সোলতান জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ শাহ (১৪১৮-১৪৩২) এর শাসনামলে মুদ্রায় চতকাঁও উল্লেখ ছিল। ঐতিহাসিক ড. আবদুল করিমের মতে চট্টগ্রামের ১৬টি নাম রয়েছে। ইবনে বতুতার (১৩৪৬ খ্রি:) সফর নামায় সুদকাওয়ান, মুজাফ্ফর শামস বলখীর (১৩৯৭ খ্রি:) চিঠিতে চাটগাঁও, গিয়াস উদ্দীন আজম শাহের (১৪১০ খ্রি:) মুদ্রায় চতকাঁও, দনুজ মর্দন দেবের (১৪১৮ খ্রি:) মুদ্রায় চাটিগ্রাম, মহেন্দ্র দেবের (১৪১৯ খ্রি:) মুদ্রায় চাটিগ্রাম, সোলতান জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ শাহের (১৪৩০ খ্রি:) মুদ্রায় চতকাঁও, চীনা পরিব্রাজকের বর্ণনায় চা-টি-কিয়াং, তুর্কি এডমিরাল সিদি আল রইসের বর্ণনায় (১৫৫০ খ্রি:) শাতজাম, র‍্যালফ ফিসের বর্ণনায় চাটিগ্রাম, আবুল ফজলের "আইনী আকবরী" গ্রন্থে চাটিগাঁও, ডি-ব্যারসের মানচিত্রে (১৫৫০ খ্রি:) চাটিগ্রাম, বৈষ্ণব সাহিত্যে চাটিগ্রাম, সপ্তদশ শতাব্দীতে (১৬০৬ খ্রি:) বাহরাম খা, কবি দৌলত উজিরের রচনায় চাটিগ্রাম, কবি মোহাম্মদ খাঁর (১৬৪৬ খ্রি:) কাব্যে চাটি গ্রাম, ফ্রান্সিস বুকানন (১৬৬০ খ্রি:) এর মানচিত্রে জেটি গাঁও ও ফ্রান্সোয়া পিরারডের বর্ণনায় চাটিকান।

বৌদ্ধ পন্ডিত লামা তারানাথের বিবরণের ভিত্তিতে এসসি দাশের মতে, প্রাচীন চাটিগ্রাম বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ নগরী ছিল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভরপুর ছিল। নালন্দার পতনের পরে চট্টগ্রাম বৌদ্ধধর্মের প্রাণকেন্দ্র ছিল। মরক্কোর পর্যটক ইবনে

বতুতা বাংলাদেশ ভ্রমণকালে (১৩৪৬-১৩৪৭ খ্রি:) বলেন, বাংলাদেশে প্রথম যে শহরে তিনি প্রবেশ করে তার নাম ছিল সুদকাওয়ান। এটি সমুদ্রের তীরে অবস্থিত একটি শহর। ডি ব্যারসের মানচিত্রে বন্দরটিকে চট্টগ্রাম নামে অবহিত করা হয়েছিল। ৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানের রাজা সুলত ইঙ্গ চন্দ্রয় কর্তৃক চিৎ তৌং গৌং উক্তির ফলে চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি। অন্য একটি জনশ্রুতি মতে, বদরের চাটি থেকে চট্টগ্রামের উৎপত্তি হয়েছে। কোন কোন ঐতিহাসিকগণের মতে সপ্তগ্রাম অঞ্চল হতে লোকজন এ অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য এসেছেন এবং বসতি স্থাপন করেছেন। ফলে সপ্তগ্রাম পরিবর্তিত হয়ে চট্টগ্রাম হয়। নবাব শায়েস্তা খান ১৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম বিজয় করেন। ওই সময়ে প্রধান সেনাপতি ছিলেন তাঁর পুত্র বুজুর্গ উমেদ খান। তিনি চট্টগ্রামের নামকরণ করেন ইসলামাবাদ। বর্তমানে ইংরেজি Chittagong এবং বাংলায় চট্টগ্রাম। এ শব্দ দু'টি চিতাগাঁও বা চিৎগাঁও, চৈত্যগ্রাম, সপ্তগ্রাম, চিতাগাঁও, চাটিগাঁ প্রভৃতি মূল শব্দ থেকে উৎপত্তি। ঐতিহাসিকদের ধারণা, চট্টগ্রাম অঞ্চলে বহু বৌদ্ধ চৈত্য ছিল বলেই নাম হয়েছে চৈত্যগ্রাম। পরবর্তীতে এ চৈত্যগ্রাম বিকৃত হয়ে চট্টগ্রাম হয়। কোন কোন পন্ডিতের মতে, আরবী শব্দ শৎ (বদ্বীক) এবং গঙ্গ (গঙ্গা) হতে চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি হয়। যেভাবে চট্টগ্রামের নামের উৎপত্তি হোক না কেন চট্টগ্রাম দেশের গুরুত্বপূর্ণ জেলা ও প্রধান সমুদ্র বন্দর। দেশের উন্নয়ন ও চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে চট্টগ্রাম। কবি বেগম সুফিয়া কামাল লিখেছেন,

বার আউলিয়ার পদধূলি পুত পূণ্য চট্টগ্রাম
ইতিহাসে যার গৌরবময় "ইসলামাবাদ" নাম।
কর্ণফুলীর স্রোতধারা বহে পণ্যের সম্ভার
সারা বিশ্বের মানুষেরা যেথা আনে নানা উপহার।
বাংলাদেশের প্রাণের প্রবাহ বন্দর তীরে তীরে
সাগর নদীতে মিলিত মোহনা সাম্পানে আসে ফিরে।

তথ্যসূত্র:

১। বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল- প্রফেসর আবদুল করিম।
২। চট্টগ্রামের ইতিহাস- জামাল উদ্দীন, পৃষ্ঠা-২০।
৩। চট্টগ্রাম পরিক্রমা, ১ম সংখ্যা, নভেম্বর ২০১২।
৪। জেলা তথ্য: চট্টগ্রাম, জুলাই ২০০৫।

তৃতীয় অধ্যায়

লোহাগাড়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

Chunati.com
Pioneer in village based website

ইতিহাসে কোন কথার শেষ নেই। আজ যা সিদ্ধান্ত করা হয়, নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হলেই হয়তো তা পুনর্বিবেচিত হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। কোন সমসাময়িক উপকরণ আবিষ্কৃত হলে ঐতিহাসিকদেরও নতুনভাবে চিন্তা করতে হয় এবং প্রাপ্ত উপকরণের আলোকে স্বীয় সিদ্ধান্ত বারবার পরিবর্তন করতে হয়।

- বিখ্যাত ঐতিহাসিক প্রফেসর ড. আবদুল করিম

লোহাগাড়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ইতিহাস থেকে জানা যায়, ভৌগলিকভাবে বাংলাদেশেল ভূ-প্রকৃতিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামের পাহাড় অঞ্চল টারশিয়ারী যুগের। চট্টগ্রাম অঞ্চল এবং বাঁশখালী ও সাতকানিয়ার পাহাড়ি অঞ্চল মায়োসিন যুগের বলে ধারণা করা হয়। এ যুগের শেষের দিকে সাতকানিয়ার পাহাড়ের উৎপত্তি হয়েছে। এ যুগে ভীষণ ভূমিকম্পের ফলে পাহাড়ের উৎপত্তি হয়।

সাতকানিয়া-লোহাগাড়া পাহাড় বেষ্টিত একটি অঞ্চল। তাই লোহাগাড়ার মত ক্ষুদ্র অঞ্চলের ইতিহাস রচনা করতে গেলে চট্টগ্রাম ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কথা ওঠে আসে। বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ড. আবদুল করিমের মতে, বর্তমানে বান্দরবানে বসবাসরত উপজাতিদের পূর্ব পুরুষরা দক্ষিণ চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চলে (বাঁশখালী, সাতকানিয়া, লোহাগাড়া) বাস করত। কেননা, উপজাতিরা সাধারণত পাহাড়ঘেঁষা হয়। তারা পাহাড়ে বসবাস করতে বেশি পছন্দ করে। উপজাতিরা সম্ভবত সম্রাট অশোক (খ্রী: পূর্ব ২৭৩-২৩৬) এর সময়ে পাহাড়ি অঞ্চলে এসেছেন। ওই সময়ে চট্টগ্রাম ও আরাকান অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্ম প্রসার লাভ করে। অন্যদিকে চট্টগ্রাম অঞ্চল ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য সুবিধাজনক স্থান ছিল। ফলে মধ্যযুগে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম ব্যবসায়িরা সমুদ্র পথে এ অঞ্চলে আসতে থাকে। ওই সময়ে বাঁশখালী ও সাতকানিয়া (লোহাগাড়াসহ) অঞ্চল বৌদ্ধ শাসনাভুক্ত ছিল। পাল বংশের শক্তিশালী রাজা ধর্মপাল (৭৭০-৮১০ খ্রী:) সহ পাল বংশের অন্যান্য রাজারা চট্টগ্রাম অঞ্চলে রাজত্ব করেন। চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে সচেষ্ট ছিলেন পালবংশের রাজারা। তবে দক্ষিণ চট্টগ্রামে পাল বংশের আধিপত্য ছিল কিনা তা সন্দেহ করেন ইতিহাসবিদরা। পাল আমলে বা সেন আমলে গৌড় নামে পরিচিত ছিল বাংলাদেশ। আরাকান রাজারা ১১৬৭ খ্রী: পর্যন্ত দক্ষিণ চট্টগ্রামের বাঁশখালী, সাতকানিয়া-লোহাগাড়া অঞ্চল শাসন করেন। ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ চট্টগ্রাম বিজয় করলে আরাকানীদের রাজত্ব দূর্বল হয়ে পড়ে। ওই সময়ে আরাকান, ত্রিপুরা ও মুসলিম সুলতানদের মধ্যে প্রায় সময় যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে থাকত। ১৬৬৬ সালে শায়েস্তা খান চট্টগ্রাম বিজয় করলে মোঘলরা টেকনাফ পর্যন্ত কর্তৃত্ব লাভ করে। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঁশখালী, সাতকানিয়া-লোহাগাড়াসহ চট্টগ্রাম অঞ্চল মোঘলদের অধীনে ছিল। এরপর চট্টগ্রাম অঞ্চলে আসে ইংরেজদের কর্তৃত্ব। মোঘলরা ১৬৬৬ সালে চট্টগ্রামের নামকরণ করেন ইসলামাবাদ। ইংরেজরা নতুন নামকরণ করেন চিটাগাং। চট্টগ্রামের প্রায় ৩২টি সম্ভাব্য নামকরণের মধ্যে চাটগাঁও, চাটিগাঁও, ও চাটিগ্রাম থেকে চট্টগ্রামের নামকরণ হয়েছে বলে বেশিরভাগ ইতিহাসবিদরা মনে করেন।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, ১৭৬০খ্রীষ্টাব্দে নবাব মীর কাসিম আলী চট্টগ্রামের শাসনভার ইংরেজ কোম্পানীর হাতে ছেড়ে দেন। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী রাজস্ব সংগ্রহের জন্য চট্টগ্রামকে ৯টি চাকলায় বিভক্ত করে। কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণে পটিয়া, লোহাজারী, আনোয়ারা ও বাঁশখালীসহ ৪টি চাকলা হয়। সাতকানিয়াকে রাখা হয় লোহাজারী চাকলায়। উক্ত চাকলা ব্যবস্থায় সাতকানিয়া তথা লোহাগাড়ার সীমারেখা দেয়া হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। চৌধুরী শ্রী পূর্ণচন্দ্র দেব ব্রহ্মা তাঁর "চট্টগ্রামের ইতিহাস" গ্রন্থে লিখেছেন ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ জানুয়ারী হতে চট্টগ্রাম অঞ্চলে মুসলমানদের রাজত্ব শুরু হয়। বুজুর্গ উমেদ খাঁ চট্টগ্রাম অঞ্চলকে ইসলামাবাদ নাম দিয়ে ৭টি চাকলায় বিভক্ত করেন।

নবম, দশম ও একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত পালবংশ অর্থাৎ বৌদ্ধ শাসন ব্যবস্থা ছিল চট্টগ্রামে। বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খান চট্টগ্রামের শাসন নিলে চট্টগ্রামে আরকানী শাসন তথা মগা কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হয়। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সিস বুকানন নামক এক ইংরেজ কৃষি বিজ্ঞানী সাতকানিয়াসহ দক্ষিণ চট্টগ্রামে ভ্রমণ করেন। তিনি সাতকানিয়ার পাহাড়সমূহে পান, তামাক ও বিভিন্ন তরিতরকারীর কথা, জীবজন্তুর কথা ও ধান চাষের কথা লেখেন। উপরের আলোচনায় এটি পরিষ্কার যে, সাতকানিয়ার কথা ওঠে আসলেও লোহাগাড়া নামকরণের কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী চট্টগ্রাম তথা সাতকানিয়াতে বহুবার জরীপ কার্য চালায়। মগী ভাষায় লিখিত এসব জরীপ কাগজে সাতকানিয়া (লোহাগাড়াসহ) অঞ্চলের তথ্য রয়েছে বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন। অপর দিকে বিট্রিশ তথ্যানুসন্ধানে পারদর্শী। তাঁর জমিদারী ও শাসনভার গ্রহণের পর অনেকবার চট্টগ্রাম অঞ্চলে জরীপ পরিচালনা করেন সিজিএস এলেন নামক এক ইংরেজ ভূমি জরীপ ও ভূমি রেকর্ডের কাজ সমাধা করেন ১৮৮৮ হতে ১৮৯৮ সনে ক্যাডাষ্ট্রাল সার্ভের মাধ্যমে তিনি এ অবিশ্বাস্য কাজটি করেন। এ জরীপ বিশ্লেষণ করলে সাতকানিয়া তথা লোহাগাড়ার নামকরণ উদ্ধার করা যাবে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন। এছাড়াও ১৯২১-১৯২৮ সালে হয়েছে রিভিশনাল জরীপ (আরএস)। এ জরীপে সাতকানিয়া-লোহাগাড়ার অনেক তথ্য খুঁজে পাওয়া যাবে বলে ধারণা করা হয়।

ইতিহাসবিদদের মতে, প্রাচীনকালে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মগরা চট্টগ্রাম অঞ্চলে (সাতকানিয়া, বাঁশখালী ও লোহাগাড়াসহ) বসবাস করেছেন। ওই সময়ে আরব বণিকরা সমুদ্র পথে চট্টগ্রামের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন। প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (স:) এর আবির্ভাবের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার-প্রসারে বণিক, সূফী, দরবেশ ও প্রচারকগণ চট্টগ্রাম ও আরাকানের বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছেন। ক্রমক্রমে তাঁরা এতদাঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ফলে লোহাগাড়ার অনেক পীর, দরবেশ ও সুফি সাধকের আবাসস্থল গড়ে ওঠে। সুলতান হুসেন শাহের শাসনামলে চট্টগ্রাম অঞ্চলে মুসলিম সমাজের বিস্তার ঘটে। নির্মিত হয় বহু মসজিদ ও দরগাহ। পীর আউলিয়াদের মধ্যে লোহাগাড়ার শাহপীর আউলিয়া

অন্যতম। দীর্ঘদিন যাবৎ আরাকানীদের শাসনামলে এ অঞ্চলে ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটে। কালক্রমে এ অঞ্চলটি মোঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। ওই সময়ে আরাকানীদের সাথে মোঘলদের প্রতিনিয়ত যুদ্ধ হত। আরাকান রাজার আক্রমনকে মোকাবেলা করতে মোঘল সম্রাটরা দুইজন অধিনায়ককে শঙ্খ নদীর উত্তর পাশে মোতায়ন রাখতেন। একজন হলেন বর্তমান খান পরিবারের মরহুমা বেগম করিমুন্নেছার পূর্ব পুরুষ এবং অপরজন হাজারী পরিবারের ভাগিরথ সিংহ হাজারীর পূর্ব পুরুষ। উক্ত যুদ্ধে আরাকানী রাজা পরাজিত হয়ে নাফ নদীর দক্ষিণে গিয়ে তাদের রাজ্যসীমা সংকুচিত করে। মগরা এ অঞ্চল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ বর্তমান মিয়ানমারে চলে যায়। মগরা যাওয়ার সময় অনেকেই এ অঞ্চলে লোহা জাতীয় ধন-সম্পদ মাটির নিচে গেঁড়ে (গর্ত করে) পালিয়ে যায়। লোহা জাতীয় ধন সম্পদ মাটি গাঁড়া করে রাখার ফলেই লোহাগাড়া নামকরণ হয়েছে বলে মনে করা হয়।

তাজমলের নির্মাতা সম্রাট শাহজাহান (১৬২৭-১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দ) ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র দারা শিকোকে সিংহাসনের দায়িত্ব দেন। সম্রাট শাহজাহানের ৪ ছেলে ও ২ মেয়ে। ছেলেরা হলেন- দারা শিকো, শাহ সুজা, আওরঙ্গজেব ও শাহ মুরাদ। মেয়েরা হলেন- রওশন আরা ও জাহানারা। চার ছেলের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শিকো উচ্চ শিক্ষিত এবং শাহজাহানের প্রিয় ছিলেন। সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে কোন নিয়মনীতি ছিল না। তাই শাহজাহানের চার ছেলের মধ্যে প্রতিনিয়ত সিংহাসন নিয়ে সংঘর্ষ হতো। দারা শিকোর যুদ্ধের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। সম্রাট শাহজাহান তাঁকেই সারা বছর দরবারে ধরে রেখেছিলেন।

শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র শাহ সুজা দীর্ঘদিন ধরে বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন। শাহজাহান মারা গেল এই ভুল খবর পেয়ে সুজা সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে "পাতশাহ" ঘোষণা করলেন। সম্রাট শাহজাহানের চার ছেলের মধ্যে রেষারেষি ও যুদ্ধ বিগ্রহ চলে ২ বছরের অধিক সময় ধরে। তার পরিমাণে বিজয়ী হন আওরঙ্গজেব।

১৬৫৬ সালে বার্ধক্যজনিত অসুস্থায় তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শিকো সিংহাসনের দাবিদার হন। কিন্তু তৃতীয় রাজকুমার আওরঙ্গজেব এ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেনি। তিনি ভাই শাহ সুজা (১৬৩৯-১৬৬০ পর্যন্ত বাংলার গভর্ণর ছিলেন) সিংহাসন দখলের জন্য প্ররোচিত করেন। শাহ সুজা ১৬৬০ সালে নিজেকে বাংলার সুলতান হিসেবে ঘোষণা দেন। কিন্তু সুজার এ ঘোষণা সম্রাট শাহজাহান এবং দারা শিকো উভয়েই বিদ্রোহ হিসেবে আখ্যা দিয়ে রাজকীয় বাহিনী প্রেরণ করেন। যার ফলশ্রুতিতে সুজা ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ মে নিজ পরিবারের সদস্যবর্গ, ৩ হাজার সৈন্য ও ২০০ জন একান্ত অনুগামী নিয়ে চট্টগ্রাম তথা ইসলামাবাদ হয়ে আরাকান অভিমুখে যাত্রা করেন। সাথে প্রয়োজনীয় রসদ সামগ্রী ও অস্ত্রশস্ত্র নেন। ২০০ জন একান্ত অনুগামীর মধ্যে মুচি, মেথর, ডোম, জেলে, বান্দি, নাপিত, কুমার-কামার প্রভৃতি নিম্নশ্রেণির লোক ছিল। জনশ্রুতি আছে, পালিয়ে যাওয়ার সময় শাহ সুজা চারিদিকে জঙ্গল সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক মনোরম স্থান লোহার দিঘী নামক স্থানে আস্তানা স্থাপনের নির্দেশ দেন। সেখানে তারা

লোহা জাতীয় অস্ত্রের মাধ্যমে দিঘী খনন করে দূর্গ স্থাপন করে বিশ্রাম নেন। লোহার দন্ড গেঁড়ে সীমানা নির্ধারণ করে। অন্য বর্ণনা মতে, শাহ সুজা বিশাল বাহিনী নিয়ে চট্টগ্রাম থেকে লোহাগাড়া হয়ে আরাকানে যাচ্ছিলেন। যাত্রা পথে তিনি পাহাড় বেষ্টিত চুনতির মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যে মুগ্ধ হয়ে সেখানে যাত্রা বিরতি করেন। চুনতি থেকে চলে যাওয়ার সময় শাহ সুজা সেখানে চিহ্নস্বরূপ একটি লোহার দন্ড গেঁড়ে দিয়ে যান। লোহার দন্ড গেঁড়ে রাখার ফলে লোহাগাড়া নামকরণ হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। লোহা গেঁড়ে সীমানা নির্ধারণ ও বসতি স্থাপনের ফলে লোহাগাড়া নামকরণ হয়েছে বলে অনেকেই মনে করেন। তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, লোহার দিঘী মনে করিয়ে দেয় লোহাগাড়া নামকরণের উৎপত্তি। পরবর্তীতে ওই এলাকা আবাদ হওয়ার পর অন্যস্থান থেকে লোকজন এখানে এসে বসতি স্থাপন করেন।

লোহাগাড়া নামকরণের সন্ধান অত্যন্ত কঠিন কাজ। ঐতিহাসিকবিদদের মতে, সাতকানিয়া অঞ্চলে সোনাকানিয়া, রূপকানিয়া, লোহাগড়া ও চুনতিসহ সাতটি খনি ছিল। লোহাগড়ায় লোহার খনি ও চুনতিতে চুনাপাথরের খনি ছিল। অন্যান্য তিনটি অঞ্চলে তিনটি খনি ছিল বলে প্রবাদ আছে। লোহাগড়ার খনি থেকে লোহা উত্তোলন করার কারণে লোহাগাড়া নামকরণ হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

ইতিহাসবিদদের ধারণা, সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে চট্টগ্রামে বসতি গড়ে উঠার পরপরই লোহাগাড়ার নামকরণ হয়েছে। তবে, লোহাগাড়া নামের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। লোহাগাড়ার ইতিহাস লেখার কোন চেষ্টাও এ পর্যন্ত হয়নি। ইতিহাস রচনার জন্য ইচ্ছা, অর্থ ও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। সাধারণত যেই গ্রামে থানা কেন্দ্র অবস্থিত সেই গ্রামের নামানুসারে থানার নামকরণ হয়।

অনুসন্ধানে জানা যায়, লোহাগাড়ার চারিদিকে পাহাড়। এ অঞ্চলের অধিবাসীরা রোসাঁই বা রোসাঙ্গী নামে পরিচিত রয়েছে। আরাকান থেকে এসে বসতি স্থাপন করেছে বলে তাদেরকে রোসাঙ্গী বলা হয়। মগরা টেকনাফ, উখিয়া এবং কক্সবাজারের আশ-পাশের এলাকা ও মুসলমানরা শঙ্খ নদীর তীর পর্যন্ত বসতি স্থাপন করে। লোহাগাড়ার এ অঞ্চলকে কালক্রমে বর্মী, আরাকানী, ত্রিপুরা, মোঘল, পর্তুগীজ ও ইংরেজরা শাসন করেছে। যার ফলে লোহাগাড়াসহ দক্ষিণ চট্টগ্রামের অন্যান্য অঞ্চলে তাদের সংস্কৃতি এখনো রয়েছে। এলাকাবাসীর আচার-আচরণেও তাদের সংস্কৃতি লক্ষ্য করা যায়।

পর্তুগীজ ঐতিহাসিক জোয়াও দ্যা ব্যারসের মানচিত্রে (আনুমানিক ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে অঙ্কিত) দক্ষিণ চট্টগ্রাম অঞ্চলে মাত্র ২/৩টি স্থানের নাম পাওয়া যায়। যার মধ্যে চকরিয়া প্রধান। সাতকানিয়া তথা লোহাগাড়ার কোন নাম নেই। ব্যরসের মানচিত্রে সমগ্র দক্ষিণ চট্টগ্রাম জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। তবে দক্ষিণ চট্টগ্রাম আবাদ হয় ইংরেজ শাসনামলে। মোঘল শাসনামলে ঝোঁপ-জঙ্গল পরিস্কার করা হয়। ঝোঁপ-জঙ্গল পরিস্কার করে বসতিস্থাপন ও চাষাবাদ করা হয়েছে বলে ঐতিহাসিকবিদদের ধারণা।

ইংরেজদের রেকর্ডপত্রেও দক্ষিণ চট্টগ্রাম ঝোঁপ-জঙ্গল এলাকা ছিল। চট্টগ্রাম অঞ্চল তথা সমগ্র ভারতবর্ষ ও বার্মা ইংরেজরা ১৮৭ বছর পর্যন্ত শাসন করে। মোঘলরা শাসন করে ৯৪ বছর। ইংরেজরা ভারতবর্ষ দুইভাগে (পাকিস্তান ও ভারত) বিভক্ত করে শাসনভার ত্যাগ করে।

লোহাগাড়ার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে ডলু, টংকা ও হাঙ্গর নামের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ খাল। আরাকান রাজাদের আমলে এ অঞ্চলে ডলু, টংকা ও হাঙ্গর দিয়ে যাতায়াত হত। মোঘল আমলে অর্থাৎ শাহ সুজার শাসনামলে আরাকান সড়ক (চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক) স্থাপিত হলে সাতকানিয়া-লোহাগাড়ায় ব্যবসা ও প্রশাসনিক কেন্দ্র গুরুত্ব পায়। ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে জেলাকেন্দ্রে কালেক্টরী পদ্ধতি চালু হলে পরে রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে সাতকানিয়ার দেওদিঘীতে সাতকানিয়া-লোহাগাড়ার কালেক্টরী অফিস স্থাপিত হয়। পরবর্তীতে ১৮৯৭-৯৮ সালে সাতকানিয়ার সমগ্র অঞ্চলকে নিয়ে পুরো প্রশাসনিক অঞ্চল চিহ্নিত করা হয়। লোহাগাড়াকে সাতকানিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু লোহাগাড়ার চুনতি পুলিশ ফাঁড়ি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৪ সালে। ১৯১৭ সালে গঠিত হয় সাতকানিয়া থানা। ১৯৮১ সালের ২০ মে লোহাগাড়া থানা গঠিত হয়।

লোহাগাড়া নামকরণের ক্ষেত্রে লোহা-গেঁড়ে-গাঁড়া এ শব্দগুলোর সম্পৃক্ততা আছে। ইতিহাস-ঐতিহ্যের নিরিখে উক্ত শব্দগুলোর যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। লোহাগাড়া অঞ্চলে বসতি গড়ে ওঠার শুরুর দিকে আরাকান, ত্রিপুরা, মোঘল, পর্তুগীজ ও ইংরেজরা আসেন। আরাকানী ও ত্রিপুরাদের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ-মারামারি হত। যুদ্ধে তারা লোহা জাতীয় অস্ত্র যেমন- কামান, তলোয়ার ইত্যাদি ব্যবহার করত। যুদ্ধ শেষে লোহা জাতীয় অস্ত্র গেঁড়ে (গর্ত) করে দূর্গ তৈরি করত। আরাকানী মগদের লোহা জাতীয় অনেক গুপ্তধন মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মগদের ঐতিহ্য ও সভ্যতার অনেক নির্দশন এলাকায় এখনো রয়েছে। লোহাগাড়ার আনাচে-কানাচে এখনো আছে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর নানান প্রাচীন স্থাপত্য। ফলে লোহা ও গাড়া শব্দ দুটির সমন্বয়ে লোহাগাড়া নামকরণ আপনা আপনি প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

লোহাগাড়া নামকরণ যেভাবেই হোক না কেন লোহাগাড়া নামের উৎপত্তি নিয়ে আরো কিছু কিংবদন্তী বা জনশ্রুতি সমাজে প্রচলিত আছে। এসব জনশ্রুতি সত্য হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। কিন্তু আমরা সকলেই জানি ও মানি ইতিহাস যুক্তিনির্ভর। ইতিহাস তৈরি হয় তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে। লোহাগাড়া নামকরণের জনশ্রুতি সত্য হোক না হোক লোহা এবং গাড়া-এ দুটি শব্দের সমন্বয়ে লোহাগাড়া নামটি হয়েছে। লোহাগাড়া নামকরণের ব্যাপারে এলাকায়ও রয়েছে কিছু জনশ্রুতি।

জনশ্রুতি-১:

মধ্যযুগে বাঙালি যুদ্ধের প্রয়োজনে মাটিতে গর্ত করে দূর্গ নির্মাণ করত। দূর্গের চর্তুদিকে পরিখা খনন করে লোহা জাতীয় অস্ত্র গেড়ে রাখত। লোহা গেড়ে রাখার কারণে লোহাগাড়া নামকরণ।

জনশ্রুতি-২: দরবেশ হাট এলাকায় ব্রিটিশরা একটি বিমানবন্দর করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। প্রস্তাবিত বিমানবন্দরের জায়গায় নির্মাণের সুবিধার্থে লোহার দন্ড মাটির নিচে প্রবেশ করানো হয়। যতবার লোহার দন্ড মাটির নিচে প্রবেশ করানো হয় ততবারই লোহার দন্ড মাটির নিচে অদৃশ্য হয়ে যায়। এক পর্যায়ে ব্রিটিশ কারিগররা বিমানবন্দরের নির্মাণের কাজ পরিত্যক্ত ঘোষণা করে। লোহা মাটির নিচে গাঁড়ার ফলেই লোহাগাড়া নামকরণ হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

জনশ্রুতি-৩: দেওয়ান মহাসিং নামের একজন শিখ ধর্মাবলম্বী (১৭৫৩-১৭৫৮) শঙ্খ নদীর দক্ষিণাঞ্চলসহ সাতকানিয়া-লোহাগাড়া থেকে আরাকানীদেরকে বিতাড়িত করে। ওই সময়ের যুদ্ধে লোহা জাতীয় অস্ত্র-কামান, তলোয়ার ইত্যাদি প্রচুর ব্যবহার হত। মাটিতে গর্ত করে অস্ত্রগুলো মজুদ করে রাখা হত।

জনশ্রুতি-৪: প্রাচীনকাল থেকে লোহাগাড়া অঞ্চলে আরাকানী ও পাহাড়িদের বসবাস। আরাকানী ও ত্রিপুরাদের মধ্যে প্রায়ই সময় যুদ্ধে লোহা জাতীয় অস্ত্র ব্যবহার হত। যুদ্ধ শেষে অস্ত্রগুলো মাটিতে গর্ত করে রাখা হত।

জনশ্রুতি-৫: সাতকানিয়া তথা লোহাগাড়া অঞ্চলে প্রথম জরীপকালে লোহার দিঘী নামক জায়গায় লোহার দন্ড গেঁড়ে সীমানা নির্ধারণ করা হয়। ফলে লোহাগাড়ায় লোহার দিঘী নামে একটি এলাকার নাম রয়েছে।

জনশ্রুতি-৬: দরবেশ হাট এলাকায় মোহাম্মদ খাঁ নামে এক উজির বাস করতেন। এলাকায় পানি সংকট সৃষ্টি হলে জনৈক উজির মাটিতে লোহার দন্ড গেঁড়ে পানি উত্তোলন করে পানির সংকট দূর করেন।

জনশ্রুতি-৭: নবাব শায়েস্তা খাঁ (১৬৬৪-৭৮, ১৬৮০-৮৮ খ্রী:) এর আমলে কিছু সংখ্যক সৈন্য লোহার দিঘী নামক স্থানে অবস্থান নেয়। নিরাপত্তার জন্য তাদের অবস্থানের চারিদিকে লোহা দিয়ে লোহার দূর্গ বা বলয় তৈরি করে। লোহা দিয়ে দূর্গ তৈরি করার কারণে লোহাগাড়া নামকরণ হয়েছে। সোলতানী কিংবা মোঘল আমলে লোহার দিঘী স্থানে আরাকানী আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য লোহগড় (লোহার দূর্গ) হয়েছিল বলে লোহাগাড়া নামকরণ হয়েছে।

লোহাজাতীয় অস্ত্র ব্যবহার, অস্ত্র মাটিতে গেঁড়ে মজুদ রাখা, লোহা গেঁড়ে দূর্গ তৈরি করা, লোহার দন্ড গেঁড়ে সীমানা নির্ধারণ ও লোহার দন্ড গেঁড়ে পানি উত্তোলন ইত্যাদিতে লোহাগাড়া নামকরণের সার্থকতা আছে বলে মনে করা হয়। আগেই বলেছি, মোঘল আমলে অর্থাৎ শাহ সুজার আমলে আরকান সড়ক হয়। ইংরেজ আমলে লোহাগাড়ার ঝোঁপ-জঙ্গল পরিষ্কার হয়ে আবাদ ও বসতি স্থাপন হয়। ইংরেজ শাসনামলে এলাকা জরীপ হয়। আর ইংরেজ শাসকরা জনগণের নিরাপত্তা ও সুশাসনের দিকে খেয়াল রাখত। ফলে আরাকানসহ অন্যান্য এলাকা থেকে লোকজন চট্টগ্রাম দক্ষিণাঞ্চল তথা সাতকানিয়া-লোহাগাড়া অঞ্চলে আসতে থাকে। এতে বুঝা যায় যে, ইংরেজ শাসন আমলের আগেই লোহাগাড়ার নামকরণ হয়।

লোহাগাড়া সাতকানিয়া থানার অধীনে ছিল। ১৯৮১ সালের ২০ মে সাতকানিয়া থেকে পৃথক হয়ে লোহাগাড়া আলাদা থানায় রূপান্তরিত হয়। মুহুরী পাড়া এলাকায় অস্থায়ীভাবে থানার কার্যক্রম শুরু হয়।

বর্তমানে এই এলাকাটি পুরান থানা এলাকা নামে বেশ পরিচিত। ১৯৮৫ সালে পরিণত হয় লোহাগাড়া উপজেলা।

তথ্য সূত্র:

১। বাফা প্রকাশনা-২০০১,২০০৬ ও ২০১০
২। আনজুমন প্রকাশনা ২০১০
৩। রশ্মি- সাতকানিয়া সরকারি কলেজ বার্ষিকী ২০০১
৪। প্রচেয়, দীপিত প্রকাশনা, চুনতি, লোহাগাড়া

Chunati.com Pioneer in village based website

লোহাগাড়া থানা ও উপজেলা প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

থানা প্রতিষ্ঠা:

১৯৭৮ সালে অবিভক্ত সাতকানিয়া থানার চরম্বা, কলাউজান, পুটিবিলা ও চুনতি ইউনিয়নের পাহাড় অধ্যুষিত এলাকায় কিছু যুবক সর্বহারা পার্টি নাম দিয়ে এলাকার বিত্তশালীদের কাছ থেকে জোরপূর্বক চাঁদা আদায় করে। চাঁদা প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করায় পুটিবিলার সাবেক চেয়ারম্যান শামশুল আলমকে ধরে নিয়ে হত্যা করা হয়। উক্ত পরিস্থিতিতে সাতকানিয়া থানা পুলিশকে এলাকাগুলোতে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় হিমশিম খেতে হয়। ঐ সময়ে লোহাগাড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ছিলেন মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী। তিনি সাতকানিয়া থানা উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যানও ছিলেন। সাতকানিয়া থানা উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যানসহ উক্ত এলাকার চেয়ারম্যানরা পুলিশের এসপি, ডিআইজি'র কাছে উক্ত এলাকার পরিস্থিতির কথা তুলে ধরেন। এতে ব্যবস্থা হয় রিজার্ভ পুলিশের। রিজার্ভ পুলিশকে স্থান দেওয়া হয় লোহাগাড়া ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে। পুলিশ এলাকায় অবস্থান নিয়ে সর্বহারা পার্টিকে দমন করে। তারপরও উক্ত এলাকার মানুষরা ভয়ের মধ্যে বসবাস করছিলেন। এ অবস্থায় উক্ত এলাকার চেয়ারম্যানরা থানা কমিটির চেয়ারম্যানের নিকট আলাদা থানা করার প্রস্তাব দেন। আলাদা থানা গঠনের লক্ষে থানা কমিটির চেয়ারম্যান ও লোহাগাড়ার ৬টি ইউনিয়নের তৎকালীন চেয়ারম্যান যথাক্রমে- চুনতি ইউপি চেয়ারম্যান আবদুল মান্নান, কলাউজান ইউপি চেয়ারম্যান শামশুল হক চৌধুরী, পুটিবিলা ইউপি চেয়ারম্যান আবদুল মোনাফ, চরম্বা ইউপি চেয়ারম্যান সুলতান আহমদ, বড়হাতিয়া ইউপি চেয়ারম্যান আবুল খায়ের সওদাগর ও আধুনগর ইউপি চেয়ারম্যান নুরুল হক চৌধুরীমিলে এসপি, ডিআইজি, জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনারের নিকট স্মারকলিপি দেন। দায়িত্ব দেওয়া হয় থানা কমিটির চেয়ারম্যানকে। তাঁরা পুলিশ কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসককে বুঝাতে সক্ষম হন যে, সাতকানিয়া থানা থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে লোহাগাড়ায় এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা পুলিশের একার পক্ষে সম্ভব নয়। অবিভক্ত সাতকানিয়া থানার ২৬টি ইউনিয়ন থেকে ৯টি ইউনিয়ন বাদ গেলেও সাতকানিয়া থানা ছোট হবে না। অতপর ১৯৭৯ সালের জুন মাসে সাতকানিয়া থানা পরিষদ সভায় সাতকানিয়া এলাকার ১০ জন চেয়ারম্যানের বিরোধীতা সত্ত্বেও লোহাগাড়া থানা নামে নতুন থানা প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হয়। পরবর্তীতে তৎকালীন এমপি মোস্তাক আহমদ চৌধুরী ও উপ-প্রধানমন্ত্রী জামাল উদ্দীন সাহেবের সহায়তায় ১৯৮১ সালের মে মাসে লোহাগাড়া থানা প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত মন্ত্রী সভায় অনুমোদন হয়। এ অবস্থায় থানার কার্যক্রম চালানোর জন্য ছিল না কোন জায়গা ও ভবন। তখন লোহাগাড়া ইউনিয়ন পরিষদ অফিস ছেড়ে দেওয়া হয়। ১৯৮১ সালের ২০ মে তৎকালীন বিভাগীয় কমিশনার শাহজাহান সাহেব ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে থানা উদ্বোধন করেন। যার ফলে বর্তমানে এলাকাটি পুরান থানা নামে পরিচিত। পরে বর্তমান স্থানে থানার জমি অধিগ্রহণ করে নির্মিত ভবনে থানা স্থানান্তরিত হয়।

উপজেলা প্রতিষ্ঠা:

১৯৮৫ সালে লোহাগাড়া থানাকে উপজেলায় উন্নীতকরণের জন্য মন্ত্রণালয় হতে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসকের নিকট চিঠি পাঠানো হয়। তখনও একই অবস্থা। নেই কোন জায়গা, নেই কোন ভবন। কোথায় হবে উপজেলা অফিস। এ অবস্থায় জেলা প্রশাসক ওমর ফারুক বললেন, মোস্তাফিজ সাহেব জানেন তিনি কি করবেন। তখন এলাকার মুরব্বি মোস্তাক আহমদ চৌধুরীও মারা গেলেন। এ পরিস্থিতিতে লোহাগাড়া ইউনিয়নের তৎকালীন চেয়ারম্যান আলহাজ্ব ফয়েজ আহমদ, মমতাজুল হক চৌধুরী, এনামুল হক চৌধুরী, নজির আহমদ, সৈয়দ আহমদ, আধুনগর ইউপি'র তৎকালীন চেয়ারম্যান নুরুল হক চৌধুরী, আবু জাফর চৌধুরী, বাদশা মিয়া, নুর আহমদ মেম্বার, আহমদ কবির ও অধ্যাপক নাজিম উদ্দীনসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে আলাপ-আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয় যে, মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী ও মমতাজ মিয়ার নিজস্ব মালিকানাধীন তৈয়ব আশরফ টেক্সটাইল মিলের খালি ভবনে হবে উপজেলা পরিষদের অস্থায়ী অফিস। জেলা প্রশাসককে উক্ত জায়গা দেখানো হলে তিনি তাতে সম্মতি দেন। উক্ত মিল ভবন সংস্কার করে ঐখানে ১৯৮৫ সালের ৭ নভেম্বর তৎকালীন খাদ্য মন্ত্রী এজি মাহমুদ উপজেলার কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। পরবর্তীতে উপজেলা ভবনের স্থায়ী জায়গা নির্ধারণে নানা প্রস্তাব আসে। আমিরাবাদের তৎকালীন চেয়ারম্যান শাহ আলম খান প্রস্তাব দেন আমিরাবাদে করার, পদুয়ার তৎকালীন চেয়ারম্যান শামশুল ইসলাম চৌধুরী প্রস্তাব দেন পদুয়াতে করার এবং লোহাগাড়ার তৎকালীন চেয়ারম্যান ফয়েজ আহমদ প্রস্তাব দেন থানা সংলগ্ন এলাকায় করার। প্রস্তাবের ভিত্তিতে গঠিত হয় স্থান সিলেকশন কমিটি। কমিটির চেয়ারম্যান করা হয় তৎকালীন চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক ওমর ফারুক সাহেবকে। কমিটির প্রস্তাব ছিল যারা ৫০ শতক জমি দান করবেন সেখানেই হবে উপজেলা অফিস। অবশেষে এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী, ফয়েজ আহমদ, মমতাজুল হক চৌধুরী, শফিয়র রহমান, আহমদ কবির, এনামুল হক চৌধুরী, নজির আহমদ ও সৈয়দ আহমদ উপজেলার জন্য ৫০ শতক জমি দান করেন। সেখানেই নির্মিত হয় উপজেলা পরিষদ ভবন। পরবর্তীতে আশেপাশের আরো জমি অধিগ্রহণ করে উপজেলা পরিষদের এলাকাকে সম্প্রসারিত করা হয়।

(তথ্যসূত্র: মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।)

চতুর্থ অধ্যায়

উপজেলার ইউনিয়নের নামকরণের ইতিহাস

Chunati.com
Pioneer in village based website

ইতিহাস জাতির আয়না, ইতিহাসের মুকুরে জাতি নিজের আকৃতি ও রূপ দেখতে পায়। ইতিহাসের মধ্য দিয়ে মানুষ নিজের পরিচয় পায়, তার অতীতকে জানতে পারে।

- ঐতিহাসিক ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম

উপজেলার ইউনিয়নের নামকরণের ইতিহাস

ইউনিয়ন পরিষদ এ উপমহাদেশের প্রাচীনতম স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান। গ্রাম-চৌকিদারি আইন ১৮৭০ এর মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের নাম রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের কারণে পরিবর্তিত হয়েছে। এক সময় ইউনিয়ন পরিষদের নাম ছিল পঞ্চায়েত। ব্রিটিশরা ১৯২২ সালে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ইউনিয়ন বোর্ড চালু করেন। পাকিস্তান আমলে ইউনিয়ন বোর্ড পরিবর্তন হয়ে ইউনিয়ন পরিষদ হয়। ইউনিয়ন প্রধানকে প্রেসিডেন্টের স্থলে চেয়ারম্যান করা হয়।

চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলা ৯টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত। দুই-একটি ইউনিয়ন সমতলে হলেও বাকী ইউনিয়নগুলো পাহাড়বেষ্টিত। ৩টি ইউনিয়ন রয়েছে দূর্গম এলাকায়। ইউনিয়নগুলো হচ্ছে- ১নং বড়হাতিয়া ইউনিয়ন, ২নং আমিরাবাদ, ৩নং পদুয়া, ৪নং চরম্বা, ৫নং কলাউজান, ৬নং লোহাগাড়া, ৭নং পুটিবিলা, ৮নং চুনতি ও ৯নং আধুনগর। পাহাড়-সমতল বেষ্টিত এসব ইউনিয়ন লোহাগাড়াকে অপরূপে সাজিয়েছে। ইউনিয়নগুলোর নামকরণের ইতিহাস নিয়ে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে বসতি স্থাপনের আগে ও পরে নামকরণ হয় বলে মনে করা হয়। অন্যদিকে মৌজা সৃষ্টির পরে ইউনিয়নের নামকরণ হয়েছে বলে অনেকেই ধারণা করেন। ইউনিয়নগুলোর নামকরণে ইতিহাস নিয়ে কিছু জনশ্রুতি ও কিংবদন্তী নিম্নে উল্লেখ করা হল :

বড়হাতিয়া ইউনিয়ন

বড় ও হাতিয়া- এই দুটি শব্দের সমন্বয়ে বড়হাতিয়া। জনশ্রুতি আছে, বসতি গড়ে ওঠার পর এলাকার পশ্চিম পাহাড় থেকে একদল হাতির পাল প্রতিনিয়ত জনপদে নেমে আসত। নষ্ট করত মানুষের ক্ষেত-খামার। এলাকাবাসী অতিষ্ঠ হয়ে হাতি ধরার জন্য এলাকায় খেদার ব্যবস্থা করে। খেদায় বড় বড় হাতি ধরা পড়ত বলে এলাকাটির নামকরণ হয় বড়হাতিয়া। অন্য লোকশ্রুতি মতে, জনপদের পূর্ব পাশের প্রবাহিত হাতিয়ার খালের উপকূলে এলাকাটি হওয়ায় নামকরণ হয়েছে বড়হাতিয়া। একসময়ে এই জনপদে ছোট হাতিয়া ও বড় হাতিয়া নামে দুইটি খাল ছিল। বড় হাতিয়ার নামের খালটি প্রবাহিত হয়ে এলাকাকে জনপদের উপযোগী করে তুলেছে। ওই সময়ের বড় হাতিয়ার খালের নামানুসারে বড়হাতিয়া নামকরণ হয়েছে বলে মনে করা হয়। বর্তমানে এটির পূর্বের অবস্থা নেই। সম্ভবত: ১৯৬০ সালে বড়হাতিয়া ইউনিয়নের কার্যক্রম শুরু হয়। আয়তন ৭ হাজার ৫৫৮ হেক্টর। জনসংখ্যা প্রায় ৫৫ হাজার। এই ইউনিয়নের উল্লেখযোগ্য খাল-ছড়ার মধ্যে রয়েছে হাতিয়ার, থমথমিয়া, সোনাইছড়ি, বদরছড়া ও কুলপাগলি। প্রধান কৃষিজ ফসল ধান, আলু, বেগুন ও মরিচ। বিভিন্ন সময়ে দায়িত্ব পালনকারী জন প্রতিনিধিরা হলেন- জনাব আবুল খায়ের, আবুল হাশেম, জালাল আহমদ, আবুল খায়ের, জাফর আহমদ, এডভোকেট মোহাম্মদ আলী, মাওলানা আবদুল ওয়াহাব চৌধুরী ও মুহাম্মদ জুনাইদ।

আমিরাবাদ ইউনিয়ন

মোঘল আমলে হযরত সৈয়দ আমীর আলী নামে এক পীর আউলিয়া ইসলাম ধর্ম প্রচার-প্রসারে এলাকায় আসেন। এলাকায় বসতি স্থাপনের মাধ্যমে আবাদ শুরু করে দেন। উক্ত আমির এলাকায় আবাদ করেন বলে তাঁর নামানুসারে আমিরাবাদ নামকরণ হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। হযরত সৈয়দ আমীর আলী এলাকায় মুল্লুক শাহ নামে পরিচিত ছিল। বর্তমানে আমিরাবাদ এলাকার দক্ষিণ সাতকানিয়া গোলামবারী মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের উত্তর পাশে মুল্লুক শাহ দিঘীর পাড়ে তাঁর মাজার রয়েছে। স্থানীয়-ভাবে দিঘীটি মনুষ্যদিঘী নামে পরিচিত।

সম্ভবত, ১৯৬২ কিংবা ১৯৬৩ সালের দিকে আমিরাবাদ ইউনিয়নের কার্যক্রম শুরু হয়। আয়তন প্রায় ১৭.৬৫ বর্গ কিলোমিটার। জনসংখ্যা প্রায় ৪২ হাজার। এই ইউনিয়নে উল্লেখযোগ্য খাল-ছড়ার মধ্যে রয়েছে টংকা, বোয়ালিয়া, গুইল্লাছড়ি ও নন্দা। প্রধান কৃষিজ ফসল- ধান, ফেলন, বেগুন, মরিচ, আলু ও বাদাম। বিভিন্ন সময়ে দায়িত্বরত জন প্রতিনিধিরা হলেন- মোহাম্মদ মিয়া, মাওলানা নেছার আহমদ, শফিয়র রহমান (রিলিপ কমিটি), হাজী আহমদ হোসেন, শাহ আলম খান, জাফর আলম চৌধুরী, শহিদুল ইসলাম টিপু, মোহাম্মদ এনামুল হক ও কাজী মুহাম্মদ নুরুল আলম চৌধুরী।

পদুয়া ইউনিয়ন

মোঘল আমলে মধ্যপ্রাচ্য থেকে চট্টগ্রাম অঞ্চলে আসেন অনেক পীর-দরবেশ, সুফী-সাধক ও বুজুর্গরা। সুলতান ফখরুদ্দিনের শাসনামলে চট্টগ্রাম অঞ্চলে মুসলিম সমাজের বিস্তার ঘটে। ফলে ওই সময়ে লোহাগাড়া অঞ্চলে পীর-আউলিয়াদের আগমন ঘটে। জনশ্রুতি আছে, মোঘল আমলে একদল পীর-আউলিয়া উপজেলার বার আউলিয়া নামক স্থানে এসে বিশ্রাম নেন। নামাজের সময় হলে তাঁরা একসাথে তাঁদের সংরক্ষিত পানি দিয়ে ওযু শুরু করেন। ওযু করার সময় তাঁদের পা ধোয়া পানি নিচের দিকে গড়িয়ে যায়। তখন তাঁদের একজন প্রশ্ন করেন, এই জায়গাটির নাম কি? অন্যরা উত্তর দিলেন এই জায়গার নাম হবে পা ধোয়া। এই পা-ধোয়া থেকে পদুয়া নামকরণ হয়। এই ইউনিয়নের নামের ইংরেজি শব্দটি Padua (উচ্চারণ পাধোয়া) নামে হয়েছে। এই Padua থেকে বাংলা উচ্চারণ পদুয়া হয়। ইউপি সূত্র মতে, এই অঞ্চলে পদুয়া নামে একটি গ্রাম ছিল। গ্রামের নামানুসারে পদুয়া নামকরণ হয়। অন্য জনশ্রুতি মতে, পদুয়া শব্দটি পথ এবং দু'শব্দের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। পথ উর্দু শব্দ আর দু' ফার্সী শব্দ। মোঘল আমলে যুদ্ধের সময় শত্রুদেরকে তাড়া করতে গিয়ে যুদ্ধরত সৈনিকরা দেখেন যে, পথ দু'টি। তখন সৈন্যরা তাদের সেনাপতিকে বললেন পথ দু' হয়েছে। পথ দু' থেকে পদুয়া নামকরণ হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

সম্ভবত ১৯৪৬ সালে ইউনিয়নটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পদুয়া ইউনিয়নের আয়তন ৬,৬৪০ একর। জনসংখ্যা প্রায় ৫৫ হাজার। প্রধান কৃষিজ ফসল- ধান, বেগুন, আলু, করলা

ইত্যাদি। উল্লেখযোগ্য খাল-ছড়াগুলো হচ্ছে হাঙ্গর, লোনার ছড়া, গুইল্যাছড়ি ইত্যাদি। বিভিন্ন সময়ে দায়িত্বরত জন প্রতিনিধিরা হলেন- হাকিম বখসু চৌধুরী, মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান, কালিশংকর দাশ, সামশুল ইসলাম চৌধুরী, এড. হুমায়ুন কবির রাসেল, হামিদ হোসেন, আমিন উল্লাহ (ভারপ্রাপ্ত), ওমর ফারুক ও লিয়াকত আলী চৌধুরী।

চরম্বা ইউনিয়ন

মোঘল আমলে এলাকায় চড়ই ও অম্বা নামে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর দুই ভাই-বোন মোঘল শাসকের প্রতিনিধি ছিলেন। এই দুই ভাই-বোনের নামানুসারে চরম্বা নামকরণ হয়েছে বলে জনশ্রুতি রয়েছে। আরেক কিংবদন্তী মতে, এক বৃদ্ধ মহিলা সন্ধ্যায় তার বাছুরের সন্ধানে হাতে আগুনের মশাল নিয়ে খালের চরে যায়। ওই সময়ে বৃদ্ধ মহিলা হাম্বা-হাম্বা করে বাছুর সন্ধান করে। তখন এক লোক মহিলাকে বলেন হাম্বা চরে আছে। চরে হাম্বা রয়েছে বলে চরম্বা নামকরণ হয়েছে।

এই ইউনিয়ন সম্ভবত: ১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। আয়তন ১০০২৯ একর। লোকসংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার। খাল-ছড়ার মধ্যে রয়েছে হাঙ্গর, জাংছড়ি, টংকাবতী, কেরাতর ছড়া ও নারিয়ার ছড়া ইত্যাদি। বিভিন্ন সময়ে দায়িত্বরত জন প্রতিনিধিরা হলেন- দানুমিয়া মাষ্টার, সোলতান আহমদ, রফিক আহমদ সিকদার, সোলতান আহমদ, বদিউল আলম, আহমদ মিয়া মেম্বার (ভারপ্রাপ্ত) ও অধ্যাপক মো: সাদত উল্লাহ।

কলাউজান ইউনিয়ন

কলাউজান শব্দটি কলা ও উজান দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। কলা শব্দের অর্থ শিল্প আর উজান শব্দের অর্থ উন্নত। পার্বত্য অঞ্চল বান্দরবানের লামা থেকে কলা টংকাবতী খাল হয়ে উজানে এসে এলাকার হাট-বাজারে বিক্রি হতো। জনশ্রুতি রয়েছে, ব্রিটিশ আমলে জায়গা জরিপ ও নামকরণ হয়। কিছু ইংরেজ লোক এ এলাকা জরিপ করতে আসেন। টংকাবতী খালের পাশে ইংরেজরা খালের দু'কুলের দৃশ্য অবলোকন করেন। ওই সময়ে এলাকার কিছু পন্ডিত ব্যক্তি ইংরেজদের সাথে ছিলেন। এমন সময় টংকা খালের উজান হতে বাঁশের ভেলায় বোঝাই হয়ে বহু কলাসহ কিছু লোক আসছিলেন। ইংরেজরা কৌতুহল বশত বলাবলি করছেন "What is the name of this palace"? এলাকাবাসী সঠিকভাবে ইংরেজি বাক্যটি বুঝতে পারেনি। তারা শুধু name শব্দটি বুঝছেন। অনুমান করে বাঙালীরা বললেন উজান হতে কলা আসছে। ইংরেজরা কথাটি বুঝতে না পেরে পুনরায় বলতে লাগলেন কলাউজান। ইংরেজরা মনে করিয়ে দিলেন এ জায়গাটির নাম কলাউজান।

অন্য কিংবদন্তী মতে, সোলতানী আমলে মোহাম্মদ আলী জান নামে এক শাসক এই স্থানে কিল্লা স্থাপন করে। কিল্লায়ে মোহাম্মদ আলী জান অবস্থান করে। পরে কিল্লাটির নাম হয় কিল্লা যান। কিল্লাযান পরিমার্জিত হয়ে কলাউজান হয়। আরো জনশ্রুতি রয়েছে যে, টংকা খালের পানি উজান থেকে ভাটির দিকে যেত। উজানে যত যাওয়া

হত অসংখ্য কলা পাওয়া যেত। ওই সময়ে স্থানটি নাম হয়েছে কেলা উজান। পরবর্তীতে পরিমার্জিত হয়ে কলাউজান নামকরণ হয়।

এলাকার প্রবীন শিক্ষক মনোরঞ্জন নাথ (পরবর্তীতে সন্ন্যাসী শ্রী শ্রী মহিমানন্দ পরমসংহ দেব) জানান, টংকা খালের উৎপত্তি জানার জন্য কিছু বণিক নৌকাযোগে খালের উজানের দিকে যেতে থাকে। উজানের দিকে বেশ কিছুদূর গেলে নৌকা বন্ধ হয়ে যায়। সেখানে তাঁরা এলাকাটির নামকরণ করেন কলাউজান।

কলাউজানের আয়তন ১৬.১৭ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার। গ্রামের সংখ্যা ৪টি, মৌজা ৪টি ও হাট-বাজার সংখ্যা ৩টি। বিভিন্ন সময়ে দায়িত্বরত জন প্রতিনিধিরা হলেন- এনামুল হক চৌধুরী, সামশুল হক চৌধুরী, বজলুর রহমান সিকদার, রাজা মিয়া, আবদুল ওয়াহেদ, মাওলানা মো: ইদ্রিছ ও আবদুল ওয়াহেদ।

লোহাগাড়া ইউনিয়ন

লোহাগাড়া উপজেলা নামকরণের ইতিহাসের সাথে লোহাগাড়া ইউনিয়নের নামকরণের ইতিহাসের মিল রয়েছে। লোহাগাড়ার নামকরণের ইতিহাস যেভাবে হয়েছে সেভাবে নামকরণ হয়েছে লোহাগাড়া ইউনিয়নের।

লোহাগাড়া উপজেলা নামকরণের ইতিহাস পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। সাধারণ অর্থে লোহাগাড়া শব্দ লোহা ও গাড়া দুইটি শব্দের সমন্বয়ে হয়েছে। জনশ্রুতি আছে, লোহাগাড়ায় লোহার খনি ছিল। এই লোহার খনি গাঁড়া (গর্তে) ছিল বলে লোহাগাড়া নামকরণ হয়েছে। মাটির ভিতরে এ গুপ্তধন ইতোমধ্যে অনেকে পেয়েছে এরকম নজির আছে। এটি উপজেলা সদর ইউনিয়ন।

সম্ভবত ১৯৫৭ কিংবা ১৯৫৮ সালের দিকে লোহাগাড়া ইউনিয়নের কার্যক্রম শুরু হয়। ইউনিয়নের আয়তন ১১২৪ হেক্টর। জনসংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার। ২০১৫ সালের হিসাব অনুযায়ী মোট ভোটার ১৯ হাজার ৯৪১ জন। যার মধ্যে পুরুষ ১০ হাজার ৪১০ জন ও মহিলা ৯ হাজার ৫৩১ জন। এই ইউনিয়নের উল্লেখযোগ্য খাল-ছড়া হল- সুখছড়ী, বোয়ালিয়া ও বামির খাল। ছড়া রয়েছে ২টি। প্রধান কৃষিজ ফসলের মধ্যে রয়েছে ধান, ফেলন, বেগুন, মরিচ, টমেটো ও আলু ইত্যাদি। পীর-আউলিয়ার মাজারের মধ্যে রয়েছে- হযরত শাহপীর (রহ.), দক্ষিণ সুখছড়ী আবদুল খালেক শাহ (রহ.), হযরত মাওলানা ছমিউদ্দীন (রহ.) ও হযরত ছৈয়দ শাহ (রহ.) প্রকাশ জঙ্গলপীর। বিভিন্ন সময়ে এই ইউনিয়নে দায়িত্বরত জনপ্রতিনিধিরা হলেন- তৈয়ব উল্লাহ সওদাগর (১৯৫৮-১৯৬২), নেয়াকত হোসেন মিয়া (১৯৬৪-১৯৬৫), আলহাজ্ব মোস্তাফিজুর রহমান সওদাগর (১৯৬৫-১৯৭১), হাজী গোলাম কাদের (রিলিপ কমিটি), আলহাজ্ব মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী (১৯৭৩-১৯৮৩), ফয়েজ আহমদ (১৯৮৩-১৯৯২), কৃষি অফিসার (ভারপ্রাপ্ত), নাসির উদ্দীন (ভারপ্রাপ্ত), জিয়াউল হক চৌধুরী বাবুল (১৯৯৩-২০০৭), মঞ্জুর আলম (ভারপ্রাপ্ত), জেয়াবুল হোসেন (ভারপ্রাপ্ত) ও আলহাজ্ব নুরুচ্ছাফা চৌধুরী।

বিবিএস-২০১৫ এর তথ্য মতে, এই ইউনিয়নের সাক্ষরতার হার ৬৫ ভাগ, যার মধ্যে পুরুষের হার ৬০.৪০ ভাগ এবং নারীদের হার ৬৯.৬ ভাগ।

পুটিবিলা ইউনিয়ন

এ অঞ্চলে প্রাচীনযুগে খাল বিলে-ঝোঁপসহ বিভিন্ন স্থানে প্রচুর পুঁটি মাছ পাওয়া যেত। এছাড়াও তাঁতি পাড়ার উত্তর পাশে পুটির নালা নামে একটি খাল ছিল। বর্তমানেও আছে। পুটিরনালা খালে, পুটিরনালার পাশের বিলে প্রচুর পুটিমাছসহ অসংখ্য ছোট মাছ পাওয়া যেত। খালে ও বিলে পুটি মাছ পাওয়া যেত বলে পুটিবিলা নামকরণ হয়েছে বলে জনশ্রুতি রয়েছে। পুটিনালার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩-৪ কিলোমিটার। কংসানালা খালের সাথে পুটিরনালা খালের সংযুক্ত হয়েছে।

পুটিবিলা শব্দটি পুটি ও বিলা দুটি শব্দ নিয়ে গঠিত। শাব্দিক বিশ্লেষণ করলেও বলা যায় বিলে পুটি মাছ পাওয়া যেত।

ঐতিহাসিকগণের মতে, মোঘল আমলে বহু পীর-আউলিয়া পুটিবিলার হাজির পাড়া ও গৌড়স্থানের পাহাড়ের লাল মাটির ছোট টিলা-পাহাড় বা পাহাড়ের পাদদেশে বসতি স্থাপন করেন। পুটিবিলা পাহাড়ের রূপ ও মাটির লালিত্য দেখে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের সুবিধার্থে বসতি স্থাপন করেছিলেন পীর-আউলিয়ারা। এ পুটিবিলা ইউনিয়নের রয়েছে বহু প্রাচীন স্থাপত্য ও নির্দশন। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত স্থান হিসেবেও এলাকাটি ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে। এখানে মুক্তিযোদ্ধারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে পাকিস্তানিদের প্রতিহত করে।

পুটিবিলা ইউনিয়ন সম্ভবত ১৯৬৭ কিংবা ১৯৬৮ সালের দিকে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ইউনিয়নের আয়তন প্রায় ৪৪.২০ বর্গ কিলোমিটার। জনসংখ্যা প্রায় ২৮ হাজার। উল্লেখযোগ্য খাল-ছড়ার মধ্যে রয়েছে ডলুখাল, সরই খাল, শুকছড়ি খাল, কংসনালা, সোনাইছড়ি, ধুইল্যা খাল, গাইনীর ঝিরি, কুলাংছড়া, পালং খাল ইত্যাদি। বিভিন্ন সময়ে এই ইউনিয়নে দায়িত্বরত জনপ্রতিনিধিরা হলেন- জয়নাল আবেদীন চৌধুরী, মাষ্টার খায়ের আহমদ (ভারপ্রাপ্ত), সমশুল আলম চৌধুরী, আবুল কাসেম (ভারপ্রাপ্ত), আবদুল মোনাফ চৌধুরী, জয়নুল আলম চৌধুরী, আবু হানিফ চৌধুরী, ছরওয়ার কামাল (ভারপ্রাপ্ত) ও ফরিদুল আলম।

চুনতি ইউনিয়ন

উপজেলার অন্যতম সুন্দর ইউনিয়নের নাম চুনতি। প্রকৃতি যেন সমস্ত ঐশ্বর্য দিয়ে চুনতিকে ঢেলে সাজিয়েছে। ড. ইমরান হোসেনের মতে, চুনতির নামকরণ হয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে। উপজেলার অন্যান্য কোন ইউনিয়নের সাথে চুনতির নামের মিল নেই। চুনতির বাসিন্দারা বহিরাগত। এখানে বসতি স্থাপনের পর পরই চুনতির নামকরণ হয়েছে। চুনতি নামকরণ নিয়ে দুটি জনশ্রুতি রয়েছে।

জনশ্রুতি-১:

চুনতির উৎপত্তি ফার্সী শব্দ "চুনিদাহ" থেকে। যার অর্থ নির্ধারিত স্থান। এখানে এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর মঠ ছিল। একজন বহিরাগত লোক এ অঞ্চল দিয়ে যাওয়ার সময় এখানকার নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখে অভিভূত হন তারা। ভিক্ষুর কাছে জানতে চান, এ সুন্দর অঞ্চলটির নাম কি? ভিক্ষু বললেন চুনুটিয়া। লোকটি তখন এ অঞ্চলের নাম মনে করেন চুনুটিয়া। তখন থেকে এ অঞ্চলটি চুনুটিয়া। কিছুদিন পর চুনতি নামে পরিচিতি লাভ করে।

জনশ্রুতি-২:

সম্রাট আওরঙ্গজেবের নিয়োজিত সুবেদার মীর জুমলার তাড়া খেয়ে শাহ সুজা ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রামের দক্ষিণ পূর্বে আরাকান রাজ্যে আশ্রয়প্রার্থী হন। শাহ সুজা আরাকান যাওয়ার পথে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের মাঝামাঝি পাহাড়বেষ্টিত এক উচ্চ টিলায় মনোরম স্থান আবিষ্কার করে সুচিহ্নিত করেন। সে জায়গাটি আজ চুনতি নামে পরিচিত। কেননা চুনতির ফার্সী শব্দ চুনিদাহ, যার অর্থ সুচিহ্নিত বুঝায়। চুনতি উর্দু শব্দ যার অর্থ হচ্ছে প্রশংসনীয়। শাহ মাওলানা আবদুল হাকিম (রহ.) রচিত 'শজরাহ' মূলে জানা যায়, শাহ সুজা ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ মে নিজ পরিবারের সদস্যবর্গ, ২শ জন একান্ত অনুগামী (যাঁর মধ্যে ২২ জন আলেম-ওলামা) এবং ৩ হাজার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে চট্টগ্রাম হয়ে আরাকান অভিমুখে যাত্রা করেন। শঙ্খ ও ডলু নদের দক্ষিণ প্রান্তে এসে পর্তুগীজ জাহাজ চলাচল উপযোগী পানি পথ শেষ হলে চুনতির বর্তমান কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দান ও কবরস্থানের পাদদেশে নৌবহর নোঙ্গর হয়। তারপর তাঁরা পায়ে হেঁটে সামান্য দক্ষিণে গিয়ে সুপ্রশস্ত অনুচ্চ পাহাড় এবং চারিদিকে জঙ্গলঘেরা প্রাকৃতিক মনোরম দৃশ্যমন্ডিত নিরাপদ জায়গায় আস্তানা স্থাপন করেন। সেখানে ফার্সী শব্দ 'চুনিদাহ' অর্থাৎ পছন্দ হল উচ্চারণ করা হয়। পরবর্তীতে কালের বিবর্তনে তা চুনতি নামেই নামকরণ হয়।

চুনতির নামকরণ কিভাবে হয়েছে তা নিশ্চিতভাবে বলা না গেলেও সোলতানী বা মোঘল আমলে চুনতির নামকরণ হয়েছে বলে মনে করা হয়। আরেক বর্ণনামতে, সম্রাট শাহজাহানের পুত্র শাহ সুজা আরাকানে পালিয়ে যাবার সময় সঙ্গী-সাথী ও সৈন্যদের নিয়ে বর্তমান চুনতিতে যাত্রা বিরতী করেন। তাঁরা চুনতির একটি এলাকা নির্বাচিত করে অবস্থান নেন। তারপর শাহ সুজা সঙ্গী-সাথীদেরকে বলেন "চুনিদা" যার অর্থ পছন্দকৃত। এ চুনিদা থেকে চুনতি নামকরণ হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

চুনতি ইউনিয়ন সম্ভবত ১৯২৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ইউনিয়নের আয়তন ৬১২৪.৭০ হেক্টর। জনসংখ্যা প্রায় ৩৪ হাজার। উল্লেখযোগ্য খাল-ছড়ার মধ্যে রয়েছে চাম্বি, চান্দা, হাতিয়ার, সোনাইছড়ি, ফারাঙ্গা, রাতার ইত্যাদি। বিভিন্ন সময়ে এই ইউনিয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত জনপ্রতিনিধিরা হলেন ইস্তেফাজুর রহমান খান, মাওলানা বশির, মাষ্টার মোহছেন, ইসহাক মিয়া, মো. ইলিয়াছ মিয়া ছিদ্দিকী, ইস্তেফা আলী, ইউনুছ খান, আবদুল্লাহ মিয়া, আবু বক্কর সিকদার (রিলিপ কমিটি), মঈনুল ইসলাম চৌধুরী হিরণ, হাজী আবদুল মান্নান, ইলিয়াছ মিয়া, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও মো: জয়নুল আবেদীন।

আধুনগর ইউনিয়ন

ইতিহাস থেকে জানা যায়, মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব মোঘল সুবেদার শায়েস্তা খানকে চট্টগ্রাম অঞ্চলে অভিযান শুরু করার নির্দেশ দেন। যার প্রেক্ষিতে মোঘল বাহিনী ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ জানুয়ারী চট্টগ্রাম অঞ্চল অধিকার করেন। পরে মোর্তুজা খাঁর নেতৃত্বে মোঘল বাহিনী কর্ণফুলী নদী পার হয়ে রামু পর্যন্ত অগ্রসর হয়।

ওই সময়ে চট্টগ্রাম দক্ষিণাঞ্চলের রাস্তাঘাট সুবিধা না থাকায় এবং বর্ষা শুরু হলে মোঘল বাহিনীর যোগাযোগ রক্ষা ও রসদ সরবরাহ অসুবিধা হয়। ফলে মোঘল বাহিনী রামু পরিত্যাগ করে সাঙ্গু নদীর উত্তর তীরে অবস্থান নেয়। আধুখাঁ ও নছমন সিংহ বা লক্ষণসিংহ নামক দু'জন হাজারী সেনাপতিকে সেখানকার সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব দেয়া হয়।

বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যর নবাব আলীবর্দী খাঁ (১৭৪০-১৭৫৬ খ্রী:) এর আমলে দোহাজারী দুর্গের অধ্যক্ষ ছিলেন আধুখাঁ। নবাব আমলের দোহাজারী দুর্গের অধ্যক্ষ আধুখাঁ চট্টগ্রাম দক্ষিণাঞ্চল তথা লোহাগাড়ার আধুনগরসহ বিভিন্ন এলাকার ঝোঁপ-জঙ্গল পরিস্কার করার ব্যবস্থা করেন। বসতি স্থাপন ও আবাদের জন্য উপযোগী করে তোলেন। এই আধুখাঁ নামানুসারে আধুনগর হয়েছে বলে জনশ্রুতি রয়েছে। আধুখাঁর দুই ছেলে। ছেলের নাম শের জামাল খাঁ ও রহমত খাঁ। বংশধর করিমুন্নেছাকে দেয়া হয় শঙ্খ নদীর দক্ষিণাঞ্চল তথা সাতকানিয়া, লোহাগাড়া ও বাঁশখালীসহ চট্টগ্রাম দক্ষিণাঞ্চল। আধুখাঁ ও তাঁর বংশধররা চট্টগ্রামসহ চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলে ২২টি মসজিদ ও ২২টি দিঘী খনন করে। আধুনগরসহ উপজেলার বিভিন্ন স্থানে তাদের খননকৃত দিঘী এখনো কালের সাক্ষী হয়ে আছে। অন্যদিকে আধু খাঁ'র ছেলে শের জামাল খাঁ'র নামানুসারে জামাল খান এবং রহমত খান নামানুসারে রহমত গঞ্জ হয়েছে বলে মনে করা হয়।

সম্ভবত ১৯৬৪ সালে আধুনগর ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ইউনিয়নের আয়তন ৪,৫৭৪ একর। জনসংখ্যা প্রায় ৩৫ হাজার। উল্লেখযোগ্য খাল-ছড়ার মধ্যে রয়েছে ডলুখাল, মরাডলু, জুরিখাল, হাতিয়ার খাল, কুলপাগলি ইত্যাদি। বিভিন্ন সময়ে দায়িত্ব প্রাপ্ত জনপ্রতিনিধিরা হলেন- মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ চৌং, আমানত উল্লাহ, নুরুল হক চৌং, ডা. মোস্তাফিজুর রহমান (রিলিপ কমিটি) মাওলানা শফিক আহমদ, মোহাম্মদ ইলিয়াছ (ভারপ্রাপ্ত), মো: আইয়ুব মিয়া, আবু জাফর চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম (ভারপ্রাপ্ত) ও মো: আইয়ুব মিয়া। (তথ্য সূত্র: ১। ঐক্য-২০০৮, সাতকানিয়া-লোহাগাড়া বৌদ্ধ ঐক্য পরিষদ। ২। আনজুমন ২০১০ ৩। ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র)

পঞ্চম অধ্যায়

উপজেলার কিছু প্রাচীন স্থাপত্য ও নিদর্শন

Chunati.com
Pioneer in village based website

যে নিজের সম্বন্ধে লেখে এবং তার সমকালের ব্যাপারে লেখে, সেই একমাত্র ব্যক্তি যে সব লোকের জন্য লেখে ও সব মানুষের জন্য লেখে। ইতিহাসের সবচাইতে বড় শিক্ষা এই যে, ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না।

- জর্জ বার্নার্ড শ

উপজেলার কিছু প্রাচীন স্থাপত্য ও নিদর্শন

লোহাগাড়া উপজেলার বিভিন্ন স্থানে রয়েছে আদিযুগের বিভিন্ন প্রাচীন স্থাপত্য ও নিদর্শন। প্রাচীন যুগ থেকে এখানে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী ও ধর্মের মানুষ বসবাস করে আসছে। রাজত্ব ও শাসন করেছে অনেক শাসক। সৃষ্টি হয়েছে অনেক স্থাপনা ও নিদর্শন। পরবর্তীতে এগুলো ঐতিহাসিক স্থান হিসেবে আছে। বর্তমানে এগুলো কালের সাক্ষী বহন করে। নিম্নে উপজেলার কিছু প্রাচীন স্থাপত্য ও নিদর্শনের কথা তুলে ধরা হল:

মোহাম্মদ খান ছিদ্দিকী (রহ:) নায়েবে উজির জামে মসজিদ

লোহাগাড়া উপজেলার আমিরাবাদ ইউনিয়নের মল্লিক ছোবহান চৌধুরী পাড়ায় মসজিদটি অবস্থিত। উপজেলার এটি প্রাচীন মসজিদ। মোঘল আমলে মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছিল। মসজিদের গায়ের শিলালিপি অনুসারে ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এটি নির্মিত হয়। আয়তাকার আকৃতির এ মসজিদের তিনটি বড় গম্বুজ রয়েছে। যা মুসলিম স্থাপত্য শৈলীর অপূর্ব নিদর্শন। মসজিদের উত্তর পাশে দিঘী ও পূর্বপাশে পুকুর রয়েছে। একসাথে প্রায় ৭শত মুসল্লি নামাজ আদায় করতে পারে।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, মোঘল আমলে মোহাম্মদ খান ছিদ্দিকী শায়েস্তা খানের (১৬৬৪-৭৮, ১৬৮০-৮৮ খৃ.) শাসনামলে নায়েবে উজির ছিলেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রী:) শাসনামলে তাঁর মামা শায়েস্তা খান বাংলার সুবেদার হন। ধারণা করা হয়, মোহাম্মদ খান শায়েস্তা খানের সাথে অভিমান করে ইসলাম ধর্ম প্রচারে নিজেকে মনোনিবেশ করেন। মহাস্থানগড়ের অধিপতির দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে চট্টগ্রাম অঞ্চলে চলে আসেন। পরবর্তীতে তিনি ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য লোহাগাড়ার মল্লিক ছোবহান এলাকায় চলে আসেন। এলাকার চৌধুরী পাড়ায় মসজিদটি নির্মাণ করেন। সেখান থেকে তিনি যান উজিরভিটা এলাকায়। মল্লিক ছোবহান চৌধুরী পাড়া এলাকায় তিনি বসতি স্থাপন করেন। মল্লিক ছোবহান চৌধুরী পাড়ায় বর্তমানে তাঁর পরবর্তী বংশধরদের বসতি রয়েছে। (তথ্য সূত্র: ১। দৈনিক ইত্তেফাক- ০৬/০৪/১৫ ২। অধ্যাপক জহুরুল আলম চৌধুরী, চৌধুরী বাড়ি, আমিরাবাদ।)

খাঁ'র মসজিদ

লোহাগাড়ায় মোঘল আমলে আধুনগর ও চুনতিতে দুটি মসজিদ নির্মিত হয়। মসজিদ দুটি খাঁ'র মসজিদ নামে পরিচিত। মুসলিম স্থাপত্য শৈলীর অপূর্ব নিদর্শন খাঁ'র মসজিদ কালের সাক্ষী বহন করেন। বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খান স্থাপত্য কলার একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর আমলে ঢাকাসহ বিভিন্ন অঞ্চলে অসংখ্য ইমরাত স্থাপত্য কীর্তির পরিচয় বহন করে।

১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে নবাব শায়েস্তা খাঁ'র পুত্র বুজুর্গ উমেদ খাঁ চট্টগ্রাম বিজয় করেন। লোহাগাড়াসহ চট্টগ্রাম দক্ষিণাঞ্চলে মোঘল অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময় লেগেছে। ওই সময়ে আধু খাঁ দোহাজারী দূর্গের সেনাপতি ছিলেন। জনশ্রুতি আছে, আধু খাঁ ও তাঁর বংশধর চট্টগ্রাম অঞ্চলে ২২টি দিঘী ও ২২টি মসজিদ স্থাপন করেন। আরকান সড়কের (চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক) দু'পাশে অনেক জায়গা দান করেন। আধুনগরে খান হাট ও খান মসজিদ স্থাপন করে। চুনতি এলাকায় আধু খাঁ'র বংশধররা মসজিদ ও দিঘী নির্মাণ করে। চুনতি ও মছদিয়া খাঁ'র দিঘীর প্রত্যেকটির আয়তন ১ দ্রোণের অধিক হবে। বর্তমানে এসব দিঘীতে পানি থাকলেও গভীরতা নেই। প্রায় ভরাট হয়ে গেছে। অন্যদিকে আধুনগরের খাঁ'র মসজিদ পুনঃসংস্কার হয়েছে। চুনতির খাঁ'র মসজিদ পুনঃসংস্কার হলেও সেই আমলের কিছু স্থাপত্য শৈলী এখনো কীর্তির পরিচয় বহন করছে।

বড় ও ছোট মিয়াজি জামে মসজিদ

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুক (রা:)'র বংশের ২৫ তম অধঃস্তন পুরুষ চুনতির ঐতিহ্যবাহী প্রাচীনতন মিয়াজি বংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রখ্যাত অলীয়ে কামেল সুফী সাধক খন্দকার নছরুল্লাহ মিয়াজি (রহ:)। খ্রিষ্টীয় ১৬ শতকের শুরুতে তিনি চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার চুনতি গ্রামে আসেন এবং বসতি স্থাপন করেন। বসবাসের সুবিধার জন্য তিনি জঙ্গলাকীর্ণ চুনতির উত্তর প্রান্তের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র টিলাসমেত একটি পল্লীর গোড়াপত্তন করেন। সেখানে তিনি একটি মকতব প্রতিষ্ঠা করে স্থানীয় ছেলেমেয়েদের শিক্ষা প্রদান করেন। এতে গ্রামবাসীরা তাঁকে ভক্তিশ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করে।

শাহ খন্দকার নছরুল্লাহ মিয়াজি (রহ:)'র দুই পুত্র ছিলেন শাহ শরীফ ও শাহ আবু শরীফ। যাঁরা বড় মিয়াজি ও ছোট মিয়াজি নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁরা উচ্চ শিক্ষিত আলেম ও কামেল তত্ত্বজ্ঞানী দরবেশ ছিলেন। যাঁদের অসংখ্য কারামতের কথা এখনো এলাকার মানুষের মুখে মুখে। শাহ খন্দকার নছরুল্লাহ মিয়াজি তাঁর পুত্র বড় মিয়াজি ও ছোট মিয়াজি দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও সাপ্তাহিক জুমার নামাজ আদায়ের জন্য চুনতির সবচেয়ে প্রাচীন এবং সর্বপ্রথম চুনতি বড় ও ছোট মিয়াজি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। চুনতি বড় মিয়াজি পাড়া পাহাড়ের ওপর মসজিদটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। বড় মিয়াজি ও ছোট মিয়াজি (রহ:) মসজিদের নামে সাড়ে ৯ কানি জমি ওয়াকফ করেন। মসজিদের পাশে চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা, চুনতি মিয়াজি বংশের নক্ষত্র গাজীয়ে বালাকোট হযরত শাহ মাওলানা আবদুল হাকিম (রহ:)'র ভিটা রয়েছে। বড় ও ছোট মিয়াজি মসজিদ, মসজিদ সংলগ্ন ভিটা, কবরস্থান ও মসজিদ সংলগ্ন পাহাড় মিলে ৪২ কানি জায়গা আছে। বর্তমানে মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও সেক্রেটারী হলেন- মাওলানা আবদুল কাদের নিজামী ও আলহাজ্ব জান মোহাম্মদ সিকদার।

চুনতি আউলিয়া মসজিদ

হযরত মাওলানা নজির আহমদ (রহ.) একজন আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন আলেম ও দানবীর ব্যক্তি ছিলেন। খ্রিষ্টীয় ১৭ শতকের শুরুতে তিনি চট্টগ্রামের লোহাগাড়ার চুনতিতে আসেন। যাঁর পুত্র ছিলেন হযরত শাহ হাবিব আহমদ (রহ.), যিনি প্রখ্যাত অলীয়ে কামেল ও সুফী সাধক। যিনি পীর সাহেব কেবলা চুনতি নামে পরিচিত।

অলীকুল শিরোমণি হযরত মাওলানা নজির আহমদ (রহ.) চুনতি আউলিয়া মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। চুনতি রোসাইঙ্গা ঘোনা পাহাড়ের টিলায় মসজিদটি অবস্থিত। তিনি মসজিদের জন্য জমি দান করেন এবং বহু টাকা-পয়সা ব্যয় করেন। নিজেই মসজিদের জন্য কাজ করেন এবং মসজিদ পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। তারপর মাওলানা পাঁচকড়ি মিয়াজি নামে এক ব্যক্তি এ মসজিদ সংস্কার করেন। তিনি চুনতি খান দিঘি মসজিদের মোয়াজ্জিন ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি আউলিয়া মসজিদের দায়িত্ব নেন। যে ১১ জন লোক আরব আমিরাত হতে চুনতি গ্রামে এসেছিলেন পাঁচকড়ি মিয়াজি ছিলেন তাঁদের একজন। হযরত মাওলানা নজির আহমদ (রহ.) পাঁচকড়ি মিয়াজি (রহ.) কে চুনতি বনপুকুর স্থানে বাড়ি নির্মাণ করে দেন। তারপর পাঁচকড়ি মিয়াজি (রহ.) রোসাইঙ্গা ঘোনা আউলিয়া মসজিদ এলাকায় আসেন। তাঁর দুই স্ত্রীর মধ্যে প্রথম স্ত্রীর বাড়ি চুনতি বড় মাওলানা পরিবারে। দ্বিতীয় স্ত্রীর বাড়ি চুনতির ঐতিহ্যবাহী পরিবার মিয়াজি পাড়ার মিয়াজি বংশে। পাঁচকড়ি মিয়াজি (রহ.)'র দুই পুত্র পুতুন মিয়াজি ও মুখলেছুর রহমান মিয়াজি। পুতুন মিয়াজির এক ছেলে ও এক মেয়ে। তাঁরা হলেন- নুর আহমদ মিয়াজি ও ওনদা খাতুন। মুখলেছুর রহমান মিয়াজির চার ছেলে ও দুই মেয়ে। তাঁরা হলেন- আবদুল মজিদ মিয়াজি, আবদুল হাকিম মিয়াজি, আনল হাকিম মিয়াজি, আবদুর রশিদ মিয়াজি, হাকিমা খাতুন ও সুফিয়া খাতুন। মাওলানা শাহ নজির আহমদ (রহ.) ইন্তেকালের পর উক্ত মাটির মসজিদে যাওয়ার কেউ সাহস করত না। কারণ উক্ত *মসজিদের কবরস্থানে শায়িত আছেন বহু পীর-বুজুর্গ। পরবর্তীতে কাজেম আলী মাষ্টার নামে চুনতির এক লোক উক্ত মাটির মসজিদ ভেঙ্গে মসজিদ সংলগ্ন পাহাড়ের* উত্তর পাশে নিচে মসজিদ পুনঃনির্মাণ করেন। কয়েকদিন পর তিনি স্বপ্ন দেখলেন "তুমি কে, এ মসজিদ ভেঙ্গে নিচে নির্মাণ করছ?" এ অবস্থায় উক্ত মসজিদ পুনরায় পুরাতন স্থানে নিয়ে যেতে হল। দীর্ঘদিন পর চুনতি সাতগড় বিটের ফরেস্টার সিলেটের অধিবাসী মোহাম্মদ ইয়াহিয়া ("কালো ফরেস্টার" নামে পরিচিত) আউলিয়া মসজিদ পুনরায় সংস্কার করেন।

মসজিদের চারিদিকে ছিল জঙ্গল। ফলে মাগরিব, এশা ও ফজরের নামাজ পড়তে কম মুসল্লি আসতেন মসজিদে। ধর্মভীরু কালো ফরেস্টার সংস্কারকৃত এ মসজিদে ৩৬ বছর ইমামতি করেছেন মরহুম মাওলানা আহমদ কবির। এরপর তাঁর ছেলে মাওলানা মোজাফ্ফর ৪/৫ বছর জুমার নামাজ পড়িয়েছেন। যেকোন উদ্দেশ্যে এ মসজিদে কেউ

মানত করলে লাভবান হতো এমন নজির সমাজে রয়েছে। প্রতিদিন বিভিন্ন দূর-দূরান্ত থেকে এ মসজিদে জুমার নামাজ আদায়ের জন্য মুসল্লিরা আসেন। বর্তমানে এ মসজিদে জুমার নামাজ পড়ান মরহুম মাওলানা ইয়াহিয়ার পুত্র মাওলানা সাজেদুল কাদের।

এ মসজিদে প্রতিদিন আছরের নামাজ আদায় করতেন হযরত মাওলানা শাহ হাফেজ আহমদ (রহ.) শাহ সাহেব কেবলা চুনতি। মসজিদের কবরস্থানে শায়িত আছেন অলীকুল শিরোমণি হযরত শাহ মাওলানা জাফর সাদেক (রহ.), হযরত শাহ মাওলানা পাঁচকড়ি মিয়াজি (রহ.) ও মাওলানা আবদুল গণি (রহ.) সহ অনেক বুজুর্গানে দ্বীন ও ওলামায়ে কেরাম। মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা নজির আহমদসহ মসজিদের চারপাশে শায়িত সকল বুজুর্গানে দ্বীনের স্মরণে প্রতিবছর ওখানে ইসালে সওয়াব ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

বর্তমানে আউলিয়া মসজিদ নতুনভাবে সংস্কার হয়েছে। মসজিদের আশেপাশের বিভিন্ন রাস্তা ইতোমধ্যে সংস্কার হয়েছে। উক্ত মসজিদটি সংস্কারে সংসদ সদস্য প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী ও সাতকানিয়া সোনাকানিয়ার চেয়ারম্যান নুর আহমদসহ ধর্মপ্রাণ অনেকে এগিয়ে এসেছেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সামরিক সচিব মেজর জেনারেল মিয়া মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন বীর বিক্রম, পিএসসি উক্ত মসজিদ ও মসজিদ সংলগ্ন এলাকার রাস্তাঘাট সংস্কারে ভূমিকা রেখেছেন। এসব ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেন চুনতি সিকদার পরিবারের সন্তান রাজনীতিবিদ ও সমাজ সেবক মো: আনিস উল্লাহ। (তথ্য সূত্র: মাওলানা নুরুল হুদা, সেক্রেটারী আউলিয়া মসজিদ, রোসাইঙ্গা ঘোনা, চুনতি, লোহাগাড়া)।

খাঁ'র দিঘী

উপজেলার আধুনগর খান হাট, মছদিয়া ও চুনতিতে ১টি করে ৩টি খাঁ'র দিঘী রয়েছে। খাঁ'র দিঘী সংলগ্ন মসজিদ আছে ২টি। মছদিয়ার বৌদ্ধ অধ্যুষিত জনপদে আছে ১টি *খাঁ'র দিঘী। খান হাট এলাকায় খান দিঘী ও দীঘির পশ্চিমে খান মসজিদ এবং চুনতিতে খাঁ'র দিঘী ও দিঘীর পশ্চিম পাশে রয়েছে খাঁ'র মসজিদ। সপ্তদশ শতাব্দীর* শেষের দিকে মোঘল আমলে দোহাজারী দুর্গের সেনাপতি আধু খাঁ ও তাঁর বংশধররা খাঁ'র দিঘী খনন ও মসজিদ নির্মাণ করেছেন বলে ধারণা করা হয়। ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার নবাব শায়েস্তা খাঁ'র (১৬৬৪-১৬৭৮, ১৬৮০-১৬৮৮ খ্রী:) পুত্র বুজুর্গ উমেদ খাঁ'র নেতৃত্বে চট্টগ্রাম দখল ও আরাকানী শাসনের অবসান হয়। এ অবস্থায় চট্টগ্রাম দক্ষিণাঞ্চলে মোঘলের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময় লেগেছে। ওই সময়ে আধু খাঁ ও তাঁর বংশধররা আরকান সড়কের (চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক) দু'পাশে এলাকাবাসীর উপকারে অনেক সম্পত্তি দান করেন। লোহাগাড়ায় আধুনগর ও চুনতিতে হাট, দিঘী ও মসজিদ নির্মাণ করে। আধুনগরের মছদিয়া এলাকায় তাঁরা বিশাল আকারের একটি দিঘী নির্মাণ করেন। আধুনগরের মছদিয়া

বৌদ্ধ অধ্যুষিত এলাকা হওয়ায় দিঘীর পাশে নির্মাণ করেন নি কোন মসজিদ। এসব দিঘী ও মসজিদ প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন বহন করে। (সূত্রঃ বিজয়বোধি স্মারক-২০১৪ইং।)

মুলুক শাহ দিঘী

আমিরাবাদ এলাকায় এই মুলুক শাহ দিঘীটি অবস্থিত। সম্ভবত সোলতানী কিংবা মোঘল আমলে এ দিঘী খনন করা হয়। বর্তমানে এ দিঘীর নিশানা বা চিহ্ন হিসেবে দিঘীর পাড় রয়েছে। দিঘীর মাঝখানে একটি ছোট মরা ছড়ার চিহ্ন রয়েছে। দিঘীর পাশে রয়েছে একজন পীর-আউলিয়া হযরত সৈয়দ আমীর আলী (রহঃ)'র মাজার। তিনি মুলুক শাহ নামে পরিচিত। জনশ্রুতি রয়েছে, মুলুক শাহ এলাকায় পানির প্রয়োজন মেটাতে এ দিঘী খনন করেন। অন্য কিংবদন্তী মতে, ওই সময়ে দিঘীর মাঝখান থেকে ঘরের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম থালা-বাসন ভেসে উঠত। কেউ যদি ঘরের সরঞ্জাম তালিকা করে গভীর রাতে দিঘীতে দিয়ে আসলে পরের দিন তালিকা অনুযায়ী সরঞ্জাম ভেসে উঠত। দিঘীর আয়তন প্রায় ৫ একর। বর্তমানে এ দিঘীটি ভরাট হয়ে গেছে। দিঘীর ভিতরে বিভিন্ন সবজির চাষ হয়। সৈয়দ আমীর আলী (রহঃ) প্রকাশ মুলুক শাহ'র মাজারের খাদেম জাগির হোসেন ফকির জানান, মুলুক শাহ মোঘল আমলে আরব দেশ থেকে এখানে ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য এসেছেন।

লোহার দিঘী

উপজেলা পরিষদের সামান্য দক্ষিণে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার সড়কের পাশে দিঘীটি অবস্থিত। সম্রাট শাহজাহানের (১৬২৭-১৬৫৮ খ্রীঃ) শাসনামলে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র শাহজাদা সুজা (১৬৩৯-১৬৪৭, ১৬৫২-১৬৬০ খ্রীঃ) বাংলার সুবেদার ছিলেন। ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৫ জানুয়ারী খাজুয়া নামক স্থানে শাহ সুজার বাহিনীর সাথে আওরঙ্গজেবের বাহিনীর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে শাহ সুজা পরাজিত হয়ে আশ্রয় নেয়ার জন্য আরাকানে চলে যান। জনশ্রুতি আছে, শাহ সুজা আরাকানে যাওয়ার পথে প্রথমে লোহারদিঘী ও পরে চুনতিতে যাত্রা বিরতী করেন। আক্রমন প্রতিহত করার জন্য লোহারদিঘী স্থানে একটি দিঘী খনন করে এবং লোহাগড় (লোহার দূর্গ) নির্মাণ করে।

অন্য জনশ্রুতি মতে, সম্রাট আওরঙ্গজেবের (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রীঃ) শাসনামলে তাঁর মামা শায়েস্তা খান বাংলার সুবেদার ছিলেন। সেই সময়ে শায়েস্তা খানের কিছু সৈন্যবাহিনী লোহারদিঘী নামক স্থানে অবস্থান নেয়। সেখানে ১টি দিঘী ও লোহার দূর্গ বা বলয় তৈরি করে। এ দিঘী খননের মধ্যে দিয়ে লোহাগাড়া নামকরণের সার্থকতা রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। ওই সময়ে দিঘী খুবই গভীর ছিল ও দিঘীর উত্তর পাশে এক মিয়াজি পরিবারের বসতি ছিল। পরবর্তীতে এ দিঘীর আশ-পাশ দিয়ে কেউ চলাফেরা করত না। দুপুর বেলায় দিঘীর মাঝখানে একটি স্বর্ণের নৌকা ভেসে ওঠত এবং মাঝি ছাড়া নৌকাটি চলত বলে জনশ্রুতি রয়েছে। বর্তমানে দিঘী ভরে গিয়ে জমির সাথে মিশে গেছে। দিঘীর পাড় এখনো কালের সাক্ষী বহন করে। দিঘীর আয়তন প্রায় ১০ একর।

মগদিঘী

এ দিঘী বড়হাতিয়া এলাকায় অবস্থিত। প্রাচীন নিদর্শনের সাক্ষ্য বহন করে দিঘীটি। জনশ্রুতি আছে, পাল বংশের শাসনামলে এ দিঘী খনন হয়। ওই সময়ে দিঘী থেকে স্বর্ণের নৌকা ও সামাজিক অনুষ্ঠানের ভৈষজপত্র ভেসে উঠত। মগদিঘী পাড়ের ঐতিহাসিক খেলার মাঠ ক্রীড়াবিদদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। অন্য কিংবদন্তী মতে, এ দিঘী থেকে যক্ষ/কুমির রাতের বেলায় গড়গড় শব্দ করে পাশের দিঘী ও লস্কর পুকুরে যেত। রাতেই আবার দিঘীতে যক্ষ ফিরে আসত। দিঘীর আয়তন প্রায় ৫ একর। দিঘীর পাড় থেকে বহু গুপ্তধন বিভিন্ন সময়ে খনন করে পাওয়া গেছে এমন নজির এলাকায় রয়েছে।

চট্টল তত্ত্ববিদ আবদুল হক চৌধুরীর মতে, চট্টগ্রাম অঞ্চল হাজার অধিক বছরকাল নিরবচ্ছিন্নভাবে আরাকান, সমতট, হরিকেল, পাট্টিকারা ও ব্রহ্মদেশের পগাঁর বৌদ্ধ রাজারা শাসন করেছেন। চট্টগ্রামে হরিকেল রাজ্যের অবস্থিতি ছিল বলে ধারণা করা হয়। অন্যদিকে চন্দ্রবংশীয় রাজাদের সাথে আরাকান রাজাদের সম্পর্ক ছিল। এছাড়াও সারা বাংলাদেশে পালবংশীয় শাসন প্রবর্তিত ছিল বলে মনে করা হয়। চন্দ্রবংশীয় রাজা গৌড় গোবিন্দের শাসনামলে চট্টগ্রামে বিহারসহ বহু বৌদ্ধ কীর্তি নির্মিত হয়। ফলে বড়হাতিয়ার মগদিঘী তাঁর আমলে নির্মিত হয় বলে ধারণা করা হয়।

মছদিয়া জ্ঞান বিকাশ বিহার

আধুনগরের মছদিয়া এলাকায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর এ মন্দিরটি অবস্থিত। প্রায় ৪শ বছর পূর্বে বিহারটি নির্মিত হয় বলে ধারণা করা হয়। বিহারটি প্রাচীন স্থাপত্যের কালের সাক্ষী বহন করে। এ বিহারের প্রথম সংস্কার হয় ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে। এ বিহারটি চূড়ান্ত রূপ পায় ২০০১ সালে। বিহারে তিন পাশে তিনটি দিঘী আছে। দিঘীগুলো হচ্ছে খাঁ'র দিঘী, সেবার দিঘী ও ভরাদিঘী। বিহারের মধ্যখানে সুরমা বিহার, বোধি বৃক্ষ, ধ্যানগৃহ, শতাব্দীর পুরানো সীমাঘর, শ্রীবুদ্ধ বিমান মহামুনি মন্দির এবং বুদ্ধের নির্মাণ শয্যা।

সেবা দিঘীর পূর্ব পাড়ে আছে একটা উঁচু ঢিবি। চর্তুদিকে ভাঙা ইট ছড়ানো। এ ইটের সাথে রামকোট মন্দিরের প্রাপ্ত ইটের মিল পাওয়া যায়। (তথ্যসূত্রঃ বিজয়বোধি স্মারক-২০১৪ খ্রিষ্টাব্দ)

ঠাকুর পাহাড় ও ঠাকুর বিহার

পূর্ব কলাউজানের লক্ষণের খীলে পাহাড়টি অবস্থিত। পাহাড়টি এলাকায় প্রাচীন নিদর্শন হিসেবে কালের সাক্ষী হয়ে আছে। বর্তমানে এটি লক্ষণের খিল মহাশান্তি ভাবনাকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। আরাকানীদের শাসন আমল হতে এটি ধ্যান শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল বলে ধারণা করা হয়। এটি আবিষ্কার করেন বিপিন চন্দ্র বড়ুয়া প্রকাশ লেদু বড়ুয়া। আয়তন প্রায় ৪ একর। এই ঠাকুর পাহাড়ে প্রাচীন আমলের ঠাকুর বিহারটি অবস্থিত বলে জনশ্রুতি রয়েছে। বর্তমানে এখানে একটি বুদ্ধ জাদি মন্দির ও দু'টি ভাবনা কুঠির রয়েছে। বুদ্ধ রক্ষিত মহাস্থবির ১৮৭৮ সালে সধর্ম রত্নাংকুর বুদ্ধ বিহারের গোড়াপত্তন করেন। কর্ণ ঠাকুর দুই দশককাল এ বিহারের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

মগধেশ্বরী মন্দির

বড়হাতিয়া নাথপাড়ার ঐতিহাসিক মগদিঘীর উত্তর পাড়ে মন্দিরটির অবস্থান। ১৯০৪ সালে প্রয়াত ধীরেন্দ্র বিজয় নাথ (ধীরেন্দ্র নাথ বৈদ্য) এ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় ৯০ শতক জায়গার উপর মন্দিরটি নির্মাণ করা হয়। প্রাচীন এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানটির আঙিনায় দাঁড়িয়ে আছে ২শ বছরের অশ্ববৃক্ষ ও বটবৃক্ষ। জনশ্রুতি আছে, কোন হিন্দু সম্প্রদায় শ্রাদ্ধ শান্তি ক্রিয়া কর্মাদি ও পূজা অর্চনার আগের দিন মা মগধেশ্বরীর নামে পূজা দিয়ে কিছু চাইলে তা পেত। বিশেষ করে থালা-বাসন চাইলে তা নৌকাযোগে মন্দিরের পাশের মগদিঘী থেকে ভেসে ওঠত।

কংসদিঘী

পুটিবিলা ইউনিয়নের নালার কুল এলাকায় এটি অবস্থিত। আরাকান রাজা নরমিখলা শাসনামলে 'কংস' নামে এক মগ ধর্মাবলম্বী রাজার প্রতিনিধি এ দিঘী খনন করেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। বর্তমানে দিঘীর চিহ্নস্বরূপ দিঘীর তিনদিকে পাড় রয়েছে। আয়তন প্রায় ৫ একর। কংস দিঘীর সাথে কংসনাল খালের সংযুক্ত ছিল। বর্তমানে এটি ভরাট হয়ে জমিনে পরিণত হয়েছে।

রাজার খিল

এটি পুটিবিলা ইউনিয়নের সাতগড়িয়ার দক্ষিণ পাশের বিল। আয়তন প্রায় ২৫ একর। জনশ্রুতি আছে, আরাকান রাজা নরমিখলা এ খিল বা বিলটি তৈরি করেছেন। তাঁর নামানুসারে রাজার খিল বা বিল হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

মগকাটা পুকুর

আমিরাবাদের হাজারবিঘা এলাকায় পুকুরটি অবস্থিত। জনশ্রুতি আছে, সোলতান জালাল উদ্দীন মোহাম্মদ শাহের (১৪১৮-১৪৩২ খ্রী:) শাসনামলে এই পুকুর খনন হয়। পুকুর নিয়ে এলাকায় কিছু কথা লোকমুখে শুনা যায়। মোঘল আমলে মগ ও মোঘল বাহিনীর সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন মগ নিহত হয়েছিল এখানে। অন্য কিংবদন্তী হল, এক মগ রাজার শাসনামলে মগরা পুকুরটি খনন করে। ফলে এটি মঘকাটা পুকুর নামে পরিচিত। পুকুরটি বর্তমানে অন্যান্য পুকুরের মত এলাকাবাসীর ব্যবহারের মধ্যে রয়েছে। পুকুরের আয়তন প্রায় ২ একর।

লক্ষীজনার্দ্দন মন্দির

উপজেলার পূর্ব কলাউজান এলাকায় এই মন্দির অবস্থিত। জনশ্রুতি আছে, শাহ সুজার পার্ষদ সম্ভুরাম কর্তৃক এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। লক্ষীজনার্দ্দন রাধাকৃষ্ণের আরেক নাম।

সুখছড়ী কালী মন্দির ও রাস মহোৎসব

আমিরাবাদ ইউনিয়নের একটি গ্রামের নাম সুখছড়ী। এ গ্রামে সুখছড়ী কালী মন্দিরের অবস্থান। এখন থেকে ৬০/৬৫ বছর পূর্বে এ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। ৬০ বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হলে প্রতিষ্ঠার সন হবে ১৯৫৫ সাল। স্বর্গীয় ক্ষেমেষ চন্দ্র দত্ত, জৌতিষ চন্দ্র দত্ত, উপেন্দ্র লাল আইচ, গিরিশ চৌধুরী, বিশাল চৌধুরী, প্রতাপ চন্দ্র দাশ, অনন্ত সওদাগর, জ্যোতিরিন্দ্র চক্রবর্তী, অনন্ত চৌধুরী, মনিন্দ্র লাল চৌধুরী ও দ্বিজেন্দ্র লাল চৌধুরী এ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে মন্দিরের সার্বিক কার্যক্রম সুন্দরভাবে পরিচালনায় এগিয়ে আসেন স্বর্গীয় ব্রজেশ্বর চৌধুরী, ডাঃ প্রশান্ত কুমার দত্ত, অধ্যাপক সন্তোষ দাশ, পূজারী পুলিন বিহারী চক্রবর্তী, মাষ্টার বাদল দত্ত, স্বর্গীয় অমল দাশ ও চিত্ত রঞ্জন চক্রবর্তী। ১৯৫৭ সালে সুখছড়ী গ্রামে হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব রাস মহোৎসব চালু হয়। এটি তখন চৌধুরী বাড়ির নিজস্ব পূজা ছিল। স্বর্গীয় গিরিশ চন্দ্র চৌধুরীর সহধর্মিনী স্বর্গীয় তুলশী বালা চৌধুরীর মানসী পূজারূপে পরিচালিত হতো। পরবর্তীতে এ রাস মহোৎসব স্বর্গীয় ব্রজেশ্বর চৌধুরীর একক প্রচেষ্টায় ১৯৫৯ সালে কালী বাড়িতে নিয়ে আসা হয়।

রাস মহোৎসবের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্বর্গীয় ব্রজেশ্বর চৌধুরী। তিনি রজতজয়ন্তীসহ ২৯ বছর এ মহোৎসবের সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। কালের বিবর্তনে এ রাস মহোৎসব মহীরূপে সার্বজনীন মহোৎসবে পরিণত হয়েছে। কালী মন্দির প্রাঙ্গণে প্রতিবছর অনাড়ম্বরভাবে রাস মহোৎসব পালিত হয়ে আসছে। এ মহোৎসবকে কেন্দ্র করে এলাকায় বসে বড় ধরনের মেলা। মেলায় বিভিন্ন ধরনের খাদ্য সামগ্রী, হস্তশিল্পসহ অন্যান্য সামগ্রীর এবং প্রচুর লোকের সমাগম হয়। (তথ্য সূত্রঃ (১) রাস মহোৎসব সংবিধান (২) অধ্যাপক শোভন কৃষ্ণ চৌধুরী, সুখছড়ী কালী বাড়ি, আমিরাবাদ, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম)।

গাব গাছ

গাব (Mangosteen) পূর্ব ভারতীয় একটি ফল গাছের নাম। সেই গাব গাছ উপজেলার পূর্ব কলাউজান এলাকায় প্রাচীন নিদর্শন হিসেবে এখনো বেঁচে আছে। এলাকার প্রবীণদের মতে, এ গাছটির বয়স ৪শ বছরের অধিক। গাছের আকৃতি-প্রকৃতি দেখেও বহু প্রাচীন কালের গাছ মনে হয়। গাছটির নামানুসারে এলাকাটির নামকরণ হয়েছে গাবতল। এ গাছটিকে ঘিরে রয়েছে বহু ইতিহাস ও ঐতিহ্য। জনশ্রুতি আছে, এ অঞ্চলটি ছিল পাহাড়-জঙ্গল বেষ্টিত। ভয়ে একা কেউ এ অঞ্চল দিয়ে চলাফেরা করত না। অবাধে বিচরণ করত বনের পশুরা। কালের বিবর্তনে ১৯৫৯ কিংবা ১৯৬০ সাল থেকে গাবতলায় জমে ওঠে আড্ডা। পরবর্তীতে ওই এলাকার চৌধুরী বাড়ির ইসলাম চৌধুরী (মাইজ্যা মিয়া) এখানে ঘোড়-দৌড় মেলার আয়োজন করে। গাবতলায় যে বাজার চালু রয়েছে তা মাইজ্যা মিয়ার বাজার নামে পরিচিত। প্রাচীন নিদর্শন গাব গাছটি এখনো ইতিহাস ও ঐতিহ্য লালন করে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপজেলার
কিছু প্রাচীন জনপদ

Chunati.com
Pioneer in village based website

ইতিহাস প্রণয়ন নিঃসন্দেহে অসাধ্য সাধন এবং বিরাট একটি চ্যালেঞ্জ।

- ঐতিহাসিক ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান

উপজেলার কিছু প্রাচীন জনপদ

গৌড়স্থান

১৪০৬ খ্রীষ্টাব্দে আরাকানের রাজা মেং-তি-মুন বা নরমিখলা পরাজিত হন ব্রহ্মরাজের কাছে। নরমিখলা বাংলার সুলতান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ (১৩৮৯-১৪১০ খ্রী:) এর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে। বাংলার সুলতান জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ শাহ'র শাসনামলে (১৪১৮-১৪৩২ খ্রী:) গৌড়ের রাজদরবারে আশ্রয় গ্রহণকারী রাজা নরমিখলা সোলতান মোহাম্মদ শাহকে যুদ্ধক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেন। ফলে জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ শাহ নরমিখলাকে আরাকানের সিংহাসন উদ্ধারে সাহায্য করেন। ১৪৩৯ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় সুলতান সদাকত খাঁ নামক সেনাপতির নেতৃত্বে বিশাল গৌড় বাহিনী আরাকান রাজ্য পুনঃদখল করে নরমিখলাকে আরাকানের রাজা হিসেবে বসিয়ে দেন। তখন থেকে নরমিখলা আরাকান রাজ্য শাসন করেন। ড. আবদুল করিম বাংলার ইতিহাস (সোলতানী আমল) গ্রন্থে উল্লেখ করেন- এ. পি. ফেয়ার বলেন যে, বাংলার সুলতানের সাহায্যে নরমিখলা সিংহাসন ফিরে পান। ফলে নরমিখলা বাংলার সোলতানের সামন্তে পরিণত হয়েছিলেন। জনশ্রুতি আছে, আরাকান বিজয়ের পর গৌড়বাহিনী চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার গৌড়স্থান নামক স্থানে দূর্গ স্থাপন করেন।

গৌড়স্থান এলাকায় প্রায় ১০ একর জায়গার উপর এই আরাকান রাজার রাজবাড়ি ও দূর্গ ছিল। সেখান থেকে শাসনভার পরিচালিত হতো বলে জনশ্রুতি রয়েছে। গৌড়বাহিনীর দূর্গকে কেন্দ্র করে গৌড়স্থান নামকরণ করা হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, গৌড়স্থানে রাজবাড়ির কোন স্মৃতি চিহ্ন নেই। আশে-পাশে কয়েকটি পুকুরের নিশানা রয়েছে। পুকুরের মধ্যে স্থানীয় নামানুসারে জলটংগী পুকুর, ঝি-দিঘী, গোড়চালি পুকুর, চন্দুক পুকুর, নলুয়া পুকুর, কন্যা পুকুর, কড়ি পুকুর ইত্যাদি। গৌড়স্থান পুটিবিলা ইউনিয়নের ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত। দীর্ঘদিন এ রাজা পুটিবিলাসহ লোহাগাড়া অঞ্চলে শাসন করেছেন বলে ধারণা করা হয়। ফলে পুটিবিলাসহ লোহাগাড়ার অসংখ্য অঞ্চলে এখনো বহু পুকুর, দিঘী, খাল-ছড়া, মগদের নামে নামকরণ হয়েছে। কারো কারো মতে, এ রাজা পুটিবিলা এলাকায় কয়েক শত পুকুর খনন করেছেন।

(তথ্যসূত্র: মোঘল সাম্রাজ্যের বিলুপ্ত অধ্যায় দোহাজারী- জামাল উদ্দিন)

রাজঘাটা

আমিরাবাদের একটি গ্রামের নাম রাজঘাটা। আরকান সড়ক (চট্টগ্রাম-কক্সবাজার সড়ক) সংলগ্ন সুন্দর একটি বসতি এলাকা। এলাকার পাশ দিয়ে চলে গেছে টংকাবতী খাল। জনশ্রুতি আছে, আরাকান রাজা নরমিখলা নামক এক রাজার ঘাটা (যাতায়াতের পথ) ছিল এটি। আরাকান রাজা তাঁর বাহিনী নিয়ে এ ঘাটা দিয়ে গৌড়স্থানে গিয়েছিল বলে এটির নামকরণ রাজঘাটা হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

সুখছড়ী

সুখছড়ী গ্রাম এক অনাবিল প্রাকৃতিক পরিবেশ সমৃদ্ধ গ্রাম। এ গ্রামের দুই পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে টংকাবতী খাল। আর সুখছড়ী গ্রামের বুক ছিঁড়ে টংকাবতী খালে পতিত হয়েছে ৩টি ছড়া। যা বছরের অধিকাংশ সময় থাকে শুকনো। জনশ্রুতি আছে, ওই শুকনা ছড়াগুলোর নামানুসারে এ গ্রামের নামকরণ হয়েছে শুকছড়ী। অন্য কিংবদন্তী মতে, সুখ শব্দের অর্থ সমৃদ্ধি বা শান্তি আর ছড়ি শব্দের অর্থ লাঠি বা দন্ড। প্রাচীনকাল থেকে এ গ্রামের মানুষ এলাকায় নেতৃস্থানীয় মানুষের আদেশ, উপদেশ, শাসন মেনে চলার প্রবণতায় বেড়ে ওঠেছে। ফলে এখানে বিভিন্ন ধর্ম, গোত্র ও বর্ণের মানুষ সুখ-শান্তিতে বসবাস করত। আজ পর্যন্ত এলাকায় সেই শান্তি বজায় রয়েছে। এলাকায় সম্প্রীতির সেতু বন্ধন দেশের জন্য মডেল। শুধু তা নয়, এ জনপদটির নাম শুনলে মনে হবে যেন কোন পাহাড়বেষ্টিত জনপদ। কিন্তু না, এ গ্রামটি উপজেলা সদর হতে প্রায় ৩ কিলোমিটার পূর্বদিকে। যা আমিরাবাদ ইউনিয়নের একটি গ্রাম। এই গ্রামে ১টি উচ্চ বিদ্যালয়, ২টি মাদ্রাসা, ১৫টি মসজিদ ও দক্ষিণ চট্টগ্রামের সবচেয়ে প্রাচীন হিন্দুদের কালিমন্দির। এ জনপদে উচ্চ শিক্ষিত মানুষের মধ্যে রয়েছেন এনবিআর-এর সাবেক সদস্য সম্ভুনাথ দাশ, বুয়েটের সাবেক ভারপ্রাপ্ত চ্যান্সেলর ড. দীপক দাশ, বাংলা একাডেমির সাবেক উপ-পরিচালক তপন চক্রবর্তী, সাবেক সিনিয়র ফরেস্ট রিসার্স অফিসার আফজালুর রহমান, জনতা ব্যাংকের সাবেক জি.এম মরহুম আনোয়ার হোসেনসহ বহু কৃতি সন্তান। সুফী সাধকের মধ্যে রয়েছে আঠারো শতকের শুরুর দিকের অলিকুল শিরোমণি আলেমেদ্বীন সৈয়দ মো: মোফাদ্দলুর রহমান। তাঁর স্মৃতি বিজড়িত ঘোড়-দৌড় সভা এখানো এলাকায় ঐতিহ্য বহন করছে। তিনি ১৮৯৯ সালে ঘোড়-দৌড় সভার ব্যবস্থা করেন। জনশ্রুতি আছে, যখন গ্রামের মানুষের শিক্ষায় ও বিনোদনে কোন শরীয়ত সম্মত ব্যবস্থা ছিল না, তখন মানুষ নানা অমানিশা ভরা জাহেলী সংস্কৃতিতে ডুবে থাকত। ওই সময়ে হযরত মাওলানা মোফাদ্দলুর রহমান ২ দিন ব্যাপী সুখছড়ী এলাকায় ঘোড়-দৌড় সভার আয়োজন করেন। ওই সভাকে কেন্দ্র করে দেশীয় ঐতিহ্যের বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রীর সম্ভার বেচা-কেনা হয়। এলাকার প্রতিটি ঘরে মেহমান আসে সভাকে কেন্দ্র করে ঈদের খুশির মতো আনন্দ বিরাজ করে। শাহ সুফি আল্লামা মাওলানা মরহুম সৈয়দ ইসমাইল (রহ:) এলাকায় অলিকুল শিরোমণি। প্রতিবছর তাঁর রওজায় অসংখ্য ভক্তের পদচারণা ও অংশ গ্রহণে ওরস মোবারক সম্পন্ন হয়।

এই এলাকার আরেক নিদর্শন কামার দিঘী। জনশ্রতি আছে, শাহ সুজার আমলে অন্য অঞ্চল থেকে কামার গোষ্ঠী এসে এ গ্রামে বসতি স্থাপন করে। মোঘল আমলের স্মৃতি কামার দিঘী এখনো কালের সাক্ষী হয়ে আছে।

তথ্যসূত্র: মাস্টার মোবারক আলী, সিনিয়র শিক্ষক, সুখছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

হাজারবিঘা

আমিরাবাদ ইউনিয়নের একটি গ্রামের নাম হাজারবিঘা। সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে মোঘল বাহিনী ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রাম অঞ্চল অধিকার করে। মোর্তুজা খাঁর নেতৃত্বে মোঘল বাহিনী চট্টগ্রাম দক্ষিণাঞ্চলের রামু পর্যন্ত গিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা সুবিধা না থাকায় ফেরত আসে এবং শঙ্খ নদীর উত্তর তীরে অবস্থান নেয়। আধু খাঁ ও লক্ষণসিংহ নামের দুইজন হাজারী সেনাপতি সেখানকার সীমান্তের দায়িত্ব পান। আধু খাঁকে দায়িত্ব দেয়া হয় শঙ্খ নদীর দক্ষিণ এলাকা সাতকানিয়া, লোহাগাড়া, বাঁশখালীসহ চট্টগ্রাম দক্ষিণ অঞ্চল। আধু খাঁ উক্ত এলাকায় বনজঙ্গল পরিষ্কারের মাধ্যমে বসতি স্থাপন ও আবাদের জন্য উপযোগী করে তোলেন। হাজারী সেনাপতি আধু খাঁ উক্ত এলাকায় বিঘাবিঘা জায়গা উপযোগী করার কারণে হাজার বিঘা নামকরণ হয়েছে বলে জনশ্রুতি রয়েছে।

উজিরভিটা

সদর ইউনিয়ন লোহাগাড়ার একটি গ্রামের নাম উজিরভিটা। সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলে শায়েস্তা খান ১৬৬৬ সালে চট্টগ্রাম বিজয় করেন। শায়েস্তা খানের পুত্র বুজর্গ উমেদ খান চট্টগ্রাম বিজয়ের সময় প্রধান সেনাপতি ছিলেন। ওই সময়ে মোহাম্মদ খাঁ নামে একজন নায়েবে উজির ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে উজিরভিটা আসেন। ফলে এই উজিরের নামে উজিরভিটা নামকরণ হয়েছে বলে জনশ্রুতি আছে। অন্যদিকে উজিরভিটা উজির ও ভিটা দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। জনৈক উজিরের ভিটা ছিল বলে উজির ভিটা নামকরণ হয়।

মল্লিক ছোবহান গ্রামের চৌধুরী পাড়ায় মোহাম্মদ খান নায়েবে উজির জামে মসজিদ রয়েছে। মসজিদটি ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত যা শিলালিপিতে উল্লেখ রয়েছে।

কিল্লার আন্দর

আমিরাবাদ ইউনিয়নে কিল্লার আন্দর গ্রামের অবস্থান। ইতিহাস থেকে জানা যায়, বাংলার সুলতান জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ শাহের (১৪১৮-১৪৩২ খ্রী:) শাসনামলের পর থেকে আরাকান বাংলার সুলতানের সামন্ত রাজ্যে পরিণত হয়। ১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দে জালাল উদ্দিন আরাকানে নিজ আধিপত্য বিস্তার করে ওই সময়ে তিনি রাজ্যচ্যুত আরাকান রাজা মেং-তি-মুন বা নরমিখলাকে রাজ্য পুনরুদ্ধারে সাহায্য করেন। বাংলার সুলতান সদাকত খাঁ সেনাপতির নেতৃত্বে বিশাল গৌড় বাহিনী দ্বারা আরাকান রাজ্য পুনদখল করে নরমিখলাকে আরাকানের রাজ আসনে বসিয়ে দেন। জনশ্রুতি আছে, আরাকান বিজয়ের পর গৌড় বাহিনী লোহাগাড়ার কিল্লার আন্দর স্থানে দূর্গ স্থাপন করেন। ওই এলাকায় পুকুর/দিঘী খনন করেন। তখন থেকে এলাকাটির নাম হয়েছে কিল্লার আন্দর। কিল্লার আন্দর থেকে গৌড় বাহিনী রাজঘাটা হয়ে পুটিবিলার গৌড়স্থানে দূর্গ স্থাপন করেন। সেখান থেকে শাসনভার পরিচালিত হত বলে ধারণা করা হয়। (তথ্যসূত্রঃ মোঘল সাম্রাজ্যের বিলুপ্ত অধ্যায় দোহাজারী- জামাল উদ্দিন)

মছদিয়া

ছদিয়া আধুনগর ইউনিয়নের একটি গ্রামের নাম। এটি বৌদ্ধ অধ্যুষিত একটি গ্রাম। মগ সম্প্রদায়ের এক ধনাঢ্য ব্যক্তির নাম মছদিয়া। তাঁর নামানুসারে মছদিয়া নামকরণ হয়। অন্য জনশ্রুতি মতে, প্রাচীনকালে ছৈদ্দা ও মছৈদ্দা নামে দুই ভাই এখানে বসতি স্থাপন করে। ওই সময়ে পানীয় জলের অভাব দূর করতে এক ভাই মছৈদ্দা বর্তমান বিহারের উত্তর পাশে বিশাল দিঘী খনন করে। দিঘীটির নামকরণ হয় মছৈদ্দার দিঘী। পরবর্তীতে এ দিঘীর নাম থেকে মছদিয়া নামকরণ হয়। মছদিয়ায় তৎকালীন সময়ে একটি বড় দিঘী খনন করা হয়। বর্তমানে এটি ভরা দিঘী নামে পরিচিত। দিঘীর পশ্চিম পাড় সংলগ্ন এলাকায় একটি বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণ করেন তিনি। মছদিয়া জ্ঞান বিকাশ বিহারের দক্ষিণে একটি খাঁ'র দিঘী আছে। কিন্তু এলাকায় নেই কোন মসজিদ। যার কারণে মছদিয়া বৌদ্ধ অধ্যুষিত এলাকা। চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতের মগধ হতে আগত বৌদ্ধরা মছদিয়া গ্রামে সেবা দিঘী খনন করেন এবং যা মগধেশ্বরীর দীঘির নামে উৎসর্গ করেন। (তথ্য সূত্রঃ ঐক্য, সাতকানিয়া-লোহাগাড়া বৌদ্ধ ঐক্য পরিষদ সংবর্ধনা স্মারক-২০০৮।)

নারিশ্চা

নারিশ্চা চুনতি ইউনিয়নের একটি গ্রামের নাম। গ্রামের পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বীভাবে সুরমা টিলা অবস্থিত। টিলাটি এলাকায় জাদি পাহাড় হিসেবে পরিচিত। টিলার চূড়ায় একটি জাদি মন্দির ছিল বলে পাহাড়টির নাম হয়েছে জাদি মন্দির।

নারিশ্চা নামকরণের সুন্দর ইতিহাস রয়েছে। গ্রামটির দক্ষিণ পাশে সারি সারি পাহাড়ের স্বচ্ছ সলিল ঝিরি উত্তর দিকে প্রবাহিত। এই স্রোতধারা আঁকাবাঁকা হয়ে গতিতে চলে আসে নাড়ির ছড়া বা নারিয়ার ছড়া নাম হয়ে। এ নারিয়ার ছড়া হতে নারিশ্চা উৎপত্তি বলে ধারণা করা হয়। নারিয়ার ছড়া ও ডলু খালের মিলনস্থলে গড়ে ওঠেছে নারিশ্চা গ্রাম।

তথ্যসূত্রঃ

১। ঐক্য, সাতকানিয়া-লোহাগাড়া বৌদ্ধ ঐক্য পরিষদ প্রকাশনা-২০০৪ইং।
২। বিজয়বোধি স্মারক-২০১৪।

ইয়াছিন পাড়া

মোঘল আমলে ইয়াছিন নামের একজন ইসলাম ধর্ম প্রচারক উপজেলার বড়হাতিয়ায় আসেন। বসতি স্থাপন করে ইসলামের প্রচার-প্রসারে কাজ শুরু করেন। এই ইয়াছিনের নামানুসারে ইয়াছিন পাড়া নামকরণ হয়েছে বলে জনশ্রুতি রয়েছে।

কুশাঙ্গের পাড়া ও হাদুর পাড়া

পাড়া দুইটি বড়হাতিয়া ইউনিয়নে অবস্থিত। জনশ্রুতি আছে, কুশান ও হাদুই দুই সহোদর। তাঁরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মগ ছিলেন। হাদুই ইসলাম ধর্মগ্রহণ করে হাদু নাম

রাখেন। কুশান বৌদ্ধ ধর্মে থেকে যান। কুশান যেখানে বসতি স্থাপন করেন সেটির নামকরণ হয় কুশাঙ্গের পাড়া আর হাদু যেখানে বসতি স্থাপন করে সেটির নাম হয় হাদুর পাড়া।

হাজীর রাস্তা

সোলতানী ও মোঘল আমলে বাংলাদেশের মানুষ হজ্ব করতে সৌদি আরবে যেত সমুদ্র পথে। সমুদ্র পথে জাহাজযোগে হজ্ব করতে যেতে হত। ওই সময়ে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর দেশী-বিদেশীদের যাতায়াতের প্রধান বাহন ছিল। চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর দিয়ে যাতায়াত হত বেশি। আরবের সুফী সাধক ও পর্তুগীজসহ অন্যান্য ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এ সমুদ্র পথ দিয়ে যাতায়াত করত। চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকার মানুষরা যাতায়াতের মাধ্যম হিসেবে এলাকার নদী, খাল-ছড়া ব্যবহার করত।

জনশ্রুতি আছে, লোহাগাড়া থেকে হজ্ব করতে যাওয়ার জন্য হাজীরা মিলিত হত হাজীর রাস্তা নামক স্থানে। এলাকার প্রবীন রাজনীতিবিদ সৈয়দ জান মোহাম্মদ সিকদার জানান, আধুনগর ও চুনতির সংযোগস্থলে অবস্থিত এ স্থানটি ওই সময়ে সমুদ্রের মোহনা ছিল। বর্তমানে এটি কাজির ডেবা নামে পরিচিত। এই কাজীর ডেবা খালের চ্যানেল ছিল। পাশে ঐতিহাসিক রফিয়া মুড়া ও বটগাছ ছিল। রফিয়া মুড়ায় হাজীরা মিলিত হত। কাজীর ডেবা থেকে জাহাজযোগে হাজীরা হজ্বের উদ্দেশ্যে সৌদি আরবে রওনা দিতেন। ফলে এ জায়গাটির নাম হয় হাজীর রাস্তা। রফিয়া মুড়া বর্তমানে ঈদগাহ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আর বটগাছটি বর্তমানে কালের সাক্ষী বহন করে।

মল্লিক ছোবহান

আমিরাবাদ ইউনিয়নের একটি গ্রামের নাম মল্লিক ছোবহান। যে গ্রামে স্থাপিত হয়েছে উপজেলার প্রাচীন মসজিদ মোহাম্মদ খান ছিদ্দিকী (রহ:) নায়েবে উজির জামে মসজিদ। সুবেদার শায়েস্তা খানের আমলে ১৬৬৬ সালে মসজিদটি নির্মিত হয়। মোহাম্মদ খানের মসজিদ নির্মাণ ও ইসলাম ধর্ম প্রচারকে ঘিরে মল্লিক ছোবহান নামকরণ হয়েছে।

জনশ্রুতি আছে, মোহাম্মদ খা মোঘল আমলে অর্থাৎ ১৬৬৬ সালে এই এলাকায় ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে আসেন। ওই সময়ে তিনি এলাকার নামকরণ করে মালিক ছোবহান। পরবর্তীতে মালিক ছোবহান পরিমার্জিত হয়ে মল্লিক ছোবহান হয়েছে।

অন্য কিংবদন্তী মতে, সোলতানী আমলে মুলুক ছোবহান নামে এক রাজা এলাকাটি সংস্কার করেন। বসতি স্থাপনের জন্য উপযোগী করে গড়ে তোলেন। তাঁর নামানুসারে এলাকার নাম মুলুক ছোবহান হয়। পরবর্তীতে এটি পরিমার্জিত হয়ে মল্লিক ছোবহান নাম ধারণ করে।

আরকান সড়ক (চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক)

ঐতিহাসিকদের মতে, সম্রাট শাহজাহানের ২য় পুত্র শাহজাদা সুজার আমলে আরকান সড়ক (চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক) হয়। এই আরকান সড়কটি একদিকে কক্সবাজারের রামু, অন্যদিকে ফেনী পর্যন্ত বিস্তৃত বলে ধারণা করা হয়।

ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান তাঁর বাংলার ইতিহাস (প্রাচীনকাল থেকে ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত) গ্রন্থে বলেছেন ১৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দের ৫ জানুয়ারী খাজুয়া প্রান্তরে শাহ সুজার বাহিনীর সাথে আওরঙ্গজেবের বাহিনীর যুদ্ধ হয়। শাহ সুজা যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ মে তিনি আরাকানে পৌঁছলে সেখানে আরাকানী মগদের হাতে নিহত হন। ড. আবদুল করিম "কক্সবাজারের ইতিহাস" গ্রন্থে বলেছেন শাহ সুজা ১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দের ৩ জুন দেয়াঙে (আনোয়ারা) পৌঁছেন। ১৬৬০ সালের ১০ জুন দেয়াঙে রমজানের ঈদের নামাজ পড়েন। ১৬৬০ সালের ২৬ আগস্ট আরাকানের রাজধানী পৌঁছেন। ওই সময় তাঁর সাথে ছিলেন সেনাপতি ফতেখাঁ, শোরমস্ত খাঁ, গোলাম হোসেন খাঁ, শের জব্বার খাঁ, নুরুল্লা খাঁ, শের দৌলত খানসহ ১৮ জন সেনাপতি এবং সাড়ে ৪ হাজার যোদ্ধা ও তাদের ব্যবহৃত কামানসহ বিপুল পরিমাণ সমরাস্ত্র।

আরাকানের রাজা চন্দ্রসুধর্ম্মার শাসনামলে শাহ সুজা আরাকানের রাজধানীতে পৌঁছেন। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের মতে, ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ আগস্ট শাহ সুজা ঘনিষ্ঠ জনকে সঙ্গে নিয়ে আরাকানের রাজধানীতে পৌঁছেন। ওই সময়ে তিনি অন্যান্য মোঘল বাহিনীকে বিদায় জানান। সৈয়দ আলী আহসান "পদ্মাবতী" গ্রন্থে বলেছেন শাহ সুজা পলায়নকালে তাঁর সাথে দেড় হাজার অশ্বরোহী সৈন্য ছিল। মাত্র ৪০ জন অনুচর ও ২শ জন দেহরক্ষী, স্ত্রী, তিন কন্যা, এক পুত্রকে নিয়ে গর্জনিয়া হয়ে আরাকানের রাজধানীতে পৌঁছেন। শাহ মাওলানা আবদুল হাকীম (রহ:) রচিত "শজরাহ" মূলে জানা যায়, শাহ সুজা ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ মে নিজ পরিবারের সদস্যবর্গ, ২শ একান্ত অনুগামী ও ৩ হাজার সৈন্য সামন্ত নিয়ে চট্টগ্রাম হয়ে আরাকান অভিমুখে যাত্রা করেন। সাঙ্গু নদ ও ডলু খালের দক্ষিণে এসে পর্তুগীজ চলাচল উপযোগী পানি পথ সমাপ্ত হলে চুনতির বর্তমান কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দান ও কবরস্থানের পাদদেশে নৌবহর নোঙ্গর হয়। তারপর তাঁরা পায়ে হেঁটে সামান্য দক্ষিণে গিয়ে চারিদিক জঙ্গলঘেরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যমন্ডিত সুপ্রশস্ত অনুচ্চ পাহাড়ে আস্তানা স্থাপন করে। সেখান থেকে তারা আরাকানের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। মোঘলবাহিনী ঝোঁপ-জঙ্গল পরিষ্কার করে সড়ক তৈরির মাধ্যমে যাত্রা করে।

চট্টগ্রামের স্থানীয় লোকগীতি "পরীবানুর হাওলা"তে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শাহ সুজা দেয়াঙ (বর্তমান আনোয়ারা) থেকে স্থলপথে আরাকানে যান। যাওয়ার পথে চট্টগ্রামের লোহাগাড়ার চুনতিতে অবস্থান করেছেন বলে ধারণা করা হয়। রামুর ইতিহাস গ্রন্থের প্রণেতা গবেষক আবদুল কাসেম বলেছেন, শাহ সুজার বিশাল মোঘলবাহিনী দেয়াঙ থেকে দু'দলে বিভক্ত হয়ে যাত্রা করে। যাত্রাপথের অগ্রগামী মোঘলবাহিনী অরণ্যপথে ২২ হাত চওড়া একটি সড়ক নির্মাণ করেন। রেনেল (Renell) মানচিত্রে রামু পর্যন্ত একটি সড়কের চিহ্ন দেখানো হয়েছে। যা আরকান সড়ক তথা চট্টগ্রাম-কক্সবাজার সড়ক হিসেবে চিহ্নিত। ইংরেজ ঐতিহাসিক ফিয়ারি এবং স্টুয়ার্ট-এর মতে, শাহ সুজা পাহাড়ি দূর্গম পথ অতিক্রম করে নাফ নদীর তীরে পৌছে বিশ্রাম নেন। উপরের আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, শাহ সুজা আরাকানে যাওয়ার সময় তাঁর বিশাল মোঘল

বাহিনী ঝোঁপ-জঙ্গল পরিষ্কার করে সড়ক সৃষ্টি করেন। সে সড়কটি বর্তমানে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার সড়ক নামে পরিচিত।

তথ্যসূত্র:

১। মোঘল সাম্রাজ্যের বিলুপ্ত অধ্যায় দোহাজারী- জামাল উদ্দিন।
২। আনজুমন-২০১০ চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদরাসা ২০০ বছর পূর্তি সংখ্যা।

চুনতি ঈদগাহ পাহাড় ও শাহ সুজা

ইতিহাস থেকে জানা যায়, ভারতবর্ষের অন্যতম সফল সম্রাট মোঘলে আজম জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ আকবরের প্রপৌত্র বিখ্যাত তাজমহল নির্মাতা সম্রাট শাহজাহান (১৬২৭-১৬৫৮ খ্রি:) ১৬৫৭ সালে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে তাঁর জ্যৈষ্ঠ পুত্র দারাশিকো সিংহাসনের দাবীদার হন। কিন্তু শাহজাহানের তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেব এ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি। তিনি ভাই শাহ সুজাকে প্ররোচিত করেন। শাহ সুজা ১৬৬০ সালে নিজেকে বাংলার স্বাধীন সুলতান ঘোষণা দেন। কিন্তু সুজার এ ঘোষণা সম্রাট শাহজাহান এবং দারাশিকো উভয়েই মেনে নিতে পারেননি। বাংলাকে মুক্ত করার জন্য তাঁরা রাজকীয় বাহিনী প্রেরণ করেন। এতে শাহ সুজা বিতাড়িত হয়ে ১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রামের দক্ষিণ পূর্বে আরাকান রাজার আশ্রয়প্রার্থী হন।

চুনতির অন্যতম পথিকৃৎ শাহ মাওলানা আবদুল হাকিম (রহ:) রচিত শজরাহমূলে জানা যায়, ১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দের ১২ মে শাহ সুজা নিজ পরিবারের সদস্যবর্গ, আলেম-ওলামাসহ ২০০ জন একান্ত অনুগামী এবং ৩০০০ সৈন্য-সামন্ত নিয়ে চট্টগ্রাম তথা ইসলামাবাদ হয়ে আরাকান অভিমুখে যাত্রা করেন। চট্টগ্রাম হতে সাঙ্গু ও ডলু নদের দক্ষিণ প্রান্তে এসে জাহাজ চলাচল উপযোগী পানিপথ সমাপ্ত হলে চুনতির বর্তমান কেন্দ্রীয় ঈদগাহ পাহাড় ও কবরস্থানের পাদদেশে নৌবহর নোঙ্গর করেন। তারপর তাঁরা পায়ে হেঁটে সামান্য দক্ষিণে গিয়ে সুপ্রস্থ পাহাড়ে অবস্থান নেন। শাহ সুজা চারিদিকে জঙ্গল ঘেরা প্রাকৃতিক মনোরম দৃশ্য ও নিরাপদ জায়গা দেখে সেখানে আস্তানা স্থাপনের নির্দেশ দেন। এ পাহাড়টির পাদদেশে বর্তমানে চুনতি ঈদগাহ ময়দান হিসেবে পরিচিত। চুনতি থেকে শাহ সুজার বাহিনী চলে যাওয়ার সময় চিহ্ন স্বরূপ একটি খুঁটি গেঁড়ে দিয়ে যান। সফর সঙ্গীর ২২ জন আলেম-ওলামার মধ্যে কয়েকজনকে সেখানে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপনের নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশে কয়েকজন চুনতিতে এবং কয়েকজন বশখালীর বাণীগ্রাম ও সাধনপুরে অবস্থান করেন।

চুনতির এ পাহাড়ে শাহ সুজার অবস্থানকে ঘিরে চুনতি নামকরণের এমনকি লোহাগাড়া নামকরণের সার্থকতা রয়েছে বলে ইতিহাসবিদরা মনে করেন। অন্যদিকে, ১৬০০ শতাব্দীর শুরুতে ইসলাম ধর্ম প্রচারের একটি দল চট্টগ্রামের লোহাগাড়ার প্রাকৃতিক লীলাভূমি চুনতি এলাকার প্রতি মুগ্ধ হয়ে বসতি স্থাপন করেন। জনশ্রুতি রয়েছে বশখালী থেকে ইব্রাহীম খন্দকার বর্তমান চুনতি জামে মসজিদের উত্তর পার্শ্বে ঈদগাহ পাহাড়ে বসতি স্থাপন করেন। মরহুম তাহের আহমদ খান রচিত "চুনতি গ্রামের আদি

কথা" ও ড. মুঈনুদ্দীন খান রচিত "ছিদ্দিকী বংশের একটি পারিবারিক ইতিহাস" গ্রন্থ থেকে জানা যায়, ভারতবর্ষের ইতিহাসে সুলতানী আমলে বাংলার রাজধানী গৌড়ের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা মাওলানা হাফেজ খান মসজিশ শাহ সুজার সফর সঙ্গী হয়ে প্রথমে চুনতিতে পরে বাঁশখালীর বাণীগ্রামে বসবাস শুরু করেন। ১৬৯০-১৭০০ সালের গোড়ার দিকের কোন এক সময়ে হযরত শাহ সুফী নছরত উল্লাহ খন্দকার গৌড় থেকে চুনতি গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। শাহ সুজার যাত্রা বিরতির মধ্য দিয়ে শুরু হয় চুনতি তথা লোহাগাড়া বসতি স্থাপনের ইতিহাস। (তথ্য সূত্রঃ আঞ্জুমন প্রকাশনা-২০১০)।

সুফী মিয়াজি পাড়া

সুফী মিয়াজী পাড়া লোহাগাড়ার আধুনগর ইউনিয়নে অবস্থিত। খ্রিষ্টীয় ১৭ শতকের শেষ ভাগে গৌড় থেকে চুনতি গ্রামে বসতি স্থাপন করেন হযরত শাহ সুফী নছরত উল্লাহ খন্দকার। পরবর্তীতে তাঁর দুই সন্তান শাহ শরীফ, শাহ আবু শরীফ এবং আরাকান থেকে আসা সুফী মুহাম্মদ মুকীম আল মুজাহিদ লোহাগাড়ায় ইসলাম প্রচারে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। লেখক ওহীদ উদ্দীন তাঁর সুফী মিয়াজি পরিবার ও ফারুকী বংশের ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন সুফী মুকীম আল মুজাহিদ আরাকান থেকে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বর্তমান আধুনগরে সুফী মিয়াজি পাড়ায় বসতি স্থাপন করেন। বায়তুশ শরফ চট্টগ্রামের বর্তমান পীর শাহ সুফী মাওলানা মুহাম্মদ কুতুব উদ্দীন সুফী মিয়াজি পরিবারের সন্তান। (তথ্য সূত্রঃ আঞ্জুমন প্রকাশনা-২০১০)।

ইউসুফ মৌলভী পাড়া

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ (রহ.) একজন বিখ্যাত আলেম ও উঁচুমাপের দরবেশ ছিলেন। তিনি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা.) এর বংশধর। তাঁর নামানুসারে এলাকার নামকরণ হয় ইউসুফ মৌলভী পাড়া। চুনতিতে অবস্থিত এ পাড়াটিতে চুনতি শাহ সাহেব কেবলা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইউসুফ মৌলভী বংশের একজন কৃতি সন্তান। (তথ্য সূত্রঃ ১। আঞ্জুমন প্রকাশনা-২০১০ ২। মোঘল সাম্রাজ্যের বিলুপ্ত অধ্যায় দোহাজারী- জামাল উদ্দীন)।

আখতারাবাদ

লোহাগাড়া উপজেলার একটি ইউনিয়নের নাম বড়হাতিয়া। এ ইউনিয়নের একটি গ্রামের নাম কুমিরাঘোনা। বর্তমান নাম আখতারাবাদ। ১৯৪০ সালের ঘটনাক্রম থেকে জানা যায়, ওই সময়ে এ গ্রামের ছিল না কোন গুরুত্ব। ধানী জমির তিন দিকে পাহাড়। বর্ষাকালে বৃষ্টির পানির সাথে বালি এসে ধান নষ্ট হতো। আর ধান পাকলে পাহাড় থেকে বানর এসে সব নষ্ট করে ফেলত। প্রতিনিয়ত এ গ্রামে অভাব-অনটন লেগেই থাকত। প্রকৃতির প্রতিকূলতায় এ গ্রামের লোকজন ছিল অবহেলিত। এলাকাবাসী দিবা-রাত্রি পরিশ্রম-কঠোর পরিশ্রম করেও ভাগ্যের কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারতো না। হঠাৎ একদিন আধ্যাত্মিক জগতের পথিকৃৎ কুতুবুল আলম শাহ সুফী মীর মুহাম্মদ

আখতার (রহ.) কুমিরাঘোনায় ভ্রমণ করেন। মনে হয় পূর্ব থেকে এলাকার মানুষের এসব দুঃখ-দূর্দশার কথা, অভাব-অনটনের কথা তাঁর কানে কানে কে যেন বলেছেন। অদৃশ্য শক্তির বদৌলতে এলাকার সবকিছু যেন তাঁর সামনে উপস্থিত। শাহ সুফী মীর মুহাম্মদ আখতার (রহ.) এর নামানুসারে এলাকাটির নামকরণ হয় আখতারাবাদ। (তথ্যসূত্রঃ হযরত আল্লামা শাহ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) এর জীবন ও আদর্শ-মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী ও জাকিয়া সুফিয়ান)।

বড় মাওলানা পাড়া

ইতিহাস থেকে জানা যায়, সুলতানী আমলের বাংলার রাজধানী গৌড়ের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা মাওলানা হাফেজ খান মজলিশ মোঘল রাজকুমার শাহ সুজার সফর সঙ্গী হিসেবে চুনতি হয়ে বাঁশখালীর বাণীগ্রামে বসবাস শুরু করেন। ১৬৯০-১৭০০ সালের গোড়ার দিকের কোন এক সময় হযরত শাহ সুফী নছরত উল্লাহ খন্দকার গৌড় থেকে বসতি স্থাপনের জন্য চুনতি গ্রামে চলে আসেন। তিনি বাঁশখালী থেকে খান ছিদ্দিকী বংশের ৩৭ তম পুরুষ হযরত শেখ আবদুল্লাহ খানকে চুনতি গ্রামে নিয়ে এসে পারিবারিক বন্ধন স্থাপন করেন। তাঁরা মসজিদ ও মকতব প্রতিষ্ঠা করেন। হযরত শেখ আবদুল্লাহ খানের সুযোগ্য পুত্র ক্বারী আবদুর রহমান পিতার লক্ষ্যকে আরো জোরদার করেন। তাঁর অন্যতম ছাত্র ছিলেন হযরত মাওলানা আবদুল হাকিম খান ছিদ্দিকী (রহ.)। ক্বারী আবদুর রহমানের সুযোগ্য সন্তান হযরত মাওলানা আবদুল হাকিম খান ছিদ্দিকী (রহ.) পিতার কাছে প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভ করেন। মাওলানা আবদুল হাকিম খান ছিদ্দিকী (রহ.) একজন যুগশ্রেষ্ঠ আলেম ও কামেল দরবেশ ছিলেন। তিনি বড় মাওলানা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর নামানুসারে চুনতির তাঁর বসত বাড়ির সংশ্লিষ্ট এলাকার নামকরণ হয় মাওলানা পাড়া। তিনি হযরত আবু বক্কর ছিদ্দিক (রা.) এর বংশধর। ছিদ্দিকী বংশ তাঁর বংশের নাম। বড় মাওলানা ছিদ্দিকী বংশের ৩৯ তম পুরুষ। তিনি গাজীয়ে বালাকোটের প্রাণ পুরুষ ছিলেন।

ডেপুটি পাড়া

হযরত মাওলানা আবদুল হাকিম খান ছিদ্দিকীর অনুজ হযরত মাওলানা নাছির উদ্দীন খান ব্রিটিশ আমলে ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। তাঁর নামানুসারে পাড়াটির নামকরণ হয় ডেপুটি পাড়া। তাঁর বংশধরগণ ডেপুটি বংশধর নামে পরিচিত। ১৮৩১ সাল থেকে ১৮৩৮ সাল পর্যন্ত ইংলিশ হার্ভী চট্টগ্রামের কালেক্টর ছিলেন। ঐ সময়ে আনোয়ারা থানায় চরম অসন্তোষ দেখা দেয়। হাঁচি ও নিশি নামের দুই ভাই হার্ভীকে প্রহার করলে হার্ভী পুলিশ নিয়ে নাছির উদ্দীন খান ডেপুটির কাছে আসেন। নাছির উদ্দিন খান সুস্থ মস্তিষ্কে ঘটনার সমাধান দেন। এই সময়ে নাছির উদ্দিন খানকে আর্শীবাদ করেন যে, তার সাত পুরুষ যেন ডেপুটি হয়। নাছির উদ্দিন খানের এক ছেলে ও দুই নাতি ডেপুটি কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। এ পরিবারের অনেকে সরকারি-বেসরকারি চাকুরীতে কর্মরত থেকে সুনাম অর্জন করেন।

মুন্সেফ পাড়া

চুনতির একটি বংশের নাম সিকদার বংশ। হযরত শুকুর আলী মুন্সেফ (রহ.) সিকদার বংশের। অষ্টাদশ শতাব্দীতে তিনি পশ্চিম বঙ্গে এবং এ উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে মুন্সেফের দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি আধ্যাত্মিক জগতে চলে আসেন। তাঁর নামানুসারে পাড়ার নামকরণ হয় মুন্সেফ পাড়া। চুনতি ও পটিয়াসহ অনেক স্থানে তাঁর নামে বাজার রয়েছে, যা মুন্সেফ বাজার নামে পরিচিত।

শুকুর আলী মুন্সেফ ও মুন্সেফ বাজার

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে চুনতিতে তিনজন অসাধারণ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা হলেন মাওলানা আবদুল হাকিম (রহ.) ও তাঁর ভাই নাসির উদ্দীন ডেপুটি এবং শুকুর আলী মুন্সেফ।

শুকুর আলী মুন্সেফ ছিলেন কিংবদন্তী পুরুষ। তিনি পশ্চিম বঙ্গে এবং এ উপমহাদেশের বেশ কয়েকটি স্থানে মুন্সেফের দায়িত্ব পালন করেন। চুনতি সিকদার পাড়ার আমানত আলী সিকদারের পুত্র গণি সিকদার। গণি সিকদারের পুত্র শুকুর আলী মুন্সেফ। সিকদারেরা মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলে জমির খাজনা আদায় করতেন। তিনি (শুকুর আলী মুন্সেফ) ন্যায় বিচারক হিসেবে খ্যাত ছিলেন তা নয়, একজন সুফী দরবেশ হিসেবে তাঁর খ্যাতি রয়েছে। শুধু চুনতি বা পটিয়া নয় অনেক জায়গায় তাঁর নামে বাজার রয়েছে, যা মুন্সেফ বাজার নামে পরিচিত। চট্টগ্রাম শহরের রুমঘাটায় তিনি বাড়ি তৈরি করেন। বাড়ির সামনের রাস্তার নাম তাঁর নামানুসারে শুকুর আলী মুন্সেফ লেন হয়েছে। শেষ জীবনে তিনি মুন্সেফ পদ ছেড়ে দিয়ে হজ্বে চলে যান। পানসি নৌকায় চড়ে চট্টগ্রাম শহর থেকে কর্ণফুলী ও শঙ্খ নদী পাড়ি দিয়ে ২/৩ দিন পরে আধুনগর পর্যন্ত আসতেন। তাঁরপর পালকি চড়ে চুনতিতে যেতেন। চুনতিতে তিনি নতুন একটি বাড়ি নির্মাণ করেন। তাঁর নামানুসারে চুনতিতে পাড়ার নামকরণ হয় মুন্সেফ পাড়া। চুনতিতে তাঁর গড়া বাড়িতে তিনি ইন্তেকাল করেন। চুনতি জুমা মসজিদের সামনে তাঁর কবর রয়েছে। তাঁর বংশধরদের মধ্যে সিএসপি অফিসার, পিএইচডি ডিগ্রীধারী সরকারি-বেসরকারি অনেক উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি রয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১। শুকুর আলী মুন্সেফ পরিবার-আহমদ ফরিদ

২। প্রচেয়- দীপিত প্রকাশনা-২০০২)।

কাজীর ডেবা ও জান মোহাম্মদ সিকদার পাড়া

হযরত খলিফা আবদুল লতিফ ছিদ্দিকী (রহ.) ১৪০০ সালে মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হযরত খলিফা আবু বক্কর (রা.) এর বংশধর এবং ছিদ্দিকী বংশের প্রথম পুরুষ। তিনি আরব সাম্রাজ্যের হেজাজ প্রদেশের গভর্ণর ছিলেন। সেকালে আরব সাম্রাজ্য এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা এমনকি চীন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি আরব দেশ

থেকে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এদেশে আসেন। সেকালে আরব থেকে বহু বুজুর্গ ও সাধক ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এদেশে আসেন। পায়ে হেঁটে কিংবা পালের নৌকায় তাঁরা এদেশে আসেন।

চুনতি হাজী রাস্তার সামান্য উত্তর পাশে কাজীর ডেবার পূর্ব পাশে ঐতিহাসিক রৌপ্যমুড়ার বট বৃক্ষের নিচে হাজীগণ সমাবেত হতেন। পালের নৌকাযোগে আরব দেশে পাড়ি দিতেন। রৌপ্যমুড়ার পুরাতন তেঁতুল গাছের নিচে এ মহাপুরুষের কবর আছে বলে ধারণা করা হয়। প্রতি বছর এখানে দুই পবিত্র ঈদের নামাজ আদায় হয় এবং তাঁর কবর জিয়ারত হয়। এ বংশের দ্বিতীয় পুরুষ হযরত খলিফা তনজা আহমদ ছিদ্দিকী (রহ.) ধর্ম পরায়ণ ও জমিদার ছিলেন। তাঁর স্মরণে তৎকালে পাড়ার নামকরণ হয় তনজার পাড়া। পঞ্চম পুরুষ জান মোহাম্মদ সিকদার তৎকালে ১৩টি তালুকের জমিদার ছিলেন। তখন দেশে ইংরেজ শাসন ছিল। তাঁর সাহসী ও বুদ্ধিদীপ্ত প্রশাসনের জন্য ইংরেজ সরকার তাঁকে সিকদার উপাধিতে ভূষিত করেন। তখন পাড়ার নাম পরিবর্তন হয়ে জান মোহাম্মদ সিকদার পাড়া নামকরণ হয়।

(তথ্যসূত্রঃ আলহাজ্ব ডা. মোঃ এনায়েত আলী ছিদ্দিকী-এম.এ, বীর উত্তম)।

মোহাম্মদ খান নায়েবে উজির

শাহজাদা শাহ্ সুজার মৃত্যুর পর সম্রাট আওরঙ্গজেব মীর জুমলাকে (১৬৬০-১৬৬৩) ১৬৬৩ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার সুবেদার নিযুক্ত করে। মীর জুমলার মৃত্যুর পর শায়েস্তা খান (১৬৬৪-৭৮, ১৬৮০-৮৮ খ্রি) বাংলার সুবেদার হন। মির্জা আবু তালেব ওরফে নবাব শায়েস্তা খান সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসন আমলে দু'বার বাংলার সুবেদারের দায়িত্ব পালন করেন। শায়েস্তা খান সম্রাট শাহজাহানের প্রধানমন্ত্রী আসফ খানের পুত্র এবং মমতাজ বেগমের ভাই। শায়েস্তা খানের দীর্ঘ ২২ বছর শাসনকালে বাংলার উন্নতি হয়। তিনি মগ ও ফিরিঙ্গি দস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত চট্টগ্রাম জয় করেন। চট্টগ্রাম জয় করার নেতৃত্ব দেন তাঁর পুত্র বুজুর্গ উমেদ খান। ধর্মভিরু শায়েস্তা খান সুবা-ই-বাংলার শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখেন এবং ঐক্য ও নিরাপত্তা কায়েম করেন।

শায়েস্তা খান বাংলার একজন সুশাসক ছিলেন। বাংলার প্রশাসনে তাঁর ব্যাপক সুনাম রয়েছে। তিনি ছিলেন শান্তি-সমৃদ্ধির অগ্রদূত ও স্থাপত্য কীর্তির পৃষ্ঠপোষক। ঢাকার বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর নির্মিত অনেক স্থাপনা এখনো কীর্তির পরিচয় বহন করে। তাঁরই নায়েবে উজির ছিলেন মোহাম্মদ খান। মোহাম্মদ খানের পূর্ব পুরুষ হযরত সৈয়দ আবদুর রহমান (রহ.)। তিনি পবিত্র আরব ভূমি থেকে বাংলার গৌড়ে এসে বসতি স্থাপন করেন। বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খান কর্তৃক চট্টগ্রাম বিজয়ের পর হযরত ছৈয়দ আবদুর রহমান (রহ.) এর অধঃস্তন পুরুষ মোহাম্মদ খান নায়েবে উজির গৌড় থেকে চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার মল্লিক ছোয়াং এলাকায় এসে বসতি স্থাপন করেন। গবেষক আহমদুল ইসলাম চৌধুরী তাঁর 'মুহাম্মদ খান নায়েবে উজির ও তাঁর বংশ' প্রবন্ধে (যেটি ১৫ ও ২২ জুন ২০১৫ইং তারিখে দৈনিক পূর্বকোণে প্রকাশিত)

উল্লেখ করেছেন গৌড়ে বন্যার পর বসবাসে প্রতিকুল অবস্থা বিরাজ করায় মোহাম্মদ খান স্ব-পরিবারে চট্টগ্রামে চলে আসেন। চট্টগ্রামের একাধিক স্থান ঘুরে মল্লিক ছোয়াং-এ এসে বসতি স্থাপন করেন। তিনি ৩২০ দ্রোণ ভূ-সম্পত্তির মালিক হন। জানা যায়, হযরত ছৈয়দ আবদুর রহমান ছিদ্দিকী (রহ.)'র অধঃস্তন পুরুষ হরযত ছৈয়দ আবদুল করিম ছিদ্দিকী (রহ.)। তাঁরই অধঃস্তন পুরুষ মোহাম্মদ খান নায়েবে উজির।

মোহাম্মদ খান নায়েবে উজিরের ৬ ছেলে। এক ছেলের নাম আবদুর রাজ্জাক। আবদুর রাজ্জাকের ৫ ছেলে। এক ছেলের নাম মোহাম্মদ রফিক। মোহাম্মদ রফিকের ৬ ছেলে। এক ছেলে নাম মোহাম্মদ ত্বকী। মোহাম্মদ ত্বকীর ২ ছেলে। গোলাম হোসাইন চৌধুরী ও মোহাম্মদ হোসাইন চৌধুরী। ব্রিটিশ আমলের মাঝামাঝি সময়ে মোহাম্মদ হোসাইন চৌধুরী মল্লিক ছোয়াং থেকে গিয়ে বাঁশখালীর বৈলছড়ী গ্রামে বসতি স্থাপন করেন।

তাঁর দুই ছেলে মোহাম্মদ আলী চৌধুরী ও জাফর আলী চৌধুরী। উচ্চ শিক্ষিত ও ফার্সি ভাষার উকিল ছিলেন মোহাম্মদ আলী চৌধুরী। তিনি বাড়ীর সামনে মসজিদ ও কবরস্থান প্রতিষ্ঠা করেন। উকিল মোহাম্মদ আলী চৌধুরীর অপর ভাই জাফর আলী চৌধুরীর এক পুত্র মোহাম্মদ আকমল চৌধুরী। তাঁরই একমাত্র পুত্র মোজহেরুন্নবী চৌধুরী। তাঁর তিন ছেলে ও দুই মেয়ে। তাঁরা হলেন, খান বাহাদুর বদি আহমদ চৌধুরী, খান সাহেব রফিক আহমদ চৌধুরী, কাজী আজিজ আহমদ চৌধুরী, আছিয়া খাতুন চৌধুরী ও আবেদা খাতুন চৌধুরী।

মোহাম্মদ খান নায়েবে উজির চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার আমিরাবাদের মল্লিক ছোবহান এলাকার বসতি স্থাপন করেন। আমিরাবাদ বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ গ্রাম। এ গ্রামের মাঝখানে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক চলে গেছে। এ সড়কে ব্রিটিশ আমল থেকে আমিরাবাদ-বটতলী নামের একটি জংশন রয়েছে। ১৯২২ সালে ব্রিটিশরা গ্রাম পঞ্চায়েতের বদলে ইউনিয়ন বোর্ড চালু করে। পাকিস্তান আমলে আইয়ুব খান সরকার ইউনিয়ন বোর্ড পরিবর্তন করে ইউনিয়ন পরিষদ করে। ইউনিয়ন প্রধানকে প্রেসিডেন্ট স্থলে চেয়ারম্যান করা হয়। মল্লিক ছোবহান গ্রাম,হাজারবিঘা ও সুখছড়ী গ্রাম নিয়ে আমিরাবাদ ইউনিয়ন। মল্লিক ছোবহান নামের শুদ্ধতা নিয়ে নানান জটিলতা দেখা যায়। ব্রিটিশ আমল থেকে আজ পর্যন্ত এ গ্রামকে সরকারিভাবে লেখা হচ্ছে মল্লিক ছোয়াং। এলাকাবাসীরাও বলেন মল্লিক ছোয়াং। আরাকানী মগদের প্রভাবে এমন নামকরণ হয়। এককালে এ গ্রামের নাম মুলুকে ছোবহান ছিল বলে জানা যায়।

(তথ্যসূত্রঃ গবেষক আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী, খান বাহাদুর বাড়ী, বৈলছড়ী, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম)

সপ্তম অধ্যায়

উপজেলার অন্যান্য প্রসঙ্গ

১৯৮৫ সালে লোহাগাড়া উপজেলা পরিষদ শুভ উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন তৎকালীন পরিকল্পনা মন্ত্রী ব্যারিষ্টার সোলতান আহমদ চৌধুরী। এ উপজেলা পরিষদের জন্য জমি দান করেছেন এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। তাঁরা হলেন- আলহাজ্ব মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী, ফয়েজ আহমদ, মমতাজুল হক চৌধুরী, শফিয়র রহমান, আহমদ কবির, এনামুল হক চৌধুরী, নজির আহমদ ও সৈয়দ আহমদ।

২০১০-২০১১ সালের ভূমি জরিপের তথ্যমতে, লোহাগাড়া উপজেলায় মোট ভূমির পরিমাণ ২,৫৮৯৩ হেক্টর। ইউনিয়ন ভিত্তিক আয়তনে বড়হাতিয়ায় ৩০৫৫ হেক্টর, আমিরাবাদে ১৭৬৫ হেক্টর, পদুয়ায় ২৬৮৮ হেক্টর, চরম্বায় ৩২৪৯ হেক্টর, কলাউজানে ১৬১৭ হেক্টর, সদর ইউনিয়ন লোহাগাড়ায় ১১২৩ হেক্টর।

ইউনিয়ন সমূহের মধ্যে কলাউজান ও আমিরাবাদ কৃষিজোন হিসেবে পরিচিত। আধুনগর, বড়হাতিয়া, চরম্বা, চুনতি, পদুয়া ও পুটিবিলা মিশ্রিত গ্রামীন পাহাড়ি এলাকা। সদর ইউনিয়ন লোহাগাড়া উপজেলার শহর ও ব্যবসায়িক কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। দক্ষিণ চট্টগ্রামের মধ্যে এত বড় ব্যবসায়িক কেন্দ্র আরেকটা নেই। ক্রেতারা এখানে এসে পাইকারী ও খুচরা মালামাল ক্রয় করে নিয়ে যায়। উপজেলার মাঝখান দিয়ে ব্যবসায়িক সড়ক আরকান তথা চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক চলে গেছে।

লোহাগাড়ার অবস্থান ও আয়তন

লোহাগাড়া চট্টগ্রাম জেলার একটি উপজেলা। এই উপজেলা চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণ পূর্বাংশে অবস্থিত। এ উপজেলার উত্তরে সাতকানিয়া ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা, পূর্বে লামা উপজেলা, দক্ষিণে বান্দরবান পার্বত্য জেলা ও লামা উপজেলা, চকরিয়া উপজেলা এবং পশ্চিমে বাঁশখালী ও সাতকানিয়া উপজেলা। এ উপজেলাটি প্রায় ২১°৫৪´ ও ২২°৫ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯২°০০ ও ৯২°০১৩ পূর্ব দ্রঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। চট্টগ্রাম জেলা শহর থেকে লোহাগাড়া উপজেলা সদরের দূরত্ব প্রায় ৬৬ কিলোমিটার। এ উপজেলা মোট আয়তন ২৫৮.৮৭ বর্গ কিলোমিটার। যার মধ্যে খাল প্রায় ৩.১ বর্গকিলোমিটার। ৯টি ইউনিয়ন নিয়ে উপজেলা গঠিত। ইউনিয়নগুলো হচ্ছে- ১নং ইউনিয়ন বড়হাতিয়া, ২নং ইউনিয়ন আমিরাবাদ, ৩নং ইউনিয়ন পদুয়া, ৪নং ইউনিয়ন চরম্বা, ৫নং ইউনিয়ন কলাউজান, ৬নং ইউনিয়ন লোহাগাড়া, ৭নং ইউনিয়ন পুটিবিলা, ৮নং ইউনিয়ন চুনতি ও ৯নং ইউনিয়ন আধুনগর। উপজেলা সড়কের সংখ্যা ৫টি। ইউনিয়ন সড়কের সংখ্যা ১৫টি, গ্রামীণ সড়কের সংখ্যা (এ

ক্যাটাগরীর) ৫৫টি ও বি ক্যাটাগরীর ৩শ ৪টি। উপজেলা সড়কের দৈর্ঘ্য ৫১.৫৬ কিলোমিটার। যার মধ্যে মাটির রাস্তা ৯.২৪ কিলোমিটার। ইউনিয়ন সড়কের দৈর্ঘ্য ৯২.৮৪ কিলোমিটার। যার মধ্যে মাটির রাস্তা ৩৩.১৯ কিলোমিটার। গ্রামীণ সড়কের (এ ক্যাটাগরীর) দৈর্ঘ্য ১৭১.২৫ কিলোমিটার। যার মধ্যে মাটির রাস্তা ১০০.৭৩ কিলোমিটার এবং গ্রামীণ (বি ক্যাটাগরীর) দৈর্ঘ্য ৮০৪.৩৬ কিলোমিটার। যার মধ্যে মাটির রাস্তা ৭৪৫.৯০ কিলোমিটার।

তথ্য সূত্র:

১। চট্টগ্রাম পরিক্রমা- আহমদ মমতাজ-২০১২ইং।
২। উপজেলা প্রকৌশল অধিদপ্তর, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
৩। Land Zoning Report, Lohagara Upazila-2011.

প্রশাসনিক কাঠামো

লোহাগাড়া উপজেলার ৯টি ইউনিয়ন, ৪৩টি গ্রাম ও ৪০টি মৌজা রয়েছে।

যাতায়াত ব্যবস্থা

এ উপজেলার যাতায়াত মাধ্যম হল সড়কপথ। উপজেলা সদরের সাথে জেলা ও বিভাগীয় শহর চট্টগ্রাম এবং পার্শ্ববর্তী পর্যটন জেলা কক্সবাজারের সাথে সড়ক যোগাযোগ রয়েছে। উপজেলা সদরের সাথে ইউনিয়নের এবং ইউনিয়নের সাথে বিভিন্ন এলাকায় সড়ক যোগাযোগ রয়েছে। যোগাযোগ এর মাধ্যম বাস, জীপ, টেক্সি, রিক্সা ইত্যাদি।

এ উপজেলার উত্তর পূর্বে টংকাবতী ও হাঙ্গরখাল এবং উত্তর-দক্ষিণে ডলু খাল প্রবাহিত হয়েছে। এছাড়াও আরো অসংখ্য ছড়া ও খাল রয়েছে। খাল-ছড়াগুলো শুষ্ক মৌসুমে শুকিয়ে যায় ও বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ি ঢলের পানিতে প্লাবিত হয়।

জলবায়ু

আবহাওয়া অফিসের তথ্যমতে, এ অঞ্চল ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ুর অন্তর্গত। ষড় ঋতুর মধ্যে প্রধানত: ৩টি মৌসুম পরিলক্ষিত হয়। যেমন: বর্ষা, শীত ও গ্রীষ্ম। ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে গড় তাপমাত্রা প্রায় ২১.২ ডিগ্রী সেলসিয়াস, মে সামে ৪২.২ ডিগ্রী সেলসিয়াস পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয়। এ উপজেলায় কোন আবহাওয়া অফিস নেই।

ভূ-প্রকৃতি

লোহাগাড়ার উপজেলাকে প্রধানত দুইটি ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা: (ক) পাহাড়ি অঞ্চল (খ) পাহাড়তলীয় পলল ভূমি।

(ক) পাহাড়ি অঞ্চল: পাহাড়ি অঞ্চলের মোট আয়তন ১২,০৩৬ হেক্টর, যা উপজেলার মোট এলাকার শতকরা প্রায় ৪৬.১ ভাগ। উপজেলার পূর্ব-পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলে বিস্তীর্ণ পাহাড় অঞ্চল নিয়ে গঠিত। উপজেলার পাহাড়গুলো উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে লম্বা-লম্বিভাবে বিস্তৃত এবং পাললিক শিলা দ্বারা গঠিত। উচ্চতার ভিত্তিতে পাহাড়গুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

(১) মাঝারি উঁচু পাহাড়: মাঝারি উঁচু পাহাড়ের আয়তন ২,৫০৭ হেক্টর। উপজেলার পশ্চিমাংশে বিস্তৃত ১৫০-৩০০ মিটার উচ্চতার এসব পাহাড়খানা ঢাল সম্পন্ন এবং মোচাকৃতি চূড়া বিশিষ্ট।

(২) নিচু পাহাড়: এ পাহাড়ের মোট আয়তন, ৯,৫২৯ হেক্টর। ১৫০ মিটারের কম উচ্চতা সম্পন্ন এসব পাহাড় উপজেলার দক্ষিণ ও পূর্বাংশে বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে গঠিত। এ পাহাড়গুলো সাধারণত মৃদু, ঢালু, অধিক খাড়া, প্রশস্ত ও প্রায় সমতল চূড়া বিশিষ্ট।

(খ) পাহাড়তলীয় পলল ভূমি: পাহাড়তলীর পলল ভূমির আয়তন ১০,৮০০ হেক্টর। যা উপজেলায় মোট আয়তনের শতকরা ৪১.৪ ভাগ। এ পলল ভূমি উপজেলার উত্তর ও মধ্যমাংশে বিস্তৃত। পাহাড়তলীয় পললভূমি প্রায় সমতল। প্রতি বছর বর্ষাকালে অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে এসব ভূমি প্লাবিত হয়।

তথ্যসূত্র: ভূমি ও মৃত্রিকা সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

সেচ ব্যবস্থা

উপজেলায় প্রায় ৪৫৫০ হেক্টর জমি সেচের মাধ্যমে আবাদ করা হয়। সেচের মাধ্যমগুলো হচ্ছে গভীর-অগভীর নলকূপ, রাবার ড্যাম ও অন্যান্য স্থায়ী পদ্ধতি। শুষ্ক মৌসুমে খালে পানির প্রবাহ না থাকায় এ উপজেলায় সেচ জমি সমস্যায় পড়ে। টংকবতী খালে রাবার ড্যামের পানি আটকিয়ে চরম্বা-কলাউজান এলাকায় চাষাবাদ করা হয়।

অষ্টম অধ্যায়

ইউনিয়নের মৌজার নাম আয়তন ও অন্যান্য

Chunati.com
Pioneer in village based website

বস্তুত ইতিহাস আর কিছুই নহে, একটি স্বীকৃত উপকথা।

- সম্রাট নেপোলিয়ন

ইউনিয়ন ভিত্তিক মৌজার নাম ও আয়তন

ইউনিয়নের নাম	সংখ্যা	মৌজার নাম	আয়তন (হেক্টরে)
বড়হাতিয়া	০৪টি	জঙ্গল বড়াতিয়া	৫৪৮ হেক্টর
		চাকফিরানী	৯৩৩ হেক্টর
		বড়হাতিয়া	১৩২৪ হেক্টর
		আমতলী	২৫০ হেক্টর
আমিরাবাদ	০৪টি	আমিরাবাদ	৯৩০ হেক্টর
		হাজারবিঘা	৮৯ হেক্টর
		মল্লিক ছোয়াং	২৫৩ হেক্টর
		সুখছড়ী	৪৯৩ হেক্টর
পদুয়া	০৪টি	পদুয়া	১৩০৮ হেক্টর
		জঙ্গল পদুয়া	৬৮৪ হেক্টর
		ধলিবিলা	৫২৩ হেক্টর
		আঁধার মানিক	৩২৬ হেক্টর
চরম্বা	০৬টি	তেলিবিলা	১০৭ হেক্টর
		চরম্বা	১৪১২ হেক্টর
		বিবিবিলা	২৫৬ হেক্টর
		মাইজবিলা	১০৩৯ হেক্টর
		নোয়ারবিলা	১৩০ হেক্টর
		রাজঘাটা	৩০১ হেক্টর
কলাউজান	০৪টি	উত্তর কলাউজান	৪৭৪ হেক্টর
		আদার চর	১৯৩ হেক্টর
		পশ্চিম কলাউজান	৪৭৪ হেক্টর
		পূর্ব কলাউজান	৪৮৮ হেক্টর
পুটিবিলা	০৪টি	পুটিবিলা	৯৭৭ হেক্টর
		পহর চান্দা	২০৬২ হেক্টর
		গৌড়স্থান	৫৬৪ হেক্টর
		সরইয়া	৮৫২ হেক্টর
লোহাগাড়া	০২টি	লোহাগাড়া	৯৭৭ হেক্টর
		দক্ষিণ সুখছড়ী	১৪৬ হেক্টর

চুনতি	০৭টি	জঙ্গল চুনতি	৭৩০ হেক্টর
		চুনতি	২৪৭৮ হেক্টর
		সাতগড়	৭২৩ হেক্টর
		চান্দা	৪৪৮ হেক্টর
		নারিশ্চা	৪১৫ হেক্টর
		পানত্রিশা	২২৭ হেক্টর
		ফারেঙ্গা	১১০১ হেক্টর
আধুনগর	০৫টি	জঙ্গল রশিদের ঘোনা	৬২৭ হেক্টর
		কুলপাগলী	৭৫ হেক্টর
		রশিদের ঘোনা	১৯৯ হেক্টর
		আধুনগর	৬৯৪ হেক্টর
		হরিণা	২৬১ হেক্টর

সূত্রঃ বিবিএস-২০১১

জনসংখ্যা ও ভোটার

২০১২ সালের পরিসংখ্যান মতে, উপজেলার মোট জনসংখ্যা ২,৭৯,৯১৩ জন। যার মধ্যে পুরুষ ১,৩৫,৭১৭ জন এবং মহিলা ১,৪৪,১৯৬ জন। উপজেলার প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১০৮১ জন লোক বাস করে। ইউনিয়ন ভিত্তিক জনসংখ্যা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

ইউনিয়নের নাম	পুরুষ	মহিলা	মোট
বড়হাতিয়া	১৫৬৪৮ জন	১৭৩০৭ জন	৩২৯৫৫ জন
আমিরাবাদ	১৮০১৮ জন	১৯২৮৫ জন	৩৭৩০৩ জন
পদুয়া	১৯৮১৮ জন	২১০২৪ জন	৪০৮৪২ জন
চরম্বা	১২৪৯৬ জন	১২৯৭৪ জন	২৫৪৭০ জন
কলাউজান	১৩৩৩৪ জন	১৫০১৩ জন	২৮৩৪৭ জন
লোহাগাড়া	১৭৭৫০ জন	১৭২৬০ জন	৩৫০১০ জন
পুটিবিলা	১২৪৪৪ জন	১৩৩৩৯ জন	২৫৭৮৩ জন
চুনতি	১৬৫১৩ জন	১৬৯০২ জন	৩৩৪১৫ জন
আধুনগর	৯৬৯৬ জন	১১০৯২ জন	২০৭৮৮ জন

অন্যদিকে ২০১৪ সালের হিসাব অনুযায়ী উপজেলায় মোট ভোটার ১,৭৫,২০৯ জন। যার মধ্যে পুরুষ ৮৯,৮৭০ জন, মহিলা ৮৫,৩৩৯ জন। ইউনিয়নভিত্তিক ভোটার নিম্নে উল্লেখ করা হল।

ইউনিয়নের নাম	পুরুষ	মহিলা	মোট
বড়হাতিয়া	১১৪৭৫ জন	১০৭৪২ জন	২২২১৭ জন
আমিরাবাদ	১২৮৯৩ জন	১২২৩৯ জন	২৫১৩২ জন
পদুয়া	১২৬৬৭ জন	১১৮১২ জন	২৪৪৭৯ জন
চরম্বা	৮০৪১ জন	৭৭৮৩ জন	১৫৮২৪ জন
কলাউজান	৯৯৮৪ জন	৯৭৭৭ জন	১৯৭৬১ জন
লোহাগাড়া	১০৪১০ জন	৯৫৩১ জন	১৯৯৪১ জন
পুটিবিলা	৭৩০৩ জন	৭৩২১ জন	১৪৬২৪ জন
চুনতি	১০০১৪ জন	৯৪০৭ জন	১৯৪২১ জন
আধুনগর	৭০৮৩ জন	৬৭২৭ জন	১৩৮১০ জন

তবে ফি বছর জনসংখ্যা ও ভোটারের সংখ্যা বাড়ছে। উক্ত হিসাব অনুযায়ী পদুয়া ইউনিয়নে জনসংখ্যা বেশি ও আধুনগর ইউনিয়নে জনসংখ্যা কম।

লোহাগাড়ার আদি পরিবার

চট্টগ্রামের এই লোহাগাড়া শুধু কোন উপজেলার কিংবা স্থানের নাম নয়। এটি শিক্ষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, সভ্যতা, আধ্যাত্মিকতা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময় একটি উপজেলার নাম। লোহাগাড়ার অবস্থান চট্টগ্রাম জেলা সদর থেকে দক্ষিণে ৬০ কিলোমিটার দূরত্বে, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার মধ্যখানে।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, সম্রাট আওরঙ্গজেবের বড় ভাই শাহ সুজা আক্রান্ত হয়ে আরকান সড়ক (চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক) পথে আরাকানে পালিয়ে যায়। ওই সময়ে আরকান সড়ক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশে বসবাসকারী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী আদি জনগোষ্ঠী। পাল এবং চন্দ্র বংশীয় রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে। তখন অবিভক্ত ভারত তথা বাংলাদেশে বিশেষ করে চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে অসংখ্য চৈত্য নির্মিত হয়েছিল। খ্রিষ্টীয় পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী হতে পাল যুগ এবং আরাকান রাজ শাসন পর্যন্ত দেশে সর্বত্র বৌদ্ধ কৃষ্টি, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব পড়ে। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ তাঁর "ইসলামাবাদ" গ্রন্থ এবং বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ গবেষক আলীদীন আলী তাঁর "চট্টগ্রাম: প্রথম মানব ভূমি" গ্রন্থে বৌদ্ধ জাতিকে এ দেশের আদি অধিবাসী উল্লেখ করেছেন। বিশিষ্ট বৌদ্ধ পন্ডিত

ধর্মাবির মহাস্থবিরের মতে, চট্টগ্রামের বাঙালি বৌদ্ধদের গোষ্ঠী আদি পুরুষ। ভারত তত্ত্ববিদ ড. বেণী মাধব বড়ুয়া ও বিশিষ্ট সাবেক প্রফেসর ড. দীপক বড়ুয়া'র মতে, আর্যদের আগমনের পর কিছু আর্য জনগোষ্ঠী এদেশে আসেন। বড়ুয়া সেই আর্যদের বংশোদ্ভুত। তাদের মতে বৃজি বা বজ্জি জাতি হতে বড়ুয়া জাতির উৎপত্তি হয়েছে। ড. মুহাম্মদ এনামুল হকের মতে মগ শব্দটি মগধ শব্দের বিকৃত রূপ। ফলে বড়ুয়ারা আরাকানীদের মগ নামে পরিচিত। বাংলার ইতিহাসে বৌদ্ধ শাসনামলের অনেক নাম-পদবী হিন্দু-মুসলিমদের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে গেছে। যেমন মুৎসুদ্দী, সিংহ, তালুকদার, চৌধুরী, সিকদার, নাজির, রাজা, বাহাদুর, মহাজন ও পাল ইত্যাদি। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতক থেকে চট্টগ্রামের বৌদ্ধ গ্রামগুলো তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। শঙ্খ নদীর দক্ষিণ পাড়ের গ্রামগুলো দক্ষিণকূল। দক্ষিণ কূলের মধ্যে রয়েছে লোহাগাড়ার মছদিয়া, আধুনগর, বড়হাতিয়া, প্রভৃতি গ্রাম। ঐতিহাসিকদের মতে, মোঘল আমলে লোহাগাড়ায় বসতি স্থাপন শুরু হয়। অবিভক্ত সাতকানিয়ায় লোহাগাড়া ও চুনতি নামে দু'টি গ্রাম ছিল। যার ফলে লোহাগাড়া ও চুনতিতে আগে বসতি স্থাপন হয়েছে বলে ঐতিহাসিকবিদ ও গবেষকরা মনে করেন। লোহাগাড়ার আদি পরিবার সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া না গেলেও বিভিন্ন লেখক ও গবেষকদের লেখায় এখানকার কিছু আদি পরিবারের কথা ওঠে এসেছে। ইতিহাসবিদ ও গবেষকদের মতে লোহাগাড়ার আদি বাসিন্দা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মগরা। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ মে শাহ সুজা আরাকানে যাত্রার সময় সফর সঙ্গী ২২ জন আলেমদের কয়েকজনকে চুনতিতে এবং কয়েকজনকে বাঁশখালীর বাণী গ্রাম ও সাধনপুরে বসতি স্থাপনের নির্দেশ দেন। ড. মুঈনুদ্দিন আহমদ খানের মতে, সোলতানী আমলে বাংলার রাজধানী ছিল গৌড়। গৌড়ের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা সদরুল মহিম মোহাম্মদ ইউসুফ খানের উত্তরসুরী মাওলানা হাফেজ খান মজলিশ শাহ সুজার সফর সঙ্গী হিসেবে চুনতি হয়ে বাঁশখালীর বাণী গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। ১৬৯০-১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকের কোন এক সময়ে গৌড় থেকে হযরত শাহ সুফি নছরুতুল্লাহ খন্দকার বসতি স্থাপনের জন্য চুনতিতে আসেন।

মিয়াজী পরিবার চুনতির প্রাচীনতম পরিবার। এ পরিবারের আদি পুরুষ ছিলেন সুফী নছরুতুল্লাহ খন্দকার। খ্রীষ্টীয় সতেরো শতকের শেষভাগে তিনি গৌড় থেকে এসে চট্টগ্রামের লোহাগাড়ার চুনতি গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তখনকার সময়ে তাঁরা শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রগামী ছিলেন। সুফী নছরুতুল্লাহ খন্দকার "বড় মিয়াজী" নামে এবং তাঁর পুত্র হযরত শাহ শরিফ মিয়াজী ছোট মিয়াজী নামে পরিচিত ছিলেন। মিয়াজীরা এলাকায় মসজিদ-মক্তব প্রতিষ্ঠা করে এলাকাবাসীকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন। সম্রাট শাহজানের ২য় পুত্র শাহ সুজা চট্টগ্রাম হয়ে আরাকানে যাচ্ছিলেন। শাহজাহানের রাজ দরবারের অন্যতম শিক্ষক হযরত ইব্রাহিম খন্দকার শাহ সুজাকে অনুসরণ করে রামু পর্যন্ত যায়। সেখান থেকে ফিরে বাঁশখালীর খানখানাবাদে যায়। বাঁশখালীতে কিছুদিন অবস্থানের পর চুনতি এসে বসতি স্থাপন করে। মধ্যযুগের কবি

মোহাম্মদ নওয়াজিশ "গোলে বকাওয়ালী" নামক তাঁর কাব্য গ্রন্থে শঙ্খ নদীর দক্ষিণ অঞ্চলে কুলিন বংশের পরিচিতি তুলে ধরেছেন। কবির পূর্ব পুরুষ ছিলেন ছিলিম মোড়ল। ছিলিম মোড়লের পুত্র শরীফ মোড়ল আর শরীফ মোড়লের পুত্র বিরহিম। বিরহিমের এক পুত্র এয়ার খন্দকার। এয়ার খন্দকারের পুত্র কবি নওয়াজিশ। ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে শায়েস্তা খান চট্টগ্রাম বিজয়ের বহু পূর্বে ছিলিম মোড়লের আগমন চট্টগ্রামে ঘটে বলে জানা যায়। গৌড়ের সোলতান জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ শাহ (১৪৩৬-১৪৬০ খ্রী:) ১৪৩৯ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রামসহ আরাকান বিজয় করেন। তাঁর শাসনামলে চট্টগ্রামে মুসলমানদের ব্যাপক আগমন ঘটে। কবি নওয়াজিশের মতে তাঁর পূর্ব পুরুষ গৌড় রাজ্য থেকে চট্টগ্রামে আসেন। লোহাগাড়া, সাতকানিয়া, বাঁশখালী, আনোয়ারা ও চন্দনাইশে বর্তমানে বসবাসরত অনেকের পূর্ব পুরুষ নওয়াজিশের বংশধর বলে ধারণা করা হয়।

অন্যদিকে, ফখরুদ্দিন মোবারক শাহের (১৩৩৮-১৩৪০ খ্রী:) সেনাপতি কদল খাঁ ১৩৪০ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রাম জয় করেন। ওই সময়ে দক্ষিণ চট্টগ্রামে প্রথম মুসলিম বসতি স্থাপন শুরু হয় বলে ধারণা করা হয়। ১৩৩২ খ্রীষ্টাব্দে সোলতান শামশুদ্দিন ইলিয়াস শাহ সমগ্র বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন। উক্ত দুই সোলতানের আমলে দক্ষিণ চট্টগ্রামে সৈয়দ, পাঠান, শেখ ও মোঘল এ চার শ্রেণির মুসলমানদের আগমন ঘটে। ইতিহাস থেকে জানা যায়, দক্ষিণ চট্টগ্রামে ১৩টি সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবার ছিল। এদের মধ্যে ৭টি ছিল কাজী পরিবার। ১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে খিজুর খাঁ সৈয়দের শাসনামলে সৈয়দ বংশের সূচনা ঘটে।

চট্টল দরদী আবদুল হক চৌধুরীর মতে, হাজারো অধিক বছর সময়কালে চট্টগ্রাম অঞ্চলে আরাকান, সমতট, হরিকেল ও নাবিকরা অবস্থান নিয়েছেন। লোহাগাড়া অঞ্চলে আরাকানী, পর্তুগীজ ও ইংরেজসহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক এসেছে। আবদ্ধ হয়েছেন বিবাহ বন্ধনে। এছাড়াও এ অঞ্চলে সৈয়দ পরিবার, শেখ পরিবার, পাঠান পরিবার, মুকিম পরিবার, সিকদার পরিবার, কাজী পরিবার, সিদ্দিকী পরিবার, ডেপুটি পরিবার, শুকুর আলী মুন্সেফ পরিবার, মুন্সি পরিবার, ইউসুফ মৌলভী পরিবার, দারোগা পরিবার ও বুড়ো মাওলানা পরিবার বিভিন্ন সময় এসে বসতি স্থাপন করেছেন। উক্ত পরিবারগুলোর সাথে পারস্পরিক বিয়ে-শাদীর মাধ্যমে বংশ বিস্তার হয় পর্যায়ক্রমে উপজেলার অন্যান্য স্থানে আত্মীয়তার বন্ধন গড়ে তোলা হয়। ফলে জন্ম হয়েছে নতুন প্রজন্মের।

তথ্য সূত্র:

১ মোঘল সাম্রাজ্যের বিলুপ্ত অধ্যায় দোহাজারী- জামাল উদ্দিন।
২ অনজুমন ২০০ বছর পূর্তি সংখ্যা, চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদরাসা।
৩ ঐক্য, সাতকানিয়া-লোহাগাড়া বৌদ্ধ ঐক্য পরিষদ স্মারক-২০১৫।

উপজেলার কিছু ঐতিহ্যবাহী পরিবার

চট্টগ্রামের লোহাগাড়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যমন্ডিত একটি অঞ্চল। এটি পীর আউলিয়ার পূণ্যভূমিও। চারিদিকে সবুজ পাহাড়, গাছ-গাছালি ও টিলায় ঘেরা। এ অঞ্চলের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে ডলু-টংকাসহ ছোট-বড় ১৩টি খাল, যা এ অঞ্চলের সৌন্দর্য্যকে আরো বৃদ্ধি করেছে। লোহাগাড়া ও লোহাগাড়ার বিভিন্ন গ্রাম বা স্থানের নামকরণ কখন কিভাবে হয়েছে তা নিশ্চিতভাবে বলা না গেলেও সুলতানী বা মোঘল আমলে হয়েছে বলে ইতিহাসবিদ ও লেখকরা মনে করেন। সম্রাট শাহজাহানের পুত্র শাহ্ সুজা আক্রান্ত হয়ে সড়ক পথে আরাকানে পালিয়ে গিয়ে নিহত হন। আরাকানে যাওয়ার সময়ে চুনতিসহ উপজেলার বিভিন্নস্থানে যাত্রা বিরতী করেন। শাহ্ সুজার সফর সঙ্গি আলেম-ওলামাদের কেউ কেউ এ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। তখন থেকে শুরু হয় এখানে বসতি স্থাপন। লোহাগাড়ার আদি বসতি বা পরিবার সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া না গেলেও কিছু কিছু ঐতিহ্যবাহী গোষ্ঠী বা পরিবার এখানে বিভিন্ন সময়ে বসিত স্থাপন করে। নিম্নে কিছু ঐতিহ্যবাহী পরিবার নিয়ে সংক্ষেপে তুলে ধরা হল :

মিয়াজী পরিবারঃ

এ পরিবার চুনতির প্রাচীনতম পরিবার। অনেকেই একে উপজেলার প্রথম প্রাচীনতম পরিবার বলে মনে করেন। কেননা চুনতির অন্যতম পথিকৃৎ শাহ্ মাওলানা আবদুল হাকিম (রহঃ) রচিত "শজরাহ" মূলে জানা যায়, ১৬৬০ সালের ১২ই মে শাহ্ সুজা পরিবারবর্গ, সৈন্য-সামন্ত, আলেম-ওলামা ও অন্যান্য একান্ত অনুগামী নিয়ে চট্টগ্রাম হয়ে আরাকান অভিমুখে যাত্রা করেন। চট্টগ্রাম হতে সাঙ্গু ও ডলু নদের দক্ষিণ প্রান্তে এসে জাহাজ চলাচল উপযোগী জলপথ শেষ হলে চুনতির বর্তমান কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দান ও কবস্থানের পাদদেশে নৌবহর নোঙর করে। এখানে শাহ্ সুজার সফর সঙ্গি ২২ আলেম-ওলামার মধ্যে বেশ কয়েকজন এ এলাকায় স্থায়ী বসবাস করেন। পরবর্তীতে সম্রাট শাহ্ জাহানের রাজদরবারের অন্যতম শিক্ষক ইব্রাহিম খন্দকার শাহ্ সুজাকে অনুসরণ করে রামু পর্যন্ত গিয়ে সেখান থেকে ফিরে বাঁশখালীর খানখানাবাদে কিছু দিন অবস্থান করেন। তারপর সেখান থেকে চুনতিতে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। বর্তমানে চুনতি জামে মসজিদের উত্তর পাশে ঈদগাহ পাহাড়ে ইব্রাহিম খন্দকার বসতি স্থাপন করেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে।

মিয়াজী বংশের আদিপুরুষ ছিলেন সুফী নছরতুল্লাহ খন্দকার। খ্রিষ্টীয় সতেরো শতকের শেষভাগে তিনি গৌড় থেকে এসে লোহাগাড়ার চুনতি গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। সুফী নছরতুল্লাহ খন্দকার বড় মিয়াজী এবং তাঁর পুত্র হযরত শাহ্ শরীফ ছোট মিয়াজী নামে পরিচিত। তাঁরা এলাকায় মসজিদ ও মক্তব প্রতিষ্ঠা করে আধ্যাত্মিক ও জাগতিক জ্ঞানের আলো ছড়ান। চুনতির উত্তর পাশে ছোট-ছোট টিলায় পল্লীর পত্তন করেন।

সিকদার পরিবারঃ

মিয়াজী পরিবারের সমসাময়িক পরিবার হল সিকদার পরিবার। ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে পাঠানবংশীয় ফজর আলী খান দোহাজারীর কার্যকারক ছিলেন। ঐ সময়ে কমিশন ভিত্তিক খাজনা আদায় করতেন এ বংশের লোকেরা। এছাড়াও প্রশাসনের অনুপস্থিতিতে এলাকার কলহ-বিবাদ নিষ্পত্তি,উত্তেজনা প্রশমন ও প্রতিরোধের ভার এ বংশের উপর ছিল। মুহাম্মদ গণি সিকদার ছিলেন চুনতির মর্যাদাবান সিকদার। তাঁর ভাই কালা সিকদার একজন খ্যাতনামা লোক ছিলেন। তাঁর অধঃস্তন বংশধর খানবাহাদুর মাওলানা মুহাম্মদ হাসান একজন খ্যাতিমান অধ্যাপক ছিলেন। এ পরিবারের এক কৃতি সন্তান মাওলানা নুরুল হোসাইন চুনতি হাকিমিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ছিলেন।

চুনতির হাদী সিকদার এবং বশির আহমদ সিকদার প্রকাশ পতন সিকদারের বংশধর ছিলেন শিক্ষিত ও প্রভাবশালী। পতন সিকদারের দুই ছেলে আবদুল ওয়াদুদ সিকদার ও সুলতান আহমদ সিকদার।

কাজী পরিবারঃ

চুনতির তৃতীয় পরিবার হল কাজী পরিবার। এই পরিবার সতেরো শতকের শেষের দিকে চুনতিতে এসে বসবাস শুরু করেন। এ পরিবার সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীরের পক্ষের মানুষ। চাকুরী ও ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত আছেন এ পরিবারের সদস্যরা। এ বংশের সুসন্তান এ ডি এম আবদুল বাসেত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একজন যুগ্ম সচিব হিসেবে কর্মরত আছেন। অন্যজন কাজী বশির আহমদ চুনতির ঐতিহাসিক ১৯দিন ব্যাপী সীরাতুন্নবী (স.) মাহফিলের অন্যতম পরিচালক। তার সন্তানদের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ার শরীফুল ইসলাম ও ইঞ্জিনিয়ার লতিফুল ইসলাম বাংলাদেশের প্রথম গ্রামভিত্তিক ওয়েবসাইট www.chunati.com প্রতিষ্ঠা করেন। এ ওয়েবসাইট প্রতিষ্ঠার সাথে এ পরিবারের কাজী আরিফুল ইসলামসহ অনেকে জড়িত।

ছিদ্দিকী পরিবারঃ

এ পরিবারের প্রাণ পুরুষ গাজীয়ে বালাকোট মাওলানা আবদুল হাকিম খান ছিদ্দিকী (রহ.)। তাঁর ছোট ভাই মাওলানা নাছির উদ্দীন খান ছিদ্দিকীর বংশধররাও ছিদ্দিকী পরিবারের। মাওলানা আব্দুল হাকিম খান ছিদ্দিকী (রহ.) হযরত আবু ছিদ্দিকী (র.) এর পরিবারের ৩৯ তম পুরুষ। এ বংশের ১-৮ তম পুরুষ আরবে, ৯ম-২৬তম পুরুষ বাগদাদে, ২৭-২৮তম পুরুষ লাহোরে, ২৯তম পুরুষ ছৈয়দ হোসেন শাহের শাসন আমলে বাংলার রাজধানী গৌড় থেকে আসেন। সেখানে ৩৪ তম পুরুষ পর্যন্ত অবস্থান করেন। ৩৪তম পুরুষ শাহ সুজার সাথে পালিয়ে গিয়ে বাঁশখালীর বাণীগ্রামে অবস্থান করেন। সোলতানী ও মোঘল আমলে এ বংশের লোকেরা প্রশাসনিক পদে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করায় খান উপাধি প্রাপ্ত হন। এ বংশের লোকেরা উচ্চ শিক্ষিত।

শিক্ষকতা, আধ্যাত্মিকতা, প্রশাসনিক কাজ ইত্যাদিতে জড়িত। তাঁদের বংশের প্রথম দুই পুরুষ আধ্যাত্মিক সাধক ও প্রথম সারির রাজনীতিক ছিলেন। তৃতীয় পুরুষ জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব দাবিদার ছিলেন। হযরত মাওলানা আবদুল হাকিম খান ছিদ্দিকী(রহ:)'র প্রপিতার পিতা শাহ আব্বাস (৩৬তম পুরুষ) এক শিশু পুত্র শেখ আব্দুল্লাহ ছিদ্দিকীকে ঘরে রেখে হজ্বে যান। চুনতি গ্রামে মিয়াজী পাড়ার সুফী নছরতুল্লাহ খন্দকার তাঁর সুযোগ্য পুত্র সুফী শাহ শরীফ মিয়াজী শাহ আব্বাসের অনুরোধে বাঁশখালীর বাণীগ্রাম থেকে শেখ আব্দুল্লাহকে চুনতিতে নিয়ে আসেন। ফলে ছিদ্দিকী বংশের শেখ আব্দুল্লাহ খান ছিদ্দিকীর আবাসভূমি চুনতিতে। চুনতি মিয়াজি মসজিদের পাহাড়ের দক্ষিণে শেখ আবদুল্লাহ, দুই পুত্র ক্বারী আবদুর রহমান ও মুকিম। প্রথম পুত্র আবদুর রহমানের ৭ জন ছেলের মধ্যে হযরত মাওলানা আবদুল হাকিম ছিদ্দিকী (রহঃ) এবং নাছির উদ্দীন খান ছিদ্দিকী (রহঃ) বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। এ পরিবারে মাওলানা আবদুল হাকিম (রহঃ)'র বংশধর খান বাহাদুর ওয়াজিল্লাহ সামি (বিচারক), তাঁর পুত্র আহমদ কবির ছিদ্দিকী ও ফৌজুল কবির খান ছিদ্দিকী (জমিদার, কবি ও রাজনীতিক) ও তাঁর ৫ পুত্র নুরুল কবির খান ছিদ্দিকী (খাদ্য পরিদর্শক), বদরুল কবির খান ছিদ্দিকী (ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে সেনাবাহিনীর সদস্য), মালিহুল কবির খান ছিদ্দিকী (আলেম), ফৌজুল কবির খান ছিদ্দিকীর নাতি শফিকুল আজিম খান ছিদ্দিকী (উপ-সচিব), অপর নাতি ফৌজুল আজিম খান ছিদ্দিকী (ক্বারী ও নিকাহ রেজিঃ)। মাওলানা আবদুল হাকিম খান ছিদ্দিকীর পঞ্চম পুত্র মাওলানা ওবাইদুল্লাহর পুত্র মাওলানা আবদুল গণি (চট্টগ্রাম শাহী জামে মসজিদের ইমাম ছিলেন) সহ অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তি।

ডেপুটি পরিবার:

হযরত মাওলানা আবদুল হাকিম খান ছিদ্দিকীর অনুজ হযরত নাছির উদ্দীন খান ছিদ্দিকী ব্রিটিশ আমলে ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। ফলে তাঁর বসতি এলাকার নাম ডেপুটি পাড়া ও তাঁর বংশধর ডেপুটি পরিবার নামে খ্যাত। এ পরিবারে রয়েছেন অসংখ্য ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী, শিক্ষাবিদ, বিচারক, শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি, উচ্চপদস্থ সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর অফিসার। নাছির উদ্দীন খান ছিদ্দিকীর পুত্র ফয়েজুল্লাহ খান (ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন) ও তাঁর ২ পৌত্র মোস্তাফিজুর রহমান খান এবং কবির উদ্দীন আহমদ খানও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। এছাড়াও কামাল উদ্দীন খান (বিখ্যাত কবি সুফিয়া কামালের স্বামী) ও তাঁর কন্যা এডভোকেট সুলতানা কামাল (তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ছিলেন) ও এরশাদ উল্লাহ খান (বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক জিএম)'র জন্ম এ পরিবারে। ব্রিটিশ আমল থেকে এ পরিবারের বংশধররা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুনাম বজায় রেখে চলেছে।

শুকুর আলী মুন্সেফ পরিবার:

বসবাসের সুবিধার জন্য শুকুর আলী মুন্সেফ চুনতি সিকদার পাড়ার সামান্য উত্তরে বসবাস শুরু করেন। তখন থেকে তাঁর পাড়া মুন্সেফ পাড়া ও তাঁর বংশধর মুন্সেফ বংশ

নামে পরিচিত। এ বংশের লোকেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষা প্রচারে উদ্যোগী ছিলেন। এ পরিবারের কৃতি সন্তানদের মধ্যে রয়েছে- অধ্যাপক হাবিবুর রহমান (বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ), শাহাব উদ্দিন, লুৎফুর রহমান, আহমদ ফরিদ (অবসরপ্রাপ্ত সচিব), ড. সোলতান হাফিজুর রহমান (এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের ডিজি), ক্যাপ্টেন আহমদ ফজলুর রহমান (বাংলাদেশ বিমানের বৈমানিক), মরহুম মুন্তাসিরুল ইসলাম (শিক্ষাবিদ) ইত্যাদি।

ইউসুফ মৌলভী পরিবারঃ

হযরত মাওলানা কাজী মোহাম্মদ ইউসুফ (রহ.) বিখ্যাত আলেম ও উঁচু মাপের দরবেশ ছিলেন। এ পরিবারের লোকজন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ)'র বংশধর। এ পরিবারে রয়েছে অসংখ্য বুজুর্গ,আলেম ও পীর-মশায়েখ। হযরত শাহ্ মাওলানা হাফেজ আহমদ (রহ.) প্রকাশ শাহ্ সাহেব কেবলা চুনতি এ পরিবারের কৃতি সন্তান। হযরত আজমগড়ী (রহ.)'র খলিফা মাওলানা নজির আহমদ (রহ.) ও তাঁর পুত্র মাওলানা হাবিব আহমদ (রহ.) পীর সাহেব চুনতি, মাওলানা বশির আহমদ ও তাঁর পুত্র মাওলানা শফিক আহমদ। মাওলানা আবু তাহের মোহাম্মদ নাজের, ড. আবু বকর রফিক (উপ-উপাচার্য, আর্ন্তজাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম) প্রমূখ।

দারোগা পরিবারঃ

দারোগা পাড়া চুনতির ঐতিহ্যবাহী একটি পাড়া। চুনতির ডেপুটি বাজারের উত্তর-পশ্চিমে এর অবস্থান। আজগর আলী তহশিলদার এ পাড়ার গোড়াপত্তন করেন। আজগর আলীর চার ছেলে ও দুই মেয়ের মধ্যে আজম উল্লাহ চৌধুরী ও ফয়েজ আহমদ চৌধুরী ইংরেজ শাসনামলে পুলিশের দারোগা ছিলেন। তখনকার দিনে দারোগাকে অনেকাংশে ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ শেষ করতে হত। ফলে বংশ পরম্পরায় দারোগা পরিবার এবং পরে দারোগা পাড়া হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। আজগর আলীরা তিন ভাই। অপর ভাইয়েরা হলেন- মোবারক আলী ও মোশারফ আলী। মোবারক আলীর এক ছেলে ও এক মেয়ে। তারা হলেন- মুহাম্মদ এলাহাদাদ ও মরিয়ম খাতুন।

আজগর আলী খান তহশিলদারের ছেলে আজম উল্লাহ চৌধুরীর তিন ছেলে ও চার মেয়ে। প্রথম ছেলে রশিদ আহমদ চৌধুরী প্রকাশ বুলবুল চৌধুরী একজন আন্তর্জাতিক নৃতশিল্পী ও চিত্রশিল্পী ছিলেন। বুলবুল চৌধুরীর নামে ঢাকায় ও পাকিস্তানের করাচিতে বুলবুল ললিতকলা একাডেমী রয়েছে। কলিকাতা ও লন্ডনে তার স্মরণে রয়েছে বহু প্রতিষ্ঠান। ১৯৫৪ সালে বুলবুল চৌধুরী বোন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে কলিকাতায় মারা যান। তার স্ত্রীর নাম আফরোজা বুলবুল (পূর্বের নাম প্রতিভা মোদী) একজন খ্যাতিমান নৃত্যশিল্পী ও লেখক ছিলেন। মারা যান লন্ডনে। স্বামী-স্ত্রী দু'জনের সমাধি হচ্ছে কলিকাতায়। আজম উল্লাহ চৌধুরীর দ্বিতীয় সন্তান রওশন আরা আলতাফ'র

স্বামী আলতাফ হোসেন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ছিলেন। তৃতীয় সন্তান সুলতানা রহমানের স্বামী প্রফেসর হাবিবুর রহমান অর্থনীতিবিদ ও পরিকল্পনা কমিশনের চীফ ছিলেন। তার ছেলে ড. সুলতান হাফিজুর রহমান এডিবি'র প্রথম মুসলিম ডিজি ছিলেন। চতুর্থ সন্তান রফিক আহমদ চৌধুরীর মেয়ে আসিফা খানম জিনা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সামরিক সচিব মিয়া মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন বাচ্চুর সহধর্মিনী। পঞ্চম সন্তান মোস্তাক আহমদ চৌধুরী বি.সি.আই.সি'র ডিজিএম ছিলেন। ষষ্ঠ সন্তান লিলি চৌধুরী দশ বছর বয়সে নিজ বাড়ির পুকুরে পানিতে ডুবে মারা যান। ঐ সময়ে তার স্মরণে বাড়ির কাছারি ঘরে প্রতিষ্ঠিত হয় লিলি স্মৃতি বিদ্যালয়। ১৯১৯ সালে এটি চুনতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে নামকরণ হয়। সপ্তম সন্তান রাবেয়া বেগম নিলুর স্বামী এনায়েতুর রহমান পিডিবি ও ডেসার প্রধান প্রকৌশলী ছিলেন।

আজগর আলী সাহেবের দ্বিতীয় পুত্র ফয়েজ আহমদ চৌধুরী দুই ছেলে ও এক মেয়ে। তার ছেলে নাসির আহমদ চৌধুরী ও কন্যা নুরুন্নাহার বেগম এর স্বামী কবির আহমদ একজন ডাক্তার। দ্বিতীয় ছেলে ডাক্তার খোরশেদ আনোয়ার চৌধুরী চুনতির প্রথম এম.বি.বি.এস পাশ করা চিকিৎসক। আজগর আলী সাহেবের তৃতীয় পুত্র মাওলানা মুহাম্মদ দানেশ চৌধুরী চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্রাসা'র পরিচালনা কমিটির সদস্য ছিলেন। তার দুই ছেলে ও চার মেয়ে। পুত্র আবদুল্লাহ মিয়া চুনতি ইউপি চেয়ারম্যান ছিলেন। আজগর আলীর চতুর্থ পুত্র কবির উদ্দিন আহমদ চৌধুরী পাক-ভারত রেলওয়ের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। তার তিন মেয়ে ও দুই ছেলে। প্রথম মেয়ে রাশেদা বেগম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন এবং চুনতি গ্রামের প্রথম মাস্টার্স ডিগ্রীধারী মহিলা। দ্বিতীয় মেয়ে রিফাত আরা একজন খ্যাতিমান কথাসাহিত্যিক, যিনি নিউইয়র্কে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। তৃতীয় সন্তান নজরুল ইসলাম তথ্য মন্ত্রণালয়ের ডেপুটি ডাইরেক্টর ছিলেন। চতুর্থ সন্তান নুরুল ইসলাম খোকন। পঞ্চম সন্তান হোসনে আরা বেবী বর্তমানে চুনতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা। আজগর আলী সাহেবের প্রথম কন্যা মায়মুনা খাতুনের স্বামী আজম উল্লাহ। মায়মুনা খাতুন ইসলাম মিয়া সাহেবের আম্মাজান। দ্বিতীয় কন্যা মাহছুমা খাতুনের স্বামী মাওলানা আমির হোসাইন।

দারোগা পরিবারের সাথে চুনতির খান ছিদ্দিকী পরিবার, মুন্সেফ পরিবার ও মিয়া পরিবারসহ বহু ঐতিহ্যবাহী পরিবারের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। দারোগা পরিবারের সার্বিক সহযোগিতায় ১৮০০ শতকের দিকে খান ছিদ্দিকী পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আবদুল হাকিম (রহ:)'র ছোট ভাই খান বাহাদুর নাছির উদ্দিন ডেপুটির সম্মানে চুনতি ডেপুটি বাজার প্রতিষ্ঠিত হয়। দারোগা পরিবারের নিজস্ব দানকৃত জায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত চুনতি ডেপুটি বাজার জামে মসজিদ। বাজার সংলগ্ন চুনতি পুলিশ ফাঁড়ি ইতিহাসের সাক্ষী বহন করছে। জনশ্রুতি আছে, ১৬০০ শতকের দিকে আরাকান রাজার শাসনামলে চুনতি পুলিশ ফাঁড়ি 'নিরাপত্তা চৌকি' ছিল। ১৯০৪

সালে দোহাজারী চৌকির অধীনে চুনতি পুলিশ ফাঁড়ি প্রতিষ্ঠিত হয়। দারোগা পরিবারের পাশাপাশি মিয়াজী পরিবার এলাকায় সমাজ সংস্কারে নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন। এ পরিবারের প্রাণপুরুষ মাওলানা তাজউদ্দিন মিয়াজী একজন আধ্যাত্মিক সাধক ছিলেন। চুনতি ডেপুটি বাজার জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠায় যার ভূমিকা ছিল অনন্য। তার একমাত্র ছেলে মাওলানা আজিজুর রহমান ধর্মীয় শিক্ষায় উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ঐ মসজিদের খতিব ছিলেন। একই বংশের মাওলানা খলিলুর রহমান ও মাওলানা খলিল আহমদ এলাকায় ধর্মীয় শিক্ষা প্রসারে ভূমিকা রেখেছেন। পরবর্তীতে মাওলানা আজিজুর রহমানের পুত্র আলহাজ্ব মাওলানা মোস্তাক আহমদ এলাকায় ধর্মীয় শিক্ষা প্রসারে নিজেকে আজীবন নিয়োজিত রাখেন। তার ছেলে এম. আজিজুল হক লোহাগাড়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য বইয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে ছিলেন। এছাড়াও এলাকার সমাজের উন্নয়নে অবদান রেখে যাচ্ছেন ইসলাম মিয়ার পরিবার, মাওলানা সুলতান আহমদ (রহ:)'র পরিবার, আলহাজ্ব মুফিজ কোম্পানীর পরিবার, আলহাজ্ব আবুল ফয়েজ সওদাগরের পরিবার, আলহাজ্ব আহমদ কবির সওদাগরের পরিবার, আলহাজ্ব রাহমত উল্লাহ মিয়ার পরিবার, আলহাজ্ব শামসুল ইসলাম সাহেবের পরিবার ও আলহাজ্ব হাকিম মিয়া চৌধুরীর পরিবার।

তথ্যসূত্র:

১. চুনতির ঐতিহ্যবাহী কয়েকটি পরিবার-জে.ইউ.এম.বাবর হোসাইন ছিদ্দিকী
২. আনজুমন স্মরণিকা-২০১০
৩. হোসনে আরা বেবী, প্রধান শিক্ষিকা, চুনতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

আঞ্চলিক ভাষা

লোহাগাড়ার ভাষা চাটগাঁইয়া। এ এলাকার বাসিন্দারা নিজেদের মধ্যে প্রথমে চাটগাঁইয়া ভাষায় কথা বলে। চট্টগ্রাম ছাড়া অন্য উপজেলার লোকদের সাথে অশিক্ষিতরা চাটগাঁইয়া ও শুদ্ধ বাংলা মিশ্রিত ভাষায় কথা বলে। শিক্ষিতরা শুদ্ধ বাংলায় কথা বলে।

প্রাচীনকাল থেকে বৃহত্তম চট্টগ্রাম (লোহাগাড়াসহ) ছিল আরাকানদের এলাকা। যার ফলে চট্টগ্রাম অঞ্চলের মানুষ রোঁসাঙ্গি নামে পরিচিত। ড. আবদুল করিম ও আবদুল হক চৌধুরীসহ অনেকের মতে, আরাকানের রাজধানী আকিয়াবের সঙ্গে চট্টগ্রাম দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে সেতু বন্ধন ছিল। লোহাগাড়াসহ চট্টগ্রাম অঞ্চলে তুর্কি, চীনা, আরবীয়, পাঞ্জাবী, মধ্য ভারতীয়, রাখাইন, মগ, চাকমা, ত্রিপুরা, ইংরেজ, পর্তুগীজসহ অনেক মানুষের আগমন ঘটেছে। গবেষকদের মতে, লোহাগাড়া আঞ্চলিক ভাষায় প্রায় ১০-১৫টি ভাষার মিশ্রণ রয়েছে। এ অঞ্চলের ভাষার মধ্যে 'ন' অক্ষরটি ব্যবহৃত হয় বেশি। অথচ 'ন' এর সাথে আকার (া) যোগ করলে হয় 'না'। অর্থাৎ 'ন' এর অর্থ না। না শব্দের ব্যবহার আরবী ভাষার প্রভাবের ফল।

লোহাগাড়া অঞ্চলে বিভিন্ন সম্পদায়ের মানুষের আগমনের ফলে তাঁদের সাথে এসেছে ভাষা ও সংস্কৃতি। ফলে এ অঞ্চলের ভাষা হয় সমৃদ্ধ। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের মতে, চট্টগ্রাম অঞ্চলের ভাষা বড়ই অদ্ভুত। এ অঞ্চলের ভাষার মধ্যে একাধিক ভাষার মিশ্রণ রয়েছে। আর ভাষার বৈশিষ্ট্য ও উচ্চারণ চট্টগ্রাম অঞ্চল ছাড়া অন্য অঞ্চলের বাসিন্দাদের বুঝতে অসুবিধা হয়। যেমন 'আই ন যাইয়ম' এখানে আই হচ্ছে ইংরেজি শব্দ যার অর্থ আমি, 'ন' অর্থ না এবং যাইয়ম শব্দের অর্থ যাব। অর্থাৎ আমি যাব না। লোহাগাড়া অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষার বাক্যের ব্যবহারের মধ্যে কোমলতা, কমনীয়তা ও গভীরতা রয়েছে। ভাষায় একই শব্দ একাধিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন 'মরিচ' শব্দটি একাধিক বাক্যে পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক অর্থে 'তুই এখনো ন মরিচ' অর্থাৎ তুমি এখনো মারা যাওনি। এখানে 'মরিচ' শব্দটি দিয়ে মৃত্যু বুঝানো হয়েছে। আরেক অর্থে বাজার থেকে এক কেজি মরিচ আন। এখানে মরিচ অর্থে ফল বুঝানো হয়েছে। এ অঞ্চলে আরো কিছু কিছু শব্দ বা বাক্যের ব্যবহার হয়, যা কোমলতা বুঝানো হয়। যেমন 'ভাবীর পোয়া অইয়ে'। এখানে পোয়া দিয়ে ছেলে সন্তান আর অইয়ে শব্দ দিয়ে হয়েছে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ভাবীর ছেলে সন্তান হয়েছে। এ অঞ্চলের ভাষায় স্নেহ বা সহানুভূতি সূচক শব্দ ব্যবহৃত হয়। 'পোয়াইবা খানা বাছের' এখানে 'পোয়াইবা' বলতে ছেলে সন্তান, 'খানা' দ্বারা খাদ্য এবং 'বাছের' শব্দ দ্বারা অপছন্দ বুঝানো হয়েছে। এমন কতকগুলো আঞ্চলিক শব্দ আছে, যা সম্মানসূচক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন 'অনে কড়ে যাইবান' অনে এর বাংলা শব্দ আপনি, ইংরেজি শব্দ You এবং যাইবেনের বাংলা রূপ যাবেন। অর্থ হচ্ছে আপনি কোথায় যাবেন। এ অঞ্চলে আঞ্চলিক ভাষায় ছড়ারও প্রচলন রয়েছে। যেমন

"আলসিয়ার ভাই আলসিয়া
ঝুঁইর যাবে ভাসিয়া
আরেকটা বানাইমু ঘরে বসিয়া"।

তিন বন্ধু খালের তীরে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিতে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এমন সময় বাতাস এসে ঝুঁইর (পাতার বানানো ছাতা) তিনটিকে উড়াইয়া খালের পানিতে ফেলে দিল। এ অবস্থায় এক বন্ধু অপর দুই বন্ধুকে উক্ত ছড়াটি শুনায়। এতে তিন বন্ধুই আনন্দ পায়।

অপরদিকে লোহাগাড়ার আঞ্চলিক ভাষায় সমার্থক শব্দের ভান্ডার বেশি ব্যবহৃত হয়। একই বাক্যে ইংরেজি, বাংলা ও অন্যান্য ভাষার শব্দের ব্যবহার হয়। যেমন 'আই এক গ্লাস পানি খাইয়ুম'। এখানে আই ইংরেজি শব্দ অর্থ আমি, গ্লাস ইংরেজি শব্দ অর্থ কাঁচের পানির পাত্র এবং পানি ফার্সী শব্দ অর্থ জল। পানির অনেক সমার্থক শব্দ আছে। পানির সমার্থক শব্দগুলো হচ্ছে জল, পয়ঃ, বারি, সলিল ইত্যাদি।

লোহাগাড়ার আঞ্চলিক ভাষার এরকম অনেক শব্দ বা বাক্য আছে যেখানে পাশাপাশি, বাংলা, ইংরেজি, ফার্সী, পর্তুগীজ ইত্যাদি শব্দের সমন্বয় ঘটেছে। তাই এ অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা নিয়ে গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। গবেষণা করলে সহজেই বুঝা যাবে যে, লোহাগাড়া নামকরণের সার্থকতা। কখন কিভাবে লোহাগাড়া নামকরণ হয়েছে এবং ইউনিয়ন সমূহের নামকরণ কিভাবে হয়েছে। এ অঞ্চলে পাড়া-মহল্লায় শিক্ষিত মানুষ বাড়ার ফলে আঞ্চলিক ভাষায় বিভিন্ন শব্দ হারিয়ে যাচ্ছে। আঞ্চলিক ভাষায় ব্যবহৃত এ শব্দগুলো সংরক্ষণ করার প্রয়োজন রয়েছে। কেননা অনেক দেশের প্রচলিত শব্দের সমন্বয়ে লোহাগাড়া আঞ্চলিক ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। মুখের বুলি থেকে সৃষ্টি হয়েছে আঞ্চলিক ভাষা।

(সহায়ক গ্রন্থ: চট্টগ্রাম পরিক্রমা- আহমদ মমতাজ।)

পীর আউলিয়ার দেশ

পাহাড়ি শ্যামলিমা আর সমুদ্রের নীল জলে সুজলা রূপসী চট্টগ্রাম। পাহাড়-পর্বত ও সমুদ্রের মহামিলনে গড়ে ওঠেছে প্রাচ্যের রাণী চট্টগ্রাম। আসামের লুসাই পাহাড় থেকে উৎপন্ন চট্টগ্রামের প্রাণ কর্ণফুলী নদীর তীরে গড়ে ওঠেছে সমুদ্র বন্দর চট্টগ্রাম। চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে শুয়ে আছেন হাজার-হাজার পীর আউলিয়া। কালক্রমে ঐতিহাসিক কারণে চট্টগ্রাম পরিণত হয়েছে ইসলামের প্রবেশদ্বার। পরবর্তীতে এ চট্টগ্রাম বার আউলিয়ার দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের মধ্য দিয়ে পীর আউলিয়াগণের আগমন ঘটেছে বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন। সোনারগাঁও এর স্বাধীন সুলতান ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ চট্টগ্রাম জয় করার ফলে চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচার পূর্ণমাত্রায় আরম্ভ হয়। চট্টগ্রামের ইসলাম প্রচারকগণের আগমন ঘটলে দক্ষিণ চট্টগ্রাম তথা লোহাগাড়ার মনীষীদের সাথে ব্যাপক যোগাযোগ হয়। অনেক সুফী ও পীর দরবেশ এখানে সমাহিত হন। সুফী সাধকের মধ্যে একজন লোহাগাড়ার পদুয়া নামক স্থানে অপরজন লোহাগাড়ায় সমাহিত আছেন বলে

ঐতিহাসিকরা মনে করেন। পরবর্তীতে তাদের নামানুসারে উপজেলায় দুটি স্থানের নামকরণ হয় বার আউলিয়া ও দরবেশ হাট। এখানকার কয়েকজন পীর-আউলিয়ার নাম উল্লেখ করা হল- (১) হযরত মাওলানা আবদুল হাকিম (রহ.) লোহাগাড়া চুনতি গ্রামে তাঁর জন্ম। তাঁর নামানুসারে চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি আবার বড় মাওলানা নামেও পরিচিতি, (২) মাওলানা শাহ নজির আহমদ, তিনি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন, (৩) হযরত মাওলানা শাহ আতাউল্লাহ হোসাইনী (রহ.) সাতগড়, (৪) হযরত মাওলানা শাহ হাফেজ আহমদ (রহ.) চুনতি শাহ সাহেব নামে পরিচিত। যিনি চুনতি সীরত ময়দানে ১৯ দিন ব্যাপী ঐতিহাসিক সীরতুন্নবী (স.) মাহফিল প্রবর্তন করেন। যাঁর মাজার সীরত ময়দানের পাশে কালের সাক্ষী হিসেবে আছে, (৫) হযরত মাওলানা শুকুর আলী মুন্সেফ (রহ.), চুনতি, (৬) হযরত মাওলানা মোজাফ্ফর আহমদ, মাওলানা সাহেব নামে পরিচিত, (৭) হযরত মাওলানা শাহপীর (রহ.)। যাঁর মাজার দরবেশ হাটে সাক্ষী হিসেবে আছে, (৮) হযরত মাওলানা হেফাজুর রহমান (রহ.), (৯) হযরত মাওলানা আবদুল বারী প্রকাশ বুড়ো মাওলানা, (১০) হযরত মাওলানা মুনির আহমদ, (১২) মাওলানা দানেশ আহমদ, (১৩) মাওলানা আবুল হাশেম প্রকাশ শেরে খোদা, (১৪) মাওলানা নুরুল কবির নদভী, (১৫) হাফেজ মাওলানা ক্বারী মুহাম্মদ ওয়াজি উল্লাহ, (১৬) মাওলানা ওয়ারিজ আলী, (১৭) মাওলানা মুহাম্মদ মাহমুদুল হক খতিবী, (১৮) মাওলানা কামাল উদ্দীন, (১৯) মাওলানা আবদুর রশিদ, (২০) মুফতি মাওলানা এয়াকুব, (২১) সৈয়দ আমির আলী প্রকাশ মুল্লুক শাহ, (২২) আহমদ মুল্লুক শাহ, (২৩) হযরত পেঠান শাহ (রহ.), (২৪) মুফতি মাওলানা ইব্রাহিম (রহ.), (২৫) হযরত মাওলানা ছমি উদ্দীন শাহ (রহ.), (২৬) হযরত মাওলানা আবদুস ছমদ (রহ.), (২৭) হযরত মাওলানা সৈয়দ শাহ (রহ.) ইত্যাদি। উক্ত পীর আউলিয়া ও বুর্জুগানেদ্বীনগণ উপজেলার বিভিন্ন স্থানে মাটিতে শুনে আছেন। তাঁদের অনেকের অলৌলিক ঘটনা ও কারামত লোকমুখে শুনা গেছে। উদাহরণস্বরূপ হযরত শাহ সাহেব কেবলা ও হযরত পেঠান শাহ (রহ.) এর কারামতের কথা এখনো লোকমুখে শুনা যায়।

নবম অধ্যায়

মুক্তিযুদ্ধে লোহাগাড়া

Chunati.com
Pioneer in village based website

এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম।

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মুক্তিযুদ্ধে লোহাগাড়া

লোহাগাড়া দক্ষিণ চট্টগ্রামের একটি অন্যতম উপজেলা। ১৯৭১ সালে এ অঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধা ও দেশপ্রেমিক জনতা পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। নানা প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতার মাঝেও এ এলাকার মুক্তিযোদ্ধারা ভারত থেকে প্রশিক্ষণ শেষে পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের দোষদের বিরুদ্ধে সাহসের সাথে যুদ্ধ করে বিজয় চিনিয়ে এনেছে। দেশে মহান মুক্তিযুদ্ধে লোহাগাড়ার মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান অনস্বীকার্য। উপজেলার আমিরাদবাদ ইউনিয়নের কৃতিসন্তান শহীদ মেজর নাজমুল হক ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালীন ৭নং সেক্টরের প্রথম কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বৃহত্তর রাজশাহী, দিনাজপুর,বগুড়া ও পাবনা জেলায় বীরত্বের সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণের মধ্য দিয়ে সূচনা হয় স্বাধীনতা সংগ্রামের। মুক্তিপাগল মানুষরা এ মহান নেতার আহবানে সাড়া দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। চট্টগ্রাম ছিল আন্দোলন সংগ্রামের সূতিকাগার। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার স্থানও চট্টগ্রাম। ১৯৭১ সালের এক এপ্রিলের মধ্যে পাকবাহিনী চট্টগ্রাম শহর দখল করে নেয়। ফলে স্বাধীনতাকামী মানুষ গেরিলা প্রশিক্ষণ নিয়ে গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে গিয়ে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। দেশের অন্যান্য এলাকার মত অবিভক্ত সাতকানিয়ায় (লোহাগাড়া) গঠন করা হয় সংগ্রাম পরিষদ। ১৯৭০ সালে সাতকানিয়া- চকরিয়া থেকে নির্বাচিত আওয়ামীলীগ দলীয় এমএনএ আবু ছালেহ'র নেতৃত্বে গঠিত হয় সংগ্রাম পরিষদ। তাঁর সাথে ছিলেন অবিভক্ত সাতকানিয়া আওয়ামীলীগের সভাপতি ও সাবেক এমপি এম ছিদ্দিক, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নাজিম উদ্দিন,সাবেক গণপরিষদ সদস্য সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীসহ অনেকে। তবে সংগ্রাম পরিষদ আবু ছালেহ ও অধ্যাপক নাজিম উদ্দিনের নেতৃত্বে পরিচালিত হতো। তাদের নেতৃত্বে ছাত্র-শিক্ষক, কৃষক, শ্রমিকসহ সাধারণ মানুষ পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

লোহাগাড়াতে মুক্তিযুদ্ধের কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে দূর্গম পাহাড় থেকে। কেননা এসব অঞ্চল মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল ছিল। লোহাগাড়া অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় পদুয়ার পূর্বপাশে হানিফার চর এলাকার মরহুম শফিউর রহমান সওদাগরের খামার বাড়ি ও পাবর্ত্যজেলা বান্দরবানের কেয়াজুঁ পাড়ায় মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প স্থাপন হয়।পরবর্তীতে কেয়াজূঁ পাড়ার ক্যাম্প পুটিবিলা জোড় পুকুরিয়ায় (বর্তমান পুটিবিলা উচ্চ বিদ্যালয় এলাকা) স্থানান্তরিত হয়। চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ও পূর্নগঠনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল।

১৯৭১ সালে সাতকানিয়া ও লোহাগাড়া অবিভক্ত এলাকা ছিল। স্বাধীনতার পূর্বে এ অবিভক্ত সাতকানিয়া থানা ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন সাতকানিয়ার ইব্রাহিম বিন খলিল (প্রাক্তন এমপি, যিনি বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের

ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ছিলেন) ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন লোহাগাড়ার আমিরাবাদের সৈয়দ আবদুল মাবুদ। থানা ছাত্রলীগের সম্পাদক হওয়ার সুবাদে তিনি ২৩ মার্চ ছাত্র-জনতার মিছিলের মাধ্যমে সাতকানিয়া থানার অভ্যন্তরে থাকা পাকিস্তানী পতাকা নামিয়ে মানচিত্র খচিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। তাঁর সাথে ছিলেন তৎকালীন সদর দক্ষিণ মহকুমা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক ওসমানুল হক ও ইব্রাহিম বিন খলিল। (দৈনিক পূর্বদেশ, ১৬ ডিসেম্বর ২০১৩)

লোহাগাড়ায় পাকিস্তানী হামলা শুরু হয় ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে পাকবাহিনী বাণিজ্যিক কেন্দ্র বটতলীতে বিমান হামলা চালায়। এতে লোহাগাড়া ইউনিয়নের বাচাঁ মুন্সি পাড়ার আলতাফ মিয়ার পুত্র আবদুস সালাম গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারায়। বিমান হামলায় পুড়ে যায় প্রায় ১৫/২০টি দোকান। বিমান হামলার পর লোহাগাড়া পাকবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে আসে। এপ্রিল মাসের শেষের দিকে পাকবাহিনী উত্তর আমিরাবাদের ব্রাহ্মন ও বণিক পাড়ায় হামলা করে বেশ কয়েকজনকে হত্যা করে এবং ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। আধুনগর, চুনতি ও কলাউজানসহ বিভিন্ন হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা অগ্নিসংযোগ করে। স্মৃতি প্রকাশনা সূত্র মতে, ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার খবর লোহাগাড়ায় ছড়িয়ে পড়লে এলাকার মুক্তিপাগল মানুষ স্বাধীনতার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন। পাক বাহিনীর আক্রমনকে প্রতিহত করার জন্য মুক্তিপাগল মানুষ সাতকানিয়া-লোহাগাড়ায় প্রতিরোধ ব্যারিকেড গড়ে তোলে। ১৬ এপ্রিল শুক্রবার জুমার নামাজের পর পাক বাহিনীর দুটি জঙ্গি বিমান লোহাগাড়ার বটতলী মোটর স্টেশনে হামলা করে। ওই সময়ে গুলিতে প্রাণ হারায় আবদুস ছালাম। পুড়ে যায় বটতলীর ১৫টি দোকান। পাক বাহিনী ২৯ এপ্রিল বৃহস্পতিবার আমিরাবাদের ব্রাহ্মন পাড়া ও বণিক পাড়ায় হামলা চালিয়ে প্রায় ১৫ জনকে হত্যা করে। ৫ জুন পাক বাহিনী লোহাগাড়া লম্বাদিঘীর পাড় এলাকায় হামলা চালিয়ে ১ জনকে হত্যা করে। ৭ ডিসেম্বর পাক বাহিনী চুনতি হিন্দু পাড়ার ১১ জনকে ধরে নিয়ে যায়। দোহাজারী নিয়ে পাক বাহিনী তাদের উপর গুলি চালালে ১০ জনের মৃত্যু হয়। (সূত্র স্মৃতি প্রকাশনা-২০০৯)

১৯৭১ সালের ১২ ডিসেম্বর ছিল চুনতি অপারেশনের দিন। কক্সবাজার থেকে আসা আজিজনগর এলাকায় অবস্থানকারী পাকবাহিনীরা বিকেলে চট্টগ্রাম শহরে যাত্রা করবে। এ খবর শুনে মুক্তিযোদ্ধারা পাক বাহিনীর দলটিকে মোকাবেলা করার জন্য জোড়পুকুরিয়া মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে খবর দেয়। ক্যাম্পের সহযোগিতায় চুনতি অপারেশনে মুক্তিযোদ্ধারা চুনতি পুলিশ ফাঁড়ি দখল করে সেখানে অবস্থান নেয়। মুক্তিযোদ্ধারা কক্সবাজার থেকে আসা পাকবাহিনীর দলকে ঘেরাও করে বন্দী করে। ঐদিন সকালে জোড়পুকুরিয়া মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পের কমান্ডার ক্যাপ্টেন শামসুর নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীরা কলাউজান ও চরম্বার কয়েকটি গ্রামে অপারেশন চালায়। পাকবাহিনী ও তাদের দোসরদের বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা অন্যান্য অঞ্চলে অপারেশনসহ সর্বশেষ চুনতি অপারেশনের ফলে লোহাগাড়া হানাদারমুক্ত হয়। এলাকায়-এলাকায়

স্বাধীনতা পক্ষের লোকজন আনন্দে মেতে ওঠেন। উড়াতে থাকে স্বাধীনতার লাল সবুজের পতাকা।

এদিকে স্বাধীনতার ৪৪ বছর পর আমিরাবাদের সুখছড়ি গ্রামে রত্না চক্রবর্তী নামে এক বীরঙ্গনার সন্ধান পান উপজেলা প্রশাসন। একই গ্রামে সন্ধান পায় ৫ জন শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থল। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহের কোন একদিন তাঁরা পাক বাহিনীর শিকার হন। (তথ্যসূত্র: প্রথম আলো, ২৮ মে ২০১৫)

২১ নভেম্বর বাংলাদেশ ও ভারতের সেনাধ্যক্ষদের নিয়ে গঠিত হয় যৌথ কমান্ড। এ কমান্ড যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে সমগ্র বাংলাদেশকে ৪(চার)টি যুদ্ধ এলাকায় ভাগ করে উভয় দেশের সেনারাহিনী বিন্যাস করে। উত্তর সেক্টর- রাজশাহী বিভাগ, ভারতীয় বাহিনীর ৩৩ কোর, মুক্তিবাহিনীর ৬ষ্ঠ-৭ম সেক্টর, দক্ষিণ সেক্টর- ফরিদপুর জেলাসহ খুলনা বিভাগ, ভারতীয় বাহিনীর ২য় কোর, মুক্তিবাহিনীর ৮ম-৯ম স্কেটর, মধ্য সেক্টর-ঢাকা বিভাগ, ভারতীয় বাহিনীর ১০১ কমিউনিকেশন জোন, মুক্তিবাহিনীর ১১ সেক্টর, জেড ফোর্স, পূর্ব সেক্টর- চট্টগ্রাম বিভাগ, ভারতীয় বাহিনীর ৪র্থ কোর, মুক্তিবাহিনীর ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম সেক্টর, কে ফোর্স, এস ফোর্স, আংশিক জেড ফোর্স। অধিনায়ক (ভারত ও বাংলাদেশ বাহিনীর অধিনায়ক) ছিলেন লে.জে. জগজিৎ সিং অরোরা।

১৬ ডিসেম্বর ভারত ও বাংলাদেশ বাহিনীর অধিনায়ক লে.জে. জগজিৎ সিং অরোরা বিশেষ সামরিক বিমানে ঢাকা আসেন। ঐদিন পাকবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জে. আমির আ: খান নিয়াজি ২.৪৫ মিনিটে আত্মসমর্পণের সম্মতিসূচক দলিলে স্বাক্ষর করেন। বিকেল ৪.৩১ মিনিটে আনুষ্ঠানিকভাবে লে.জে. জগজিৎ সিং অরোরা ও আ: খান নিয়াজি যৌথভাবে আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করেন। অতপর ১৬ ডিসেম্বর পাক সেনারা আত্মসমর্পণ করে। দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে ৩০ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে স্বাধীন হলো বাংলাদেশ। এদেশের মানুষ পেল লাল সূর্য খচিত বিজয়ের পতাকা। লোহাগাড়ায় স্বাধীনতার আন্দোলন সংগ্রামে এলাকার বহু মুক্তিযোদ্ধা অবদান রেখেছেন। ২০১৫ সালের আগষ্ট মাসের হিসাব মতে, লোহাগাড়ায় ৯৯ জন মুক্তিযোদ্ধা সরকারিভাবে তালিকাভুক্ত হয়েছেন। তাঁরা হলেন- রফিক দিদার, মোজাহের মিয়া, মো: নুরুল ইসলাম, সুভাষ চন্দ্র দত্ত, আব্দুল হামিদ বেঙ্গল, মো: পেঠান, অতিন্দ্র লাল নাথ, হৃদয় মোহন নাথ, বজেন্দ্র লাল দেবনাথ, নুরুল কবির, শ্রী পুলিন দে, কাজল কান্তি দাশ, আহমদ হোসেন, শ্যামা চরণ নাথ, রাখাল কৃষ্ণ দত্ত, তপন দাশ, আবদুস ছোবাহান, হাবিবুর রহমান, আবদুস শুক্কুর, মিলন চক্রবর্তী, দিনবন্ধু দেবনাথ, বাদল কান্তি সিকদার, সফিকুর রহমান সিকদার, আবদুল ছামাদ, বসন্ত কুমার দাশ, প্রাণহরি নাথ, মো: দেলোয়ার হোসেন, আকতার আহমদ সিকদার, মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী, মো: জসিম উদ্দীন, আবুল কালাম, ছিদ্দিক আহমদ, মো: কামাল উদ্দীন, আহমদ কবির, আহমদ হোসেন, মুহাম্মদ মিয়া, নজির আহমদ, আলী

আহমদ, গোলাম রশিদ, মো: এরশাদুল হক, কালাম উদ্দীন, আবুল হাসেম, কবির আহমদ, মোহাম্মদুল হক, আব্দুস ছালাম মাষ্টার, আব্দুস ছালাম, রাজা মিয়া, আব্দুস শুক্কুর রশিদী, মো: দুদু মিয়া, সিরাজুল হক, নুরুল ইসলাম, মমতাজুল ইসলাম, মো: জামাল উদ্দীন, মো: ইদ্রিস, নূর আহমদ, হরি রঞ্জন রুদ্র, ফেরদৌস আহমদ, মো: ইসহাক, বজল আহমদ, আব্দুল রশিদ, অনিল চন্দ্র নাথ, মমতাজুল ইসলাম, সন্তোষ কুমার বড়ুয়া, আব্দুল হাকিম চৌধুরী, ফয়েজ আহমদ, আ.ক.ম নুরুন্নবী চৌধুরী, ছিদ্দিক আহমদ, মৃত আছহাব মিয়া, মৃত ফজল করিম, শহীদ মো: ইউসুফ, মৃত আহমদু হক, মৃত রনজিত কুমার, মৃত শামসুল আলম, মৃত সুনিল কান্তি বিশ্বাস, মৃত মফিজুর রহমান, মৃত জহির আহমদ, মৃত বাবু সুকুমার দাশ, মৃত কবির আহমদ, মৃত এমএ করিম চৌধুরী, মৃত মো: জালাল উদ্দীন, মৃত জাকের আহমদ, মৃত হরি রঞ্জন নাথ, মৃত অধ্যাপক নাজিম উদ্দীন, মৃত সুভাষ মজুমদার, মৃত আলহাজ্ব মো: আবদুল গফুর, মৃত আলহাজ্ব গোলাম কাদের, মৃত জয়নাল আবেদীন, মৃত মো: সৈয়দ নূর, মৃত বশির আহমদ, মৃত সফিকুর রহমান, মৃত আবুল বশর, শহীদ সিরাজুল হক, মৃত হাবিবুর রহমান চৌধুরী, মৃত মনমোহন নাথ, মৃত আহম্মদ কবির, মৃত ডা. পরিতোষ কান্তি নাথ, মৃত আবুল কাশেম, মৃত শামসুল হক ও মৃত মো: ইউছুপ। বর্তমানে (আগষ্ট ২০১৫) উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আকতার আহমদ সিকদার ও ডেপুটি কমান্ডার আবদুল হামিদ বেঙ্গল।

তথ্যসূত্র:

১। বিজয়স্মৃতি, ১৬ ডিসেম্বর ২০১৫
২। দৈনিক পূর্বদেশ, ১৬ ডিসেম্বর ২০১৩ ইং।
৩। আঞ্জুমন-২০১০।
৪। ইতিহাসের খসড়া- মার্চ-এপ্রিল সংখ্যা ২০১৫।
৫। বাফা প্রকাশনা-২০১০।

মুক্তিযোদ্ধা ঘাঁটির স্মৃতিসৌধ

লোহাগাড়া উপজেলা সদর থেকে প্রায় ১৬ কিলোমিটার পূর্ব দক্ষিণে পাহাড়ি এলাকায় পুটিবিলা উচ্চ বিদ্যালয় ও মধ্য পুটিবিলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঝখানে ২০১৩ সালে নির্মিত হয়েছে মুক্তিযোদ্ধা ঘাঁটির স্মৃতিসৌধ। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি রক্ষার্থে ৬ বর্গফুট প্রশস্ত লাল রঙের বেদির উপর তৈরি হয়েছে ১৬ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট কালো স্তম্ভ। ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গ্রুপ কমান্ডার এ কে এম শামশুল ইসলামের নেতৃত্বে একদল মুক্তিযোদ্ধা এ ঘাঁটি স্থাপন করেন। এটি ১নং সেক্টরের অধিনে যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাঁটি ছিল। (তথ্যসূত্র: দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩ মার্চ ২০১৫ইং)।

মুক্তিযুদ্ধের বিজয় মেলা

মহান মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির অহংকার ও অলংকার। ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি আমাদের প্রিয় পতাকা। ১৬ ডিসেম্বর আমরা পেয়েছি নতুন এক মানচিত্র। জেগে ওঠেছিল নতুন এক দেশ, যার নাম বাংলাদেশ। এ দিনটি বাঙালির শ্রেষ্ঠ অর্জনের দিন। বিজয়ের আনন্দে প্রতিবছর আমরা এ দিনটিকে স্মরণ করি গভীর শ্রদ্ধার সাথে। দিবসটিকে ঘিরে দেশে প্রতিবছর পালিত হয় বিজয় মেলাসহ নানা বিজয় অনুষ্ঠান। চট্টগ্রাম শহরে কাজীর দেউড়ির আউটার স্টেডিয়ামে ১৯৮৯ সালে দেশে প্রথম বিজয় মেলার সূচনা হয়।

চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলায় প্রথম বিজয় মেলার সূচনা হয় ১৯৯৩ সালে। এই বিজয় মেলা উদ্বোধন করেন তৎকালীন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ্ব আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবু। এই সময়ে বিজয় মেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা এডভোকেট এ.কে.এম সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। মহাসচিব ছিলেন মোহাম্মদ আবু তালেব। ২০১০ সালে অনুষ্ঠিত হয় ১ম মুক্তিযোদ্ধা পরিবার মেলা। এ মেলায় পৃষ্ঠপোষক ও উপদেষ্টা ছিলেন সৈয়দ আবদুল মাবুদ। আহ্বায়ক ও সদস্য সচিব ছিলেন যুদ্ধকালীন কমান্ডার মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী ও সাংবাদিক নুরুল ইসলাম। তারপর ২০১১ সালে বড় আকারে মাস ব্যাপী বিজয় মেলার আয়োজন করে উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধারা। এই বিজয় মেলার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এড. একেএম সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। চেয়ারম্যান ও মহাসচিব ছিলেন মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী ও আকতার আহমদ সিকদার। এরপর থেকে প্রতি বছর মুক্তিযোদ্ধাদের আয়োজনে বিজয় মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

স্মৃতিসৌধ ও শহীদ মিনার

স্মৃতিসৌধ ও শহীদ মিনারের সাথে জাতীয় ঐতিহ্য ও অস্তিত্ব জড়িত। লোহাগাড়া উপজেলার কেন্দ্রীয় শহীদ স্মৃতিসৌধ নানা পটভূমিতে নির্মিত হয়। ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত এ উপজেলায় কেন্দ্রিয় শহীদ মিনার বা স্মৃতিসৌধ ছিল না। উপজেলার বিভিন্নস্থানে দেশপ্রেমিক মানুষ বেঞ্চ ও গাছের খুঁটি দিয়ে শহীদ মিনার বানিয়ে শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছে। জানা যায়, লোহাগাড়ায় শহীদ মিনার স্থাপনের দাবি ওঠে ১৯৯০ সালের ১৬ ডিসেম্বর। অবশেষে ১৯৯৪ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী উপজেলা পরিষদ চত্বরে কেন্দ্রিয় স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়। তারপর পর্যায়ক্রমে উপজেলার বিভিন্ন স্থানে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার নির্মিত হয়। (সুত্র- দৈনিক ইত্তেফাক, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১১)

দশম অধ্যায়

শিক্ষাক্ষেত্রে লোহাগাড়া

শিক্ষা-দীক্ষায় পিছিয়ে নেই লোহাগাড়া। বহু ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষাবিদ জন্ম হয়েছে। দেশের সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/প্রতিষ্ঠানে উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা রয়েছে যাঁদের জন্মস্থান এ উপজেলায়। ২০১৫ সালের তথ্যমতে, লোহাগাড়া উপজেলায় সাক্ষরতার হার ৬৫ ভাগ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫ বছর থেকে ২৪ বছর বয়সী শিক্ষার্থীর উপস্থিতির হার ৫৮.৮ ভাগ। যার মধ্যে পুরুষ ৫৯.৬% এবং মহিলা ৫৮.১%। উপজেলা ১০০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪৭টি স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা, ২৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৪টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২৩টি দাখিল মাদ্রাসা, ২টি আলীম মাদ্রাসা, ১টি কামিল মাদ্রাসা, ৩টি ভোকেশনাল প্রতিষ্ঠান, ৩টি ডিগ্রী কলেজ (২টিতে সম্মান কোর্সসহ) ও ২টি টেকনিক্যাল কলেজ রয়েছে। ইউনিয়নভিত্তিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে বড়হাতিয়া ৩টি, আধুনগরে ৪টি, আমিরাবাদে ৭টি, চুনতিতে ১টি, পদুয়ায় ৪টি, চরম্বায় ২টি, কলাউজানে ৩টি, পুটিবিলায় ২টি, চুনতিতে ১টি ও সদর ইউনিয়ন লোহাগাড়ায় ৪টি। অন্যদিকে বড়হাতিয়া ৯টি, আধুনগরে ৯টি, আমিরাবাদে ১৮টি, পদুয়ায় ১৪টি, চরম্বায় ১২টি, কলাউজানে ৯টি, পুটিবিলায় ৭টি, চুনতিতে ১৬টি ও সদর ইউনিয়ন লোহাগাড়ায় ১১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। উপজেলার পূর্ব পুটিবিলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত শ্রেণি কার্যক্রম চালু রয়েছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্ব-স্ব এলাকায় শিক্ষা প্রসারে ভূমিকা রাখছে এলাকার অধিকাংশ লোক ব্যবসায়ী ও প্রবাসী হওয়ায় ছেলে-মেয়েদের শিক্ষালাভে মায়েরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ২০১৫ সালের হিসাবে উপজেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজে প্রতি বছর ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক বিভাগে প্রচুর শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করলেও বিজ্ঞানে শিক্ষার্থী অত্যন্ত কম। উপজেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ব্যবসায় শিক্ষা-শাখায় ৫০%, মানবিক বিভাগে ৪০% ও বিজ্ঞানে ১০% শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করে থাকে। কলেজে ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় ৫৬%, মানবিকে ৪০% এবং বিজ্ঞানে মাত্র ৪% শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করে থাকে। উপজেলার ৯টি ইউনিয়নে সাক্ষরতার হার একেক অঞ্চলে একেক রকম। বড়হাতিয়া ইউনিয়নে সাক্ষরতার হার ৬৫ ভাগ, আমিরাবাদে ৭০ ভাগ, পদুয়া ৬০ ভাগ, চরম্বায় ৬৫ ভাগ, কলাউজানে ৬০ ভাগ, সদর ইউনিয়ন লোহাগাড়ায় ৬৫ ভাগ, পুটিবিলায় ৫৫ ভাগ, চুনতিতে ৭৫ ভাগ এবং আধুনগরে ৬০ ভাগ। (সূত্র: ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র)

নারী শিক্ষা

স্বাধীনতার পূর্বে এ অঞ্চলে নারীদের স্বাচ্ছন্দ্যে শিক্ষা গ্রহণে নানা প্রতিকূলতা ছিল। অন্যদিকে অন্য উপজেলার চেয়ে এ উপজেলার নারীদের অবস্থান একটু ভিন্ন। সিপিডি ইউএফপিএ এর মতে চট্টগ্রাম জেলা নিম্নমাত্রায় লিঙ্গীয় অসামঞ্জস্যপূর্ণ এলাকা। তাই স্বাধীনতার পূর্বে এ উপজেলায় কম বয়সী নারীদের বিবাহ হত। প্রথাগত শিক্ষা ও কঠোর

ধর্মীয় অনুশাসন ইত্যাদির কারণে এলাকার নারীদের চাকরি ও সেবা খাতে অংশগ্রহণ কমেছে। স্বাধীনতা পরবর্তী শিক্ষার ক্রমবিস্তার, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমের ফলে কর্মক্ষেত্রে এলাকার নারীদের অংশগ্রহণ বেড়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে এ উপজেলার নারীরা এগিয়ে যাচ্ছে। বিবিএস ২০১১ সালের হিসাব অনুযায়ী এ উপজেলার নারীদের সাক্ষরতার হার ছিল ৪৮.৬ ভাগ। বর্তমানে এ হার আরো বেশি। ৫ বছর থেকে ২৪ বছর বয়সী বিদ্যালয়ের উপস্থিতির ক্ষেত্রে নারীদের হার ৫৮.১ ভাগ। উপজেলার স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসাগুলোতে মোট শিক্ষার্থীর অর্ধেকেই নারী। উপজেলার নারীরা এখন ব্যাংক-বীমা, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও এনজিও-তে চাকরি করছে। তবে উপজেলার ঘরের ভেতর-বাইরে নারীরা প্রতিনিয়ত নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার।

লোহাগাড়ার ক্রীড়াঙ্গন

লোহাগাড়ার ক্রীড়াঙ্গন অতীতে বেশ সমৃদ্ধ ছিল। স্বাধীনতা পূর্ব ও পরবর্তী সময়ে উপজেলার প্রধান খেলা ছিল ফুটবল ও ভলিবল। গ্রামীণ এলাকায় হত হাডুডু, দাঁড়িয়াবান্দা, বলিখেলা, কানামাছি, ডাংগুলি ইত্যাদি। উপজেলার ২/১টি স্কুল মাঠে চলত ফুটবল খেলার আয়োজন। অনুষ্ঠিত হত নানা টুর্ণামেন্ট। ফুটবল ও ভলিবল খেলোয়াড়রা বাঁশখালী, সাতকানিয়া, পটিয়া ছাড়াও জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করত। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের চেয়ে লোহাগাড়ার ক্রীড়াঙ্গন অতীতে বেশ সমৃদ্ধ ছিল। অবিভক্ত সাতকানিয়ার ভলিবলে শাহারিয়া চৌধুরী, মোঃ আয়ুব, আবদুল খালেক, শহিদ উল্লাহ বাহার ও এস.কে শামসুল আলমসহ অনেক ক্রীড়াবিদ স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সুনামের সহিত খেলেছেন। অপরদিকে ফুটবলে ওমর আলী, মঞ্জুর, আবদুল মালেক, মোঃ রফিক, মিয়া মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন ও মিনহাজ স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে খেলেছেন।

অন্যদিকে গ্রামীণ এলাকায় রাতে চাঁদের আলোতে বিলে বা মাঠে সারারাত দাঁড়িয়াবান্দা ও হা-ডু-ডু খেলা চলত। "বদল বদল ছিরি বদল" স্লোগানে খেলোয়াড়দের মাঠে ডাকা হত। পুরুষের পাশাপাশি মহিলারাও দাঁড়িয়াবান্দা খেলত। দেশে উপজেলা পরিষদ প্রবর্তনের পর ছাত্র-যুব সমাজের মধ্যে খেলাধুলার সুযোগ বেড়ে যায়। গঠিত হয় উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা। উপজেলা নির্বাহী অফিসার থাকেন ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি। ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে ফুটবল, ভলিবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টনসহ বিভিন্ন খেলাধুলার আয়োজন হয়। অনুশীলনের মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয় ভাল খেলোয়াড়। যার ফলে ২০১৪ সালে চট্টগ্রাম আন্তঃজেলা ফুটবল টুর্ণামেন্টে লোহাগাড়া ফুটবল একাদশ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। ওই সময়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ ফিজনূর রহমান উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি হিসেবে উপজেলার আগ্রহী ফুটবল খেলোয়াড়দেরকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন।

অর্থনৈতিক জোন লোহাগাড়া

লোহাগাড়া অর্থনৈতিক জোন হিসেবে দেশে বেশ পরিচিতি রয়েছে। যেমন:

কৃষি জমি

২০১০-২০১১ সালের ভূমি জরীপের তথ্যমতে, উপজেলায় মোট চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ৯,৩০৫ হেক্টর। বড়হাতিয়া ইউনিয়নে ৯২৫ হেক্টর, আমিরাবাদে ৯৯৫ হেক্টর, পদুয়ায় ১৩৫০ হেক্টর, চরম্বায় ১৩৭০ হেক্টর, কলাউজানে ৯০৫ হেক্টর, সদর ইউনিয়ন লোহাগাড়ায় ৬৬৫ হেক্টর, পুটিবিলায় ১৩৫৫ হেক্টর, চুনতিতে ১২৯০ হেক্টর ও আধুনগরে ৪৫০ হেক্টর। উক্ত ইউনিয়নের কৃষি জমিতে ধানসহ বিভিন্ন ফসলের চাষ হয়। উপজেলায় মোট ৩৩৪৫৪ টি কৃষি পরিবার রয়েছে। কৃষি জমিতে বাড়িঘরসহ বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণের কারণে প্রতি বছর কৃষি জমির শতকরা ১ ভাগ করে কমে যাচ্ছে।

পানি ও মৎস্য সম্পদ

উপজেলায় পানির উৎস হচ্ছে খাল, পুকুর ও পাহাড়ি ছড়া। পাহাড়ি ছড়াগুলো ছোট-বড় পাহাড় হতে উৎপত্তি হয়ে ডলু, টংকা, হাঙ্গর, রাতারসহ অন্যান্য খালে পড়েছে। গুরুত্বপূর্ণ খাল টংকা ও হাঙ্গর উপজেলার মধ্য দিয়ে এবং ডলু খাল উপজেলার মাঝামাঝি দক্ষিণ দিকে উত্তরে প্রবাহিত হয়ে সাতকানিয়া উপজেলা হয়ে কর্ণফুলী নদীতে পড়েছে। শুষ্ক মৌসুমে উপজেলার অর্ধেক খাল-ছড়া শুকিয়ে যায়। উপজেলায় পুকুর রয়েছে ১৯৭০টি। যার মধ্যে ১৮৭৮টি আবাদী পুকুর ও ৭৭টি অবনযোগ্য পুকুর। উপজেলার প্রায় শতকরা ১০ ভাগ লোক মৎস্য চাষে জড়িত। প্রধান প্রধান মৎস্যগুলো হচ্ছে তেলাপিয়া, পাঙ্গাস, রুই, কাতলা ও মৃগেল ইত্যাদি। ২০১৪ সালের হিসাব অনুযায়ী উপজেলায় মোট জলাশয়ের পরিমাণ ১৬৮৮.৯৩ হেক্টর। মৎস্য চাষ হয় ৭৭৪.৯২ হেক্টরে।

যুব কার্যক্রম

উপজেলায় যুব কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৯৭ সালের জুলাই মাস থেকে। উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের হিসাব (২০১৫) মতে, উপজেলায় তালিকাভুক্ত যুব সংগঠনের সংখ্যা ৮৫টি। এ অধিদপ্তর উপজেলার পুরুষ ও মহিলাদেরকে মৎস্য চাষ, ছাগল পালন, নেটওয়ার্কিং জোরদারকরণ প্রকল্প ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্মনির্ভরশীল কর্মী হিসেবে গড়ে তুলছে।

পেশা

উপজেলা মোট জনসংখ্যার ৩২.৩৯% লোক কৃষি কাজ করে। ২.৮% লোক মৎস্য ও গবাদি পশু পালনে, ১৪.৯৯% লোক কৃষি শ্রমিক, ৪.৪৭% লোক বেতনভুক্ত শ্রমিক, ১.৩৫% লোক শিল্প, ৩.৫৩% লোক পরিবহন ব্যবসায়, ১৫.৬৪% লোক ব্যবসা-

বাণিজ্যে, ১০.৭৭% লোক চাকরিতে এবং ১৩.৪৬% লোক অন্যান্য কাজে জড়িত আছে। (সূত্রঃ বাংলাপিডিয়া ২০০৭)। এছাড়া উপজেলা ৩% লোক সমবায়ের সাথে জড়িত। অন্যদিকে উপজেলা মৎস্যজীবির সংখ্যা ২৭০ জন এবং জেলে পরিবারের সংখ্যা প্রায় ৫০০ জন।

অভিবাসন

উপজেলার অধিকাংশ মানুষ ব্যবসায়ী ও প্রবাসী। উপজেলায় জীবন যাত্রার মান ভাল। ফলে কাজের সুযোগে আশ-পাশের এলাকা বাঁশখালী, চকরিয়া ও কক্সবাজার থেকে অনেক লোক এখানে কাজের জন্য আসে। উত্তরবঙ্গের রংপুরসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে কাজের জন্য লোক এসে থাকে।

হাট-বাজার

২০১৫ সালের হিসাব মতে, উপজেলা ১৯টি হাট-বাজার রয়েছে। সরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত গ্রোথ সেন্টার রয়েছে ৫টি। এগুলো হচ্ছে পদুয়া তেওয়ারী হাট, লোহাগাড়া দরবেশ হাট, কলাউজান কানুরাম বাজার, আধুনগর খান হাট ও পুটিবিলা এম.চর হাট।

বিদ্যুৎ

২০১৫ সালের জুন মাসের হিসাব মতে, উপজেলার অধিকাংশ গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ আছে। বর্তমানে উপজেলায় বিদ্যুৎগ্রাহকের সংখ্যা ৩৫ হাজার ৬৫৪ জন। উপজেলায় দৈনিক বিদ্যুৎ চাহিদা ১৩ মেগাওয়াট। উপজেলার শতকরা ৮৫.০৯ ভাগ বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ আছে। প্রতি বছর বাড়ছে বিদ্যুৎ সংযোগ।

প্রাণি সম্পদ

লোহাগাড়া উপজেলা গরু, মহিষ, হাঁস-মুরগি পালনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় এলাকা। উপজেলা প্রাণি সম্পদ কার্যালয়ের ২০১৫ সালের হিসাবমতে, এ উপজেলায় শতকরা ২৫ ভাগ লোক গরু-মহিষ ও ৫০ ভাগ লোক হাঁস-মুরগি পালন করে থাকে। বছরে উক্ত সম্পদ হতে শতকরা ৫০ ভাগ আয় হয়। উপজেলার বিভিন্ন স্থানে ১২টি দুগ্ধ খামার, ১৪টি ছাগলের খামার, ৩টি ভেড়ার খামার, ১টি হাঁসের খামার ও ৫৪৮টি মুরগি খামার রয়েছে। ২০১৪ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী উপজেলায় ৪৭,৪৪৮টি গরু, ৩৭৯টি মহিষ, ২৫,৮৮০টি ছাগল, ১১০টি ভেড়া, ৭৭,৩৩৮টি হাঁস, ৯,৩০৮১৫ টি মুরগি, ১২৩০০টি কবুতর ও ৬১২০টি কোয়েল পাখি রয়েছে। উক্ত প্রাণি সম্পদ হতে বছরে প্রায় ৭৯২০ টন মাংস উৎপাদিত হয়। আয় হয় ১৫৯ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা।

কুটির শিল্প

উপজেলার বিভিন্ন জনপদে একসময় শিল্পীরা প্রচুর কুটির শিল্প সামগ্রী তৈরি করত। কালের বিবর্তনে কুটির শিল্প সামগ্রী হারিয়ে যেতে বসেছে। কুটির শিল্প সামগ্রীর মধ্যে মৃৎশিল্প, বাঁশ-বেত শিল্প, পাটি ও চাটাই শিল্প এবং তাঁত শিল্প উল্লেখযোগ্য। উপজেলার বড়হাতিয়া কুমিরাঘোনার মৃৎশিল্প, আধুনগর সাতগড়ের পাটি-চাটাই শিল্প, পুটিবিলার তাঁত শিল্প, চুনতি পাটিয়াল পাড়ার পাটি, আমিরাবাদের তাঁত শিল্প, আমিরাবাদ চট্টলা পাড়ার বাঁশ-বেত শিল্প, কলাউজানের শীতল পাটি শিল্প দেশে-বিদেশে যথেষ্ট চাহিদা। কুটির শিল্পে চাহিদা এখন আর নেই। অনুসন্ধানে জানা গেছে, উপজেলা প্রায় ২ হাজার পরিবার উক্ত কুটির শিল্পের সাথে সরাসরি জড়িত। পুঁজির অভাবে কুটির শিল্পীরা আর ওইসব শিল্পে তেমন জড়িত নেই।

ব্যবসা-বাণিজ্য

উপজেলার প্রাণকেন্দ্র বটতলী শহরে ব্যবসায়ী ও প্রবাসীদের টাকায় ২০টির অধিক বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। দেশ-বিদেশে এমন কোন জায়গা নেই যেখানে লোহাগাড়ার মানুষ নেই। কথিত আছে, পাতালপুরীতেও লোহাগাড়ার মানুষ ব্যবসা করে। ব্যবসা ক্ষেত্রে এখানকার মানুষের যথেষ্ট সুনাম আছে। মোস্তফা গ্রুপ অব ইন্ডাষ্ট্রিজ ও নোমান গ্রুপের মত দেশখ্যাত খ্যাত বহু শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক এখানে।

মানব সম্পদ

উপজেলার কৃষক, শ্রমিক, দিনমজুর, চাকুরিজীবি, ব্যবসায়ী, প্রবাসী, শিক্ষক, মহান ব্যক্তিত্ব, মনীষী, লেখক, ডাক্তার, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এখানকার মানব সম্পদ। জেলে, কুমার-কামার ও জনপ্রতিনিধিরাও কোন অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রত্যেকেই স্ব-স্ব অবস্থান থেকে এলাকার উন্নয়নে ভূমিকা রাখছেন। ঐতিহাসিক পটভূমিতে এদের অবদান অনস্বীকার্য। উল্লেখ করা যায়, এ জনপদের সার্বিক কর্মকান্ডে এরা মাইলফলক সৃষ্টি করেছে। রাজনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি, কৃষি ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে এদের অবদান ইতিবাচক। এ ছাড়াও এ অঞ্চলে জন্ম নিয়েছে বহু পীর আউলিয়া, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি হযরত শাহ সাহেব কেবলা চুনতি, হযরত পেঠান শাহ (রহ:), হযরত আবদুল জব্বার (রহ:), হযরত আবদুল খালেক শাহ (রহ:), হযরত মাওলানা ছমি উদ্দিন শাহ, হযরত মাওলানা আবদু ছমদ, হযরত সৈয়দ শাহসহ বহু বুর্জুগানে দ্বীনকে। লোহাগাড়া অঞ্চলের ইতিহাস-ঐতিহ্য, বিশাল প্রাকৃতিক সম্পদ ও পীর আউলিয়ার চারণভূমি, রাজনৈতিক-ব্যবসায়িক নেতৃবৃন্দসহ জনগণ এ অঞ্চলের অহংকার। লেখকের মতে, লোহাগাড়া মানুষের ব্যবসায়িক হাত রয়েছে। যার ফলে উপজেলার ৪০% লোক ব্যবসায়ী ও ৩০% লোক প্রবাসী। ব্যবসায়ীরা শুধু এখানে নয়, দেশ পেরিয়ে বিদেশেও খ্যাতি অর্জন করেছে। তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই

যে, উপজেলার সিংহভাগ উন্নয়নের ক্ষেত্রে সংসদ সদস্য, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, ইউপি চেয়ারম্যান-মেম্বার ও সরকারের আমলারা জড়িত।

জনপ্রতিনিধি (সংসদ সদস্য)

সাতকানিয়া ও লোহাগাড়া দুটি উপজেলা নিয়ে চট্টগ্রাম-১৫ সংসদীয় আসন গঠিত। ২০১৩ সাল পর্যন্ত এ আসনটি চট্টগ্রাম-১৪ নামে পরিচিত ছিল। এ আসনের সংসদ সদস্যরা হলেন- ১৯৭৩ সালে আওয়ামী লীগের এম ছিদ্দিক, ১৯৭৯ সালে বিএনপির মোস্তাক আহমদ চৌধুরী, ১৯৮৬ ও ১৯৮৮ সালে জাতীয় পার্টির ইব্রাহিম বিন খলিল। ১৯৯১ সালে জামায়াতে ইসলামীর আলহাজ্ব শাহজাহান চৌধুরী। ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী ও ১৯৯৬ সালের ১২ জুনের নির্বাচনে বিএনপির কর্নেল (অব:) ড. অলি আহমদ, ২০০১ সালে জামায়াত ইসলামীর আলহাজ্ব শাহজাহান চৌধুরী, ২০০৮ সালে জামায়াতে ইসলামীর আ.ন.ম সামশুল ইসলাম এবং ২০১৪ সালে আওয়ামী লীগের প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী।

উপজেলা চেয়ারম্যান

লোহাগাড়া এক সময় সাতকানিয়ার অধীনে ছিল। ১৯৮১ সালে লোহাগাড়া আলাদা থানায় রূপান্তরিত হয়। ১৯৮৫ সালে উন্নীত হয় উপজেলায়। এ উপজেলার প্রথম উপজেলা চেয়ারম্যান ছিলেন আলহাজ্ব মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী। দ্বিতীয় উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন জিয়াউল হক চৌধুরী বাবুল (২০০৯ সাল থেকে ২০১৪ সাল)। তৃতীয় উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এডভোকেট ফরিদ উদ্দীন খান (২০১৪ সাল থেকে)।

একাদশ অধ্যায়

উপজেলার
বৌদ্ধ জনপদ ও ঐতিহ্য

Chunati.com
Pioneer in village based website

মানুষ নিম্নতর জীব থেকে ধাপে ধাপে উন্নতর জীবের স্তরে এসে পৌছেছে। মানুষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব কারণ সমস্ত জীব-জগতের মধ্যে যে সকলের চেয়ে বেশি যোগ্যতম।

- চার্লস ডারউইন

উপজেলার বৌদ্ধ জনপদ ও ঐতিহ্য

লোহাগাড়া উপজেলায় ২১টি বৌদ্ধ জনপদ রয়েছে। এগুলো নারিশ্চা, চুনতি, পুটিবিলা, পহরচান্দা, ছেদিরপুনি, আধুনগর, খুসাঙ্গের পাড়া, বড়হাতিয়া, কলাউজান, আদারচর, লক্ষণের খীল, মাইজবিলা, বিবিরবিলা ও পদুয়া এলাকায়। এসব জনপদে বৌদ্ধ সভ্যতার নানা ঐতিহ্য, প্রাচীন স্থাপত্য ও নিদর্শন রয়েছে। বৌদ্ধ সভ্যতার এসব নিদর্শন কালের সাক্ষী বহন করে। প্রফেসর ড. সুকোমল বড়ুয়ার মতে লোহাগাড়ার বৌদ্ধ পল্লীর অবস্থান ও তাদের অতীত-বর্তমান ইতিহাস অতি সমৃদ্ধ ও গৌরবোজ্জ্বল। চর্তুদিকে ছোট-বড় পাহাড়, বন-অরণ্য বেষ্টিত এ জনপদটি প্রাকৃতিক, কৃষিজ, খনিজ, বনজ ও অন্যান্য উপাদানে ছিল বেশ সমৃদ্ধ। বৌদ্ধরা ইতিহাস ও ঐতিহ্যের আদি জনগোষ্ঠী। এদেশের বৌদ্ধরা নানা নামে ও পদবীতে সংজ্ঞায়িত। যেমন- বড়ুয়া, মুৎসুদ্দী, সিংহ, তালুকদার, চৌধুরী, সিকদার, রাজা, বাহাদুর, মহাজন ও পাল ইত্যাদি। বৌদ্ধদের ইতিহাস একটি স্বর্ণযুগের ইতিহাস। তাদের মধ্যে আছে নানা কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্পকলাসহ বৌদ্ধ সভ্যতার সব উপাদান। যেগুলো এদেশের মাটির নীচে ও উপরে দৃশ্যমান। ইতোমধ্যে বৌদ্ধ সভ্যতার অনেক উপাদান খননের ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে। তাই প্রাচীন সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও নির্দশনের গৌরবোজ্জ্বল নাম হল বৌদ্ধভূমি। সেই বৌদ্ধভূমির নানা প্রাচীন স্থাপত্য, নিদর্শন ও ঐতিহ্য দেশের আনাচে-কানাচে রয়েছে।

আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ তাঁর "ইসলামাবাদ" গ্রন্থে বৌদ্ধরা এদেশের আদি অধিবাসী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বড়ুয়া, বৌদ্ধরা, আরাকানের মগ সম্প্রদায়ভূক্ত। আরাকানীরা দুই শতাব্দীকাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম শাসন করেছেন। পঞ্চাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রাজা জয়চন্দ্র চক্রশালায় আরাকান রাজ্যের প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁর সহায়তায় চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে বহু বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পাল যুগে বৌদ্ধ রাজা, মহারাজা, সামন্তরাজাদের সহায়তায় চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে অসংখ্য চৈত্য নির্মিত হয়েছিল। যা, বৌদ্ধ ধর্মের কৃষ্টি-ঐতিহ্য বহন করে।

লোহাগাড়া অঞ্চলে বৌদ্ধরা জনসংখ্যায় বেশি না হলেও এ অঞ্চলের আদি অধিবাসী ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মগরা। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী হতে পাল যুগ এবং আরাকান রাজাশাসন পর্যন্ত এ অঞ্চলের বৌদ্ধ কৃষ্টি, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তার করেছে। বৌদ্ধদের উৎপত্তি, আগমন, প্রাচীন স্থাপত্য, নিদর্শন ও সংস্কৃতি ইত্যাদির সাথে যেমন চট্টগ্রামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য জড়িত তেমন অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িত লোহাগাড়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য।

লোহাগাড়া উপজেলার বৌদ্ধ জনপদসহ বিভিন্ন এলাকায় এমন কতগুলো প্রাচীন নিদর্শন কিংবা স্থাপনা রয়েছে যেগুলোর নামের মধ্যে মগ রাজা বা প্রতিনিধির নাম জড়িত। যেমন পুটিবিলা কংসদীঘি একজন বৌদ্ধ প্রতিনিধির নামে হয়েছে। পুটিবিলার কুলাংছড়া, পলং ছড়া ইত্যাদি নামের সাথেও বৌদ্ধ শাসক বা জনপ্রতিনিধিদের নাম জড়িত। উল্লেখিত প্রাচীন নিদর্শনের দৃশ্যপট পাল্টে গেলেও

কালের সাক্ষী হিসেবে লোকমুখে বিরাজমান। অপরদিকে, উপজেলার অনেক জনপদ আছে যা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর মগ শাসক কিংবা প্রতিনিধিদের নামে। উদাহরণস্বরূপ বড়হাতিয়ার খুসাঙ্গের পাড়া, আধুনগরের মছদিয়া, পদুয়ার ঠাকুরদিঘী ইত্যাদি। ঐতিহাসিকদের ধারণা চট্টগ্রাম অঞ্চলে বহু সংখ্যক বৌদ্ধ চৈত্য ছিল। এই চৈত্য থেকে চট্টগ্রাম নামকরণ হয়েছে। পরবর্তীতে চট্টগ্রামের বিশেষ করে দক্ষিণ চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় ঐতিহ্য ও নিদর্শন সৃষ্টি হয়েছে। অষ্টাদশ বা ঊনবিংশ শতক থেকে চট্টগ্রামের গ্রামগুলো তিনভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। সাঙ্গু নদীর দক্ষিণাঞ্চলের গ্রামগুলোকে দক্ষিণাকুল বলা হত। এই দক্ষিণকুলের মধ্যে লোহাগাড়ার মছদিয়া, আধুনগর, বড়হাতিয়া ছিল। এছাড়াও এই কুলের প্রতিটি বৌদ্ধ জনপদে বৌদ্ধ বিহার ও ভিক্ষু ছিল। উপরিউক্ত আলোচনা এবং এই উপজেলার বৌদ্ধ জনপদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য দেখে বুঝা যায় যে, লোহাগাড়ার আদি অধিবাসী ছিল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মগরা।

ভৌগলিক ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যমন্ডিত অঞ্চল লোহাগাড়া

ভৌগলিক ও প্রাকৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে লোহাগাড়া হবে দেশের অন্যতম সুন্দর ও মনোরম এলাকা। অন্যদিকে উপজেলার বুক দিয়ে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক চলে যাওয়ায় সৌন্দর্য্যকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলেছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের জরিপ মতে (২০১০-২০১১) উপজেলার কলাউজান ও আমিরাবাদ কৃষিজোন, বড়হাতিয়া, চরম্বা, চুনতি, পদুয়া ও পুটিবিলা পাহাড়বেষ্টিত বন এলাকা হিসেবে পরিচিত। আধুনগরে ১৮৫১.৮২ হেক্টর ভূমির মধ্যে বনভূমির পরিমাণ ১০৫০.১৭ হেক্টর, বড়হাতিয়ায় ৩০৫৫.৮৭ হেক্টর ভূমির মধ্যে বনভূমি ১৩৯৫.৬২ হেক্টর, চরম্বায় ৩২৪৯.৮০ হেক্টর ভূমির মধ্যে ১০১১.৩৪ হেক্টর বনভূমি, চুনতিতে ৬১২৪.৭০ হেক্টর ভূমির মধ্যে বনভূমির পরিমাণ ৩৩৩৪.৯০ হেক্টর, কলাউজানে ১৬১৭.৮১ হেক্টর ভূমির মধ্যে ৯৭.২৩ হেক্টর বনভূমি, পদুয়ায় ২৮৮৮.২৬ হেক্টর ভূমির মধ্যে ৫৮৫.৫০ হেক্টর বনভূমি এবং পুটিবিলায় ৪০২১.০৫ হেক্টর ভূমির মধ্যে বনভূমি ১৯৮৯.৪৭ হেক্টর। বিবিএস ২০১১ সালের তথ্যমতে, উপজেলায় ২৫৮.৮৭ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের মধ্যে ৭৫.৯২ বর্গ কিলোমিটার বনভূমি। এ অঞ্চলের বিস্তৃত সবুজ পাহাড় ও পাহাড়ের গাছ-গাছালি যেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের আধার। প্রকৃতি যেন একে অপরূপ সৌন্দর্য্যে ঢেলে সাজিয়েছে। এ অঞ্চলে এতো সবুজের সমারোহ ও সৌন্দর্য্য দেশে আরেকটি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। উপজেলার অভ্যন্তরে প্রবাহিত ডলু, টংকা, হাঙ্গরসহ প্রায় ১৩টি খাল এ এলাকার ইউনিয়নসমূহকে সৌন্দর্য্যের যাদুঘরে পরিণত করেছে। বন, পাহাড়, খাল-বিলসহ প্রকৃতির প্রায় সব উপাদান এ অঞ্চলে রয়েছে। উপজেলার চুনতি ও চুনতি বন্যপ্রাণি অভয়ারণ্য, পদুয়া ফরেষ্ট রেঞ্জ এলাকা, পাহাড় বেষ্টিত ইউনিয়নসমূহ প্রাকৃতিক পর্যটন কেন্দ্র এবং উপজেলার জীবন্ত প্রকৃতি। পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য উপজেলার প্রকৃতিই যথেষ্ট। শুধু প্রয়োজন লোহাগাড়াকে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে ঘোষণা করা এবং পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা।

ভৌগলিকভাবে উপজেলার চর্তুদিকে পাহাড়। মনে হবে যেন, একটি মাঠের চারিদিকে সাজানো গ্যালারী। গ্যালারীতে বসে দর্শকরা মাঠের খেলাধুলার আনন্দ উপভোগ করছেন। মহান আল্লাহর দান এ উপজেলার সৌন্দর্য্য অনন্য। যা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।

লোহাগাড়ার প্রাকৃতিক দৃশ্য ও চিত্র প্রতিটি অনুভূতি প্রবণ হৃদয়কে সবসময় নাড়া দেবে। ভোর বেলায় পাখির কল-কাকলি এবং গাছের শাখা থেকে শাখায় পাখির ছুটাছুটি এবং পাখির নানান সুরের ডাক-কিচির-মিচির শব্দ কতই না অপূর্ব। এই উপজেলার জীবন প্রকৃতি যুগ যুগ ধরে আকর্ষণ করেছে বিভিন্ন জাতিদের। আকর্ষণ করেছে পীর আউলিয়া-দরবেশ ও ধ্যানী সন্ন্যাসী সাধকের। এখানে গড়ে তুলেছেন তাঁরা আবাস। উক্ত অনুসারীরা যুগ যুগ ধরে ইবাদত-বন্দেগী, সাধনা ও উপাসনায় মগ্ন থাকেন। হযরত শাহপীর (রহ:), হযরত পেঠান শাহ (রহ:), হযরত শাহ সাহেব কেবলা চুনতিসহ অনেক পীর আউলিয়া দরবেশের অনুসারীদের আস্তানা রয়েছে এখানে। অন্যদিকে এখানে রয়েছে হিন্দুদের মন্দির ও বৌদ্ধদের ধর্মীয় বিহার। মুসলিম, হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে অকল্পনীয় মিলমিশ দেশের উজ্জল দৃষ্টান্ত।

লোহাগাড়া দেশে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের আধার, শান্তি ও সম্প্রীতির জনপদ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। এত বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও পর্যটনবিহীন রয়েছে এ উপজেলা। অথচ এলাকায় পর্যটক প্রেমিকরা ব্যক্তিগতভাবে এখানে পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তুলেছে। সরকারি উদ্যোগের অভাবে প্রাকৃতিক ও পর্যটন সম্ভাবনাময় এ উপজেলার সম্ভাবনা বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

খাল ও ছড়ার দেশ লোহাগাড়া

লোহাগাড়া উপজেলার অভ্যন্তরে বেশ কয়েকটি খাল ও ছড়া প্রবাহিত হয়েছে। এসব খাল ও ছড়া ইউনিয়নসমূহকে বিভক্তসহ সৃজিত করেছে। খাল ও ছড়ার মধ্যে ডলু, টংকা, হাঙ্গর, চাম্বি, হাতিয়ার, জাংছড়ি, রাতার, কুলপাগলি, সরই, থমথমিয়া, বোয়ালিয়া, ধুইল্যা, গুইল্যা উল্লেখযোগ্য।

ডলু, টংকা ও হাঙ্গর এ তিনটি উপজেলার অন্যতম খাল। এ খালগুলো পার্বত্য চট্টগ্রামের লামা থেকে উৎপত্তি হয়েছে। অন্যান্য খাল ও ছড়াগুলো উপজেলার অভ্যন্তরে উৎপত্তি। এসব খাল-ছড়া উপজেলার অভ্যন্তরে আঁকা-বাঁকা পথে প্রবাহিত হয়ে এলাকার সৌন্দর্য্যকে বৃদ্ধি করেছে। খাল-ছড়াগুলো স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ভরাট হয়ে গেছে। জেলে পরিবারগুলো আগের মত আর তেমন আয়-রোজগার করতে পারে না। বিবিএস-২০১১ এর তথ্যমতে, এ উপজেলায় খালের সংখ্যা ১১টি। অন্য তথ্যমতে এখানে ১৩টির অধিক খাল রয়েছে। ছড়া রয়েছে বহু। মৎস্যজীবির সংখ্যা প্রায় ২৭০ জন এবং জেলে পরিবারের সংখ্যা প্রায় ৫০০ জন। এসব জেলে পরিবারগুলো কর্মসংস্থান পাল্টিয়ে কোনমতে জীবন-যাপন করছে। খাল ও ছড়ার দেশ এ লোহাগাড়া খাল-ছড়াবিহীন হতে চলেছে।

অন্যদিকে উপজেলার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ খাল হাতিয়ার বাঁশখালীর পাহাড় থেকে উৎপত্তি। স্বাধীনতা উত্তর ডলু, টংকা, হাঙ্গর ও হাতিয়ার খাল দিয়ে নৌকায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও যাতায়াত হত। এ খালগুলোর যাতায়াতের মাধ্যমে এ অঞ্চলের কর্মধারাকে নিয়ন্ত্রণ করা হত। বাঁশের ভেলায় পণ্য বোঝাই হয়ে বিভিন্ন স্থানে চলে যেত। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চলের বাঁশ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি খাল দিয়ে বিভিন্ন স্থানে যেত। খাল থেকে মৎস্য আহরণ করে এলাকার শত শত জেলে পরিবার ও এলাকাবাসী জীবিকা নির্বাহ করত। লোহাগাড়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্যমন্ডিত উক্ত খাল-ছড়াগুলো কালের বিবর্তনে হারিয়ে যেতে বসেছে।

বড়হাতিয়া ইউনিয়নে খাল-ছড়ার মধ্যে রয়েছে-হাতিয়ার, সোনাইছড়ি, থমথমিয়া, বদর ছড়া, কুলপাগলি, গজাইল্যার ছড়া, জঙ্গলীর ছড়া, নাইগ্যার ছড়া ও সিন্দাবিলের ছড়া, আমিরাবাদে- টংকাবতী, বোয়ালিয়া, নন্দা ও গুইল্যার ছড়া, পদুয়ায়- হাঙ্গর, লোনার ছড়া, গুইল্যার ছড়ি, সইলমারা, হিন্দুজোড়া, চ্যাংখার পুরুল, কৃষ্ণখালী, চরম্বায়- হাঙ্গর, জাংছড়ি, টংকাবতী, কেরাতর ছড়া ও লানিয়ার ছড়া, কলাউজানে- টংকাবতী, কোরমা ও হরি ইত্যাদি।

সদর ইউনিয়ন লোহাগাড়ায়- বোয়ালিয়া, সুখছড়ী, বামির নালা, ভাইগ্যার ছড়া, পুটিবিলায়- ডলু, কংসনালা, পুটিনালা, গুনাছড়ি, জুইগ্যার ছড়া, পলংঙ্গের খাল, কুলাং ছড়া, বুড়িঝুরি, কালারডেবা, আধারীখাল, চুনতিতে- চাম্বী, চান্দা, সোনাইছড়ি, হাইছবিলা, হাতিয়ার, পাকলীর, ফারাঙ্গা, সাতগড়, মছকানিয়া, রাতার, বুড়ির মুড়া, পেকুয়ার ও নারাঙ্গা ও আধুনগরে- ডলু, হাতিয়ার, সাতগড়ের ছড়া, মিজির ঘোনা, গজনীয়া, বিলের ছড়া, হানিফার ছড়া ইত্যাদি।

কৃষির দেশ লোহাগাড়া

লোহাগাড়া উপজেলা উত্তর ও পূর্বাঞ্চলীয় পাহাড় এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় পাহাড়তলীর পললভূমি এগ্রোইকোলোজিক্যাল অঞ্চলের অন্তর্গত। এ অঞ্চলটি কৃষি জলাবায়ুর জন্য অত্যন্ত উপযোগী। ফলে উপজেলার মূল চালিকাশক্তি কৃষি। এখানকার জনগণ ও অর্থনীতি কৃষির উপর নির্ভরশীল। উপজেলার জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। এখানে এক ফসলী, দুই ফসলী ও তিন ফসলী জমি রয়েছে। উপজেলায় সেই ফসলী জমির পরিমাণ প্রায় ২১ হাজার ৪শ হেক্টর। প্রধান কৃষিজ ফসলের মধ্যে ধান, ফেলন, বেগুন, আলু, মরিচ ও বিভিন্ন শাকসবজি। উপজেলায় বছরে গড়ে চাল উৎপন্ন ৪১ হাজার ৬৬০ মেট্রিক টন।কৃষক পরিবারের সংখ্যা ২৭ হাজার ১৮০টি। তাই উপজেলাটি কৃষির জোন হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি রয়েছে।

অন্যান্য এলাকার তুলনায় এখানকার জমির উর্বরতা অনেক গুণ বেশি। ফলে প্রতিবছর এখানে ধানের বাম্পার ফলন হয়। এ অঞ্চলের জমিতে উৎপন্ন ধান স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে অন্যান্য অঞ্চলের খাদ্য ঘাটতি মেটাতে ভূমিকা রাখছে। এ ছাড়াও প্রতিবছর প্রচুর শাক-সবজি উৎপন্ন হয়। উপজেলার ৯টি ইউনিয়নের প্রত্যেকটিতে খাল-ছড়ায় ভরপুর

হওয়ায় বিচিত্র ফসল উৎপাদনে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা রাখছে। উপজেলার প্রধান তিনটি খাল ডলু, টংকা ও হাঙ্গরের মাধ্যমে শুষ্ক মৌসুমে প্রায় ১ হাজার হেক্টরের অধিক জমিতে বোরো চাষ হয়। বিভিন্ন শাক-সবজি হয় প্রচুর। টংকাবতী রাবার ড্যামের মাধ্যমে প্রতিবছর কলাউজান-চরম্বায় প্রায় ২৫০ হেক্টর জমিতে বোরো চাষ হয়। ভূমি জরিপ-২০১১ এর তথ্যমতে, আধুনগরে শতকরা ২৪ ভাগ, আমিরাবাদে ৫৬ ভাগ, বড়হাতিয়ায় ৩০ ভাগ, চরম্বায় ৪২ ভাগ, চুনতিতে ২১ ভাগ, কলাউজানে ৫৬ ভাগ, সদর ইউনিয়ন লোহাগাড়ায় ৫৯ ভাগ, পদুয়ায় ৫০ ভাগ ও পুটিবিলায় ৩১ ভাগ জমিতে চাষ হয়।

উপজেলা কৃষি বিভাগ সূত্র মতে, লোহাগাড়া উপজেলায় সারা বছর ও মৌসুম ভিত্তিক বিভিন্ন ফসলের চাষাবাদ হয়ে থাকে। সৃষ্টির আদিকাল থেকে মানুষ ভূমিকর্ষণ করে বীজবপন করে বিভিন্ন ফসল উৎপাদন করে জীবিকা নির্বাহ করতে শিখে। তখন থেকে লোহাগাড়ায় কৃষি জমিতে চাষাবাদ শুরু হয়। উপজেলায় খরিপ-১-এ আউশ ধান ও গ্রীষ্মকালীন সবজি উৎপন্ন হয়। খরিপ-২ এ আমন ধান ও শরৎকালীন সবজি এবং রবি মৌসুমে বোরো ও রবিশস্য, শাকসবজি উৎপন্ন হয়।

উপজেলায় খরিপ-১ মৌসুমে ১ হাজার ৭২৭ মেট্রিক টন চাল উৎপাদন হয়। যার মূল্য প্রায় ৫ কোটি টাকা। সবজি উৎপন্ন হয় প্রায় ১২শ মেট্রিক টন, যার মূল্য প্রায় ১৮ কোটি টাকা, খরিপ-২ মৌসুমে ৩২ হাজার ১৩ মেট্রিক টন চাল উৎপন্ন হয়। যার মূল্য প্রায় ৯৬ কোটি টাকা। সবজি উৎপন্ন হয় ৮ হাজার ৭৮৫ মেট্রিক টন। যার মূল্য প্রায় ১৪ কোটি টাকা।

অপরদিকে বোরো মৌসুমে ১৩ হাজার ৩৪৭ মেট্রিক টন চাল উৎপন্ন হয়। যার মূল্য প্রায় ৪০ কোটি টাকা। রবিশস্য উৎপন্ন হয় প্রায় ১৭ হাজার ৫শ মেট্রিক টন। যার মূল্য প্রায় ৬২ কোটি টাকা। আর রবি শাকসবজি উৎপন্ন হয় ২৪ হাজার ৫শ মেট্রিকটন। যার মূল্য প্রায় ৫০ কোটি টাকা।

ফলে উপজেলার বিভিন্ন মৌসুমে উৎপাদিত ফসল জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। এই উপজেলা কৃষির দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

উপজেলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

সংস্কৃতিকে ঘিরে মানুষের আত্মজাগরণ হয়। বসবাসরত জনগোষ্ঠীর স্বাভাবিক জীবন চারণই সেখানকার সংস্কৃতি। বিভিন্ন উৎসব আয়োজন উপজেলাবাসীর রক্ত-মাংসে মিশে আছে। উৎসব আয়োজনের মধ্যে সীরতুন্নবী (স.) মাহফিল, মিলাদুন্নবী (স.) মাহফিল, ওরস, মেলা, বার্ষিক ফাতেহা শরীফ, মেজবান, হিন্দুদের মহোৎসব, বৌদ্ধদের বৌদ্ধ পূর্ণিমা, বৈশাখী মেলা, পুঁথি পাঠের আসর, কবি গান, মারফতী, গরুর লড়াই ও বলি খেলা অন্যতম। কালের বিবর্তনে উল্লেখিত অনেক সংস্কৃতি হারিয়ে গেছে। একসময় চুনতিতে শেরখানি আয়োজন অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। শেরখানি হচ্ছে সমবেত কণ্ঠে গীতগান। বিয়ে-শাদী উপলক্ষে এ শেরখানির আয়োজন করা হত। এ সংস্কৃতির গানগুলো রচনা করতেন এতদ অঞ্চলের শিক্ষিতরা। শেরখানিতে থাকত উর্দু-ফারসি মিশ্রিত গান, বাংলা গান, লোকগীতি এবং ভারতীয় আধুনিক ও হিন্দু

গান। ড. শব্বির আহমদ তাঁর এক প্রবন্ধ Chunati its culture and horitage-এ লিখেছেন জনগোষ্ঠী স্বাচ্ছন্দ্য জীবন-যাপনে অভ্যস্ত এবং বিনোদন প্রিয়। আর বিয়ের সংগীত হল অদ্বিতীয় সত্তাজাত এবং আচ্ছন্ন করে থাকে অভিভূতভাবে। তাঁর মতে, শেরখানি হচ্ছে রাতের প্রথম প্রহর থেকে ভোরের আগ পর্যন্ত ছোট-বড় ভিত্তিতে হারমোনিয়াম ও তবলা ছাড়া যে গান গাওয়া হয়। তিনি শেরখানিকে "Nuptial Songs" আখ্যা দিয়েছেন। এ শেরখানি উপজেলার তথা চুনতির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এক নন্দিত সংস্কৃতি। কিন্তু বর্তমানে সেই সংস্কৃতি এখন আর দেখা যায় না। বর্তমানে বিয়ে ও গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানে মধ্যরাত্রি থেকে ভোর পর্যন্ত মঞ্চভিত্তিক গান ও ইসলামী গানের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। বার্ষিক ওরস শরীফে খাওয়া-দাওয়া ও মেলার আয়োজন হত। ওয়াজ মাহফিল ও ঝিকির হত। কাওয়ালী গানের আসর বসত। বর্তমানে এই সংস্কৃতি কিছুটা হলেও চালু আছে। উপজেলার আরেকটি উল্লেখযোগ্য সংস্কৃতি ছিল পুঁথি পাঠের আসর। বর্তমানে এটি প্রায় বিলুপ্ত। এখন কোথাও পুঁথি পাঠের আসর দেখা যায় না। অথচ এটি উপজেলায় সাধারণ মানুষের আনন্দ-বিনোদনের উপকরণ হিসেবে বেশ সমাদৃত ছিল। রাতে পড়া হতো পুঁথি। কৃষাণ-কৃষাণীরা ভিড় জমাতো পুঁথি পাঠের আসরে। অন্যদিকে এ উপজেলার মেলার ঐতিহ্য বহু পুরানো দিনের। এলাকার জমিদাররা মেলার আয়োজন করত। মেলায় মাটির তৈরি বিভিন্ন পণ্যের সমাবেশ ঘটত। মাটির পুতুল, কাঠের ঘোড়া, টিনের জাহাজ, খই-বাতাসা, জিলাপি-রসগোল্লা ইত্যাদির জমজমাট আয়োজন হত। এখন এ ধরনের মেলা উপজেলায় তেমন আর দেখা যায় না। বর্তমানে উপজেলায় একটি সংস্কৃতি রীতিমতো চালু আছে। যার নাম মেজবান। মেজবানে সকল বয়সী শতশত নারী-পুরুষের খাবারের আয়োজন হয়। উপজেলায় পুরানো সংস্কৃতির মধ্যে আরেকটি সংস্কৃতি এখনো চালু আছে সেটি হচ্ছে মফজল মাওলানার সভা। এ সভায় বর্তমানে ঘোড়দৌড় না থাকলেও বড় করে বসে মেলা। পুরানো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যে হারিয়ে গেছে ছিদ্দিক মিয়ার গরু লড়াই ও বলি খেলা। ধর্মীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যে চুনতির ১৯ দিন ব্যাপী সীরতুন্নবী (স:) মাহফিল, কুমিরা ঘোনার মাহফিল, হিন্দুদের মহোৎসব ও বৌদ্ধদের বৌদ্ধ পূর্ণিমা। শাহপীর (রহ:) ও পেঠান শাহ এর ওরস শরীফসহ উপজেলার বিভিন্ন পীর আউলিয়ার মাজারে ওরস শরীফ অনুষ্ঠান চালু রয়েছে। এ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ মোনাজাত। মোনাজাতে অংশগ্রহণ করার জন্য বহু দূর-দূরান্ত থেকে ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা ওরস শরীফে এসে হাজির হন।

লোহাগাড়ায় এক সময় বিভিন্ন পাড়ায় ও স্কুলে দল বেঁধে পালাগান হত। মছদিয়ার গরুর লড়াই, পদুয়ায় ক্ষেত্রপালসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ছড়াছড়ি ছিল। এছাড়াও দক্ষিণ সাতকানিয়া গোলামবারী উচ্চ বিদ্যালয় ছিল লোকজ সংস্কৃতির মিলনস্থল। বিদ্যালয়ের তৎকালীন শিক্ষক নির্মল চন্দ্র পাল উক্ত সংস্কৃতির সাহিত্য রসে জমিয়ে রাখতেন এলাকা। বর্তমান এসব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও বিদায় হয়েছে।

প্রাকৃতিক গবেষণা কেন্দ্র

কর্কটক্রান্তি রেখা এদেশের ঠিক মধ্যভাগ দিয়ে অতিক্রম করার কারণে এদেশ নিরক্ষীয় অঞ্চলে পড়েছে। ফলে লোহাগাড়া শিল্পে সমৃদ্ধ অঞ্চল ও প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের সম্ভাবনাময় গবেষণা কেন্দ্র। ১৭৮৬ সালে এক ইংরেজ বিজ্ঞানী ও দার্শনিক চট্টগ্রামের ভূ-প্রকৃতি সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলেছিলেন, দক্ষিণ চট্টগ্রাম তথা বাঁশখালী, সাতকানিয়া ও লোহাগাড়া প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের জন্য গবেষণা কেন্দ্র। ভূ-তত্ত্ববিদদের মন্তব্য মতে, লোহাগাড়া অঞ্চলের ২৫৮.৮৭ বর্গ কিলোমিটার এলাকার প্রায়ই প্রাকৃতিক সম্পদের ডিপো। পীর আউলিয়ার এলাকা হিসেবে এখানে রয়েছে ইতিহাস, ঐতিহ্য ও কিংবদন্তীর চিহ্ন। এ অঞ্চলের কি সুন্দর সবুজের সমারোহ, কি সুন্দর বনভূমি-পাহাড় শ্রেণি, দূর্লভ বন, ঐতিহাসিক নিদর্শনা ইত্যাদি যেন সৌন্দর্য্যের মিলন মেলা।

চুনতি ও চুনতি বন্যপ্রাণি অভয়ারণ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকৃতি বিজ্ঞানীরা গবেষণার জন্য বহুবার এসেছেন। চুনতি বন্যপ্রাণি অভয়ারণ্যের এশিয়ান হাতি, বিভিন্ন বন্য প্রাণি, পশু-পাখি ও গর্জনসহ বিভিন্ন প্রাণি ও উদ্ভিদ নিয়ে তাঁরা গবেষণা করেছেন। গবেষণায় আসা প্রকৃতি বিজ্ঞানীরা চুর্নতি ও চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যকে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় অঞ্চল বলেছেন। তাঁরা আরো বলেছেন, এ অঞ্চলে প্রতিনিয়ত অবৈধভাবে গাছ-পালা কাটা, গাছ চুরি, কৃষি কাজ, পশু চারণ, ঘরবাড়ি নির্মাণ ও বন্যপ্রাণি শিকারের কারণে অভয়ারণ্যের সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এ উপজেলার পাহাড়ে রয়েছে অফুরন্ত জীববৈচিত্র্য। বিভিন্ন প্রজাতির গাছের সমারোহ উপজেলার পাহাড়ি বনাঞ্চল। সেগুন, মেহগনি, গর্জন, কড়ই, গামারি ও আকাশিসহ বিভিন্ন মূল্যবান গাছের প্রাকৃতিক যাদুঘর। উপজেলার আধুনগর, চুনতি ও বড়হাতিয়ার মোট ১৮৮১ হেক্টর জমির সবটাই পাহাড়। পাহাড়গুলো সাধারণত মাঝারি উঁচু এবং খাড়া ঢাল বিশিষ্ট। উক্ত এলাকার বনে চাপালিশ, জাম, কড়ই, গামারি, গর্জন, সেগুন, মেহগনি, বাঁশ, বেত ইত্যাদি মূল্যবান গাছ রয়েছে। শতকরা ১০ ভাগ জমিতে মূল্যবান লেবু, কূল ইত্যাদি বিভিন্ন ফল গাছ রয়েছে। উপজেলার অন্যান্য ইউনিয়নের পাহাড়ি এলাকায় মূল্যবান বৃক্ষ ও ফলজ গাছ রয়েছে। ১৯৯৮ সালের মার্চ মাসে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মৃত্রিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনষ্টিটিউট এর একটি দল লোহাগাড়ার ভূমি, মৃত্রিকা ও পানি সম্পদ বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে ছিলেন। তাঁরা গবেষণায় এ উপজেলাকে পাহাড়ি অঞ্চল ও পাহাড়তলীয় পললভূমি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে উপজেলার ভূমি নিয়ে গবেষণা চালানো হয়েছিল। উক্ত মন্ত্রণালয় Land zoning report: Lohagara Upazila নামে একটি রিপোর্ট বই প্রকাশ করেছে। তাঁরা লোহাগাড়াকে প্রধান কৃষি অঞ্চল বলেছেন। যে অঞ্চলের পাহাড়ে জন্মে প্রচুর মূল্যবান বৃক্ষ। রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে লোহাগাড়া অত্যন্ত সম্ভাবনাময় অঞ্চল।

প্রাকৃতিক সম্পদ

গ্যাসফিল্ড: লোহাগাড়া ও বাঁশখালীর গহীন পাহাড়ের মিলনস্থানে একটি গ্যাসফিল্ড রয়েছে। যা বহু বছর যাবৎ পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, উক্ত ফিল্ডে বিপুল পরিমাণ তেল ও গ্যাস প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে। অনুসন্ধানে জানা যায়, ১৯৬১ সালে লোহাগাড়া ও বাঁশখালীর গহীন পাহাড়ের দো-ছাইল্লাহ নামক স্থানে এ ফিল্ডের সন্ধান পাওয়া যায়। ৭টি কুপের মাধ্যমে দৈনিক ৩শ ব্যারেল করে প্রায় দেড় বছর গ্যাস উত্তোলন হয়। ১৯৬২ সালে এ ফিল্ড থেকে গ্যাস আহরণের জন্য তৎকালিন পাকিস্তান ও কোরিয়ান সরকারের মধ্যে চুক্তি হয়। কোরিয়ান বিশেষজ্ঞরা গ্যাস উত্তোলনে ব্যর্থ হয়। পরবর্তীতে ১৯৬৪ সালে সোভিয়েত সরকারের সাথে আরেকটি চুক্তি হয়। চুক্তি অনুযায়ী গ্যাসের শতকরা ৩০ ভাগ সোভিয়েত সরকার ও ৭০ ভাগ পাকিস্তান সরকার ভোগ করার শর্তে রুশ বিশেষজ্ঞদল সাফল্যের সাথে গ্যাস উত্তোলন করে। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধ বেঁধে গেলে গ্যাস ফিল্ডের কিছুটা ক্ষতি সাধন হয়। পরে কোন এক সময়ে অজ্ঞাত কারণে সীসা ঢালায় করে এটিকে বন্ধ করে দেয়া হয়। পরবর্তীতে বাপেক্সসহ অন্যান্য তেল অনুসন্ধানী গ্যাস ফিল্ড পরীক্ষা চালিয়ে সিদ্ধান্ত ছাড়াই তাদের জরিপ কাজ শেষ করে। পরিত্যক্ত অবস্থায় এখনো পড়ে আছে গ্যাস ফিল্ডটি।

খাল-ছড়ার বালি: উপজেলার ডলু, টংকা ও হাঙ্গরসহ ১১টি খালে প্রতি বছর হাজার ঘনফুট বালি উৎপন্ন হয়। এসব খালের বালি চট্টগ্রামসহ সারাদেশে প্রচুর চাহিদা রয়েছে। বিল্ডিং, রাস্তাঘাটসহ অন্যান্য নির্মাণ কাজে খালগুলোর বালি প্রচুর ব্যবহৃত হয়। প্রকৌশলীদের মতে, সিমেন্ট ও বালির মিশ্রণে উপযুক্ত উপাদান হিসেবে ডলুর বালি খুব টেকসই। ডলুর বালি এতোই ঝকঝকে ও পরিষ্কার যে, সূর্যের আলোতে চকচক করে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ডলু খালের বালি খনিজ বালি। ডলু খালের বালিতে সিলিকা বা কাঁচ মাটি রয়েছে। সহজেই এ বালি দিয়ে এলাকায় একটি কাঁচ শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, লোহাগাড়ার ডলু ও টংকাসহ বিভিন্ন খাল থেকে বালি উত্তোলনের জন্য ২০/২৫টি বালি মহাল রয়েছে। এসব বালি মহাল থেকে ৩০ হাজার ঘনফুট বালি উত্তোলন হয়। অপরিকল্পিতভাবে উত্তোলন হয় ২০ হাজার ঘনফুট এবং অন্যান্যভাবে উত্তোলন হয় ১০ হাজার ঘনফুট। সবমিলিয়ে বছরে লোহাগাড়ায় ৬০-৭০ হাজার ঘনফুট বালি উত্তোলন হয়।

চুনতি বন্যপ্রাণি অভয়ারণ্য

উপমহাদেশীয় প্রাণি বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ বনাঞ্চল এবং এশিয়ান হাতি প্রজননের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল চুনতি বন্যপ্রাণি অভয়ারণ্য। ১৯৮৬ সালে চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া, বাঁশখালী ও কক্সবাজার জেলার চকরিয়াসহ ৭টি সংরক্ষিত বনাঞ্চল নিয়ে অভয়ারণ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বন্যপ্রাণি সংরক্ষণ আইনের আলোকে ৭৭৬৪ হেক্টর বনভূমি নিয়ে এ অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হয়। সংশ্লিষ্ট বিভাগের তথ্যমতে, অভয়ারণ্যের উল্লেখযোগ্য প্রাণি

এশিয়ান হাতি ছাড়া বন্য শুকর, বানর, হনুমান, মায়া হরিণসহ ১৯ প্রজাতির স্তন্যপায়ী ও ৪ প্রজাতির উভচর প্রাণি, ৭ প্রজাতির সরীসৃপ, ৫৩ প্রজাতির পাখি এবং ৮ শতাধিক মা গর্জনসহ ১০৭ প্রজাতির সুসজ্জিত বৃক্ষের সমন্বয়ে গঠিত চিরহরিৎ বিশাল বনভূমি। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এ অভয়ারণ্য মুক্তিযোদ্ধাদের পূনর্গঠনে গুরম্নত্বপূর্ণ স্থান ছিল। অবৈধভাবে বন্যপ্রাণী শিকার, গাছ নিধন, কৃষি কাজ অভয়ারণ্যের প্রধান সমস্যা। অভয়ারণ্যকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য ২০০৫ সালে চুনতি কো-ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন করা হয়। বিশ্বনন্দিত টেলিভিশন সিএনএন চুনতিতে পরিদর্শনে এসে উক্ত কমিটি কার্যক্রম দেখে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। ফলে চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ২০১২ সালে জাতিসংঘের ইকুয়েটর পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়। ২০১২ সালের ২০ জুন ব্রাজিলের রাজধানী রিওডি জেনিরোতে জাতিসংঘ, ইউএনডিপি'র প্রধান ও বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানগণের উপস্থিতিতে পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান হয়। চুনতি কো-ম্যানেজম্যান্ট কমিটির সহ-সভাপতি ও অন্যতম নীতি নির্ধারক চুনতির কৃতি সন্তান আনোয়ার কামাল ইউএনডিপি'র প্রধান ও মহাসচিবের কাছ থেকে ইকুয়েটর পুরস্কার গ্রহণ করেন।

পদুয়া ফরেস্ট রেঞ্জ

চারিদিক ঘিরে সারি সারি বৃক্ষ রাজিতে ভরপুর পদুয়া ফরেস্ট রেঞ্জ। বনবিভাগের ১১শ হেক্টর জমির মধ্যে এ রেঞ্জ গঠিত। এ অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য যে কাউকে মুগ্ধ করবে।

চুনতিঃ ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাক্ষী

চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার একটি ইউনিয়নের নাম চুনতি। এ ইউনিয়নের একটি গ্রামের নামও চুনতি। প্রায় এক বর্গমাইল আয়তনের গ্রামটি ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। প্রকৃতি যেন সমস্ত ঐশ্বর্য ঢেলে গ্রামটিকে সাজিয়েছে। সুফি-সাধকের আবাসভূমি হিসেবেও এটি প্রসিদ্ধ। গ্রামটির নামকরণের সাথে এলাকার অন্য কোন নামের মিল নেই। এ গ্রামের পূর্ব-দক্ষিণে পাহাড় এবং উত্তর-পশ্চিমে এর গা ঘেঁষে চলে গেছে ঐতিহাসিক আরকান সড়ক (চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক)। শুধু চট্টগ্রাম নয়, দেশে বিদেশে চুনতি গ্রাম ঐতিহাসিক অঞ্চল হিসেবে বেশ পরিচিত।

চুনতি নামটির উৎপত্তি ফার্সি শব্দ চুনিদাহ থেকে। যার অর্থ পছন্দকৃত। উর্দুতে এর অর্থ প্রশংসনীয়। ঐতিহাসিক বর্ণনা মতে, ভারতের সফল সম্রাট মোহাম্মদ আকবরের প্রপৌত্র বিখ্যাত তাজমহল নির্মাতা সম্রাট শাহজাহান (১৬২৭-১৬৫৮ খ্রিঃ) ১৬৫৭ সালে বার্ধক্যজনিত কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় তাঁর বড় ছেলে দারাশিকো সিংহাসনের দাবিদার হন। সম্রাট শাহজাহানের তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেব এ সিদ্ধান্ত মেনে না নিয়ে ভাই শাহ সুজাকে (১৬৩৯-১৬৬০ বাংলার সুবেদার ছিলেন) সিংহাসন দখলের জন্য প্ররোচিত করেন। সরল বিশ্বাসে শাহ সুজা ১৬৬০ সালে নিজেকে

বাংলার সুলতান ঘোষণা দেন। কিন্তু সম্রাট শাহজাহান ও তাঁর বড় ছেলে দারাশিকো উভয়েই এ ঘোষণাকে বিদ্রোহ আখ্যা দিয়ে বাংলাকে মুক্ত করার জন্য রাজকীয় বাহিনী প্রেরণ করে। ফলে শাহ সুজা পিছু হটতে বাধ্য হন এবং ভারতীয় উপ-মহাদেশের উত্তর প্রদেশের খাজুয়া প্রান্তর থেকে বিতাড়িত হয়ে বাংলার রাজধানী সোনারগাঁওয়ে চলে আসেন। সোনারগাঁওয়ে তিনি সম্রাট আওরঙ্গজেবের সুবেদার মীর জুমলার তাড়া খেয়ে চট্টগ্রামের (তদানিন্তন ইসলামাবাদ) দক্ষিণ-পূর্বে আরাকান রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। শাহ সুজা আরাকানে যাওয়ার পথে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার মাঝামাঝি ছায়াঘেরা টিলাসমেত একটি পাহাড়ে অবস্থান করে চুনিদাহ শব্দ উচ্চারণ করেন। বর্তমানে সে এলাকা চুনতি নামে পরিচিত।

চুনতির পথিকৃৎ শাহ মাওলানা আবদুল হাকিম (রহ.) রচিত শজরাহমুলে জানা যায়, শাহ সুজা ১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দের ১২ মে নিজ পরিবারের সদস্যবর্গ, ২শ জন একান্ত অনুগামী এবং ৩ হাজার সৈন্য নিয়ে ইসলামাবাদ হয়ে পর্তুগিজ জাহাজে করে আরাকানে যাত্রা শুরু করেন। চট্টগ্রাম হতে সাঙ্গু ও ডলু নদের দক্ষিণ প্রান্তে এসে জাহাজ চলাচল উপযোগী পানিপথ শেষ হলে চুনতির বর্তমান কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানের পাদদেশে জাহাজ নোঙ্গর করে। তারপর তাঁরা পায়ে হেঁটে সামান্য দক্ষিণে গিয়ে সুপ্রশস্ত অনুচ্চ একটি পাহাড়ে অবস্থান করে চারিদিকে মনোরম দৃশ্য ও নিরাপদ জায়গা মনে করে শাহ সুজা সেখানে আস্তানা স্থাপনের নির্দেশ দেন। ফার্সি ভাষায় তিনি চুনিদাহ অর্থাৎ পছন্দকৃত উচ্চারণ করেন। সেখান থেকে চলে যাওয়ার সময় তিনি চিহ্নিত স্বরূপ একটি লোহার খুঁটি গেঁড়ে দিয়ে যান। স্থানটিতে লোহার খুঁটি গাঁড়ার কারণে লোহাগাড়া নামকরণ হয়েছে বলে ঐতিহাসিকবিদরা মনে করেন। ড. মুঈনুদ্দীন আহমদ খান রচিত ছিদ্দিকী বংশের একটি পারিবারিক ইতিহাস গ্রন্থ থেকে জানা যায়, ভারত বর্ষের ইতিহাসে সোলতানী আমলে বাংলার রাজধানী গৌড়ের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা ছিলেন মুহাম্মদ ইউসুফ খানের উত্তরসুরী মাওলানা হাফেজ খান মজলিশ। তিনি বাংলার সুবেদার শাহ সুজার পীর ছিলেন। তিনি শাহ সুজার সফর সঙ্গী হিসেবে চুনতি হয়ে বাঁশখালীর বানিগ্রামে অবস্থান করেন। ১৬৯০-১৭০০ খ্রিষ্টাব্দের গোড়ার দিকের কোন এক সময়ে হযরত শাহ সুফী নছরত উল্লাহ খন্দকার গৌড় থেকে চুনতি গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। নছরত উল্লাহ খন্দকার বড় মিয়াজি এবং তাঁর পুত্র হযরত শাহ শরীফ ছোট মিয়াজি নামে পরিচিত। চুনতি এলাকায় বড় মিয়াজি ও ছোট মিয়াজি মসজিদ এবং সুফী মিয়াজি পাড়া আজ তাঁদের স্মৃতি বহন করছে। অন্যদিকে ১৬০০ শতাব্দীর শুরুর দিকে ইসলাম প্রচারের জন্য একটি দল চুনতি গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। সম্রাট শাহজাহানের রাজ দরবারের অন্যতম শিক্ষক হযরত ইব্রাহীম খন্দকার শাহ সুজাকে অনুসরণ করে রামু পর্যন্ত যায়। সেখান থেকে তিনি বাঁশখালীর খানখানাবাদে কিছুদিন অবস্থান করে চুনতি গ্রামে এসে স্থায়ীভাবে বসতি শুরু করেন। জনশ্রুতি রয়েছে, বর্তমান চুনতি জামে মসজিদের উত্তর পার্শ্বে ঈদগাহ পাহাড়ে তিনি বসতি স্থাপন করেন।

শাহ সুজার সফর সঙ্গী ছিলেন ১৮ জন সেনাপতি, ২২ জন উচ্চপদস্থ আলেম ও বিশাল সৈয়দ বাহিনী। শাহ সুজা আরাকানে আশ্রয়ের ৬ মাসের মধ্যে সেখানে নির্মমভাবে খুন হন। এ পরিস্থিতিতে আলেম-ওলামা ও বিশাল মোঘল বাহিনীর একটি দল চলে আসেন চুনতি গ্রামে। এ ঐতিহাসিক ঘটনায় ইতিহাসের পাতায় স্থান পায় চুনতি। সুফী-সাধকের আবাসভূমি বা চারণক্ষেত্র হিসেবে প্রসিদ্ধ লাভ করে গ্রামটি। শিক্ষার প্রভাবও পড়ে গ্রামটিতে। ফলে এখানে গড়ে উঠে আদি পুরুষ ও আদি পরিবারের আবাসভূমি। আদি পুরুষদের মধ্যে হযরত মাওলানা নছরত উল্লাহ খন্দকার, শাহ শরীফ মিয়াজি, সুফী আবদুর রহমান, গাজীয়ে বালাকোট আধ্যাত্মিক সাধক হযরত মাওলানা আবদুল হাকিম (রহ.), হযরত মাওলানা ওয়াজি উল্লাহ খান সামী, নাসির উদ্দীন খান ডেপুটি, শুকুর আলী মুন্সেফ, মাওলানা মো: ইউসুফ, হযরত মাওলানা ফজলুল হক, শাহ মাওলানা নজির আহমদ, মাওলানা শাহ আতাউল্লাহ হোসাইনী ও শাহ সাহেব কেবলাসহ অনেকে। পরিবারের মধ্যে রয়েছে মিয়াজি পরিবার, সিকদার পরিবার, কাজী পরিবার, ছিদ্দিকী পরিবার, ডেপুটি পরিবার, শুকুর আলী মুন্সেফ পরিবার, মুন্সী পরিবার, ইউসুফ মৌলভী পরিবার ও দারোগা পরিবার। অন্যদিকে চুনতি হাজী রাস্তার ঐতিহাসিক রাফিয়া মুড়া ইতিহাসের সাক্ষী বহন করে। রাফিয়া মুড়ায় রয়েছে প্রাচীন বটবৃক্ষ ও তেঁতুল গাছ। এ বটবৃক্ষের নিচে এলাকার হাজীগণ সৌদি আরবে যাওয়ার উদ্দেশ্যে মিলিত হতেন। রাফিয়া মুড়ার পার্শ্ববর্তী কাজীর ডেবা হতে পালের নৌকাযোগে আরবে পাড়ি দিতেন হাজীরা। হযরত খলিফা আবু বক্কর (রা.) এর বংশধর ও ছিদ্দিকী বংশের প্রথম পরুষ হযরত আবদুল লতিফ ছিদ্দিকী (রহ.) ১৪০০ সালে মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আরব সাম্রাজ্যের হেজাজ প্রদেশের গর্ভনর ছিলেন। তিনি আরব থেকে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে লোহাগাড়ায় আসেন বলে ধারণা করা হয়। রাফিয়া মুড়ার পুরাতন তেঁতুল গাছের নিচে এ মহাপুরুষের কবর আছে বলে জনশ্রুতি রয়েছে। আধ্যাত্মিকতার পাশাপাশি শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কৃতি ও কাব্যচর্চায় মোঘল আমল থেকে খ্যাতির শীর্ষে রয়েছে চুনতি। ১৮১০ সালে হযরত মাওলানা আবদুল হাকিম (রহ.) প্রতিষ্ঠিত চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদরাসা উপজেলার প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মোঘল ও ব্রিটিশ আমল থেকে দেশে-বিদেশে এলাকাটির রয়েছে অনেক খ্যাতি। ইতিহাস ও ঐতিহ্যমন্ডিত এ চুনতি গ্রামের বৃক্ষরাজি, পাহাড় এবং পাহাড়ে সৃজিত বাগান, পাখির কলতান সব মিলিয়ে যেন পর্যটন কেন্দ্র। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এ অঞ্চল মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্গঠনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। এশিয়ান হাতি প্রজনন কেন্দ্র চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য অঞ্চলটি এ গ্রামে অবস্থিত। চট্টগ্রাম শহর থেকে প্রায় ৭০ কিলোমিটার দক্ষিণে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের উভয় পাশে অবস্থিত এ গ্রামটি পুরো চট্টগ্রাম নয়, গোটা দেশে ঐতিহাসিকভাবে খ্যাতি রয়েছে।

(তথ্যসূত্র: ১. ছিদ্দিকী বংশের একটি পারিবারিক ইতিহাস- ড. মুঈনুদ্দীন আহমদ খান। ২. দৈনিক পূর্বকোণ, তারিখ : ১০/১০/২০১৫ইং)

সংবাদপত্রে লোহাগাড়া

লোহাগাড়া থেকে প্রাচীনকালে সংবাদ পত্র বের হয়েছিল কিনা এরকম কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহশিক্ষার কার্যক্রম স্বরূপ দেয়ালিকা বের হত। দেয়ালিকায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা কবিতা, গল্প ও ছড়া লিখতেন। এলাকাভিত্তিক কিংবা প্রতিষ্ঠানের কিছু উদ্যোগী লোকজন বিভিন্ন নামে বের করতেন স্মরণিকা বা ম্যাগাজিন। তবে তা সংখ্যায় নগণ্য ছিল। ৯০ এর দশকে ও পরে এলাকা থেকে বের হয় মাসিক পত্রিকা। মাসিক আজকের লোহাগাড়া, লোহাগাড়া কণ্ঠ, সাতকানিয়া-লোহাগাড়া দর্পণ, সাতকানিয়া-লোহাগাড়া বার্তা ও আলোকিত লোহাগাড়াসহ বিভিন্ন সাপ্তাহিক পত্রিকা বের হয়। লোহাগাড়া প্রেস ক্লাব, লোহাগাড়া প্রেস ক্লাব ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে কিছু ম্যাগাজিন বের হয়। লোহাগাড়া উপজেলা সৃষ্টির সময় ম্যাগাজিন বের হয়। ২০১৩ সালে লোহাগাড়া উপজেলা পরিষদের উদ্যোগে 'স্মরণপট' নামে একটি ম্যাগাজিন বের হয়। উপজেলা মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্যোগেও মুক্তিযোদ্ধাভিত্তিক ম্যাগাজিন বের হয়। আগেকার দিনে সংবাদপত্র প্রকাশ করা ও সংবাদপত্রে খবর পাঠানো কষ্টসাধ্য ছিল। বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতায় সংবাদপত্র বের করা ও সংবাদপত্রে খবর পাঠানো সহজ হয়ে যায়। আগেকার দিনে মানুষ রেডিও-এর মাধ্যমে দেশ-বিদেশের খবরা-খবর শুনতেন। প্রতিটি ঘরে ঘরে ছিল রেডিও। বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকার খবর শুনত এলাকার লোকজন। কালের বিবর্তনে রেডিও'র খবর দলবেঁধে শুনতে দেখা যায় না এখন। ফেইসবুক, টুইটার, ওয়েবসাইট ওপেন করে মুহূর্তের খবরা-খবর জানতে পারছেন লোকজন।

দ্বাদশ অধ্যায়

লোহাগাড়ার
পীর আউলিয়া

Chunati.com
Pioneer in village based website

খোদার নৈকট্য যদি পেতে চাও এ দশটি খাছলত ভিতরে জন্মাও। ছবর, শোকর, সন্তোষ, একীন, এলম, তওবা, খুলুছ, ভয়,তাওয়াক্কুল ও প্রেম।

- মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহঃ)

হযরত শাহপীর (রহ.)

সোনারগাঁও এর স্বাধীন সুলতান ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ (১৩৩৮-১৩৪৯ খ্রী:) ১৩৪০ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম চট্টগ্রাম জয় করেন। তারপর চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচার শুরু হয়। ঐতিহাসিকদের মতে, চট্টগ্রামে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে কোন একসময়ে ১২ জন সুফী, পীর আউলিয়াগণ আরব, বাগদাদ ও পারস্য হতে চট্টগ্রামে আসেন এবং ইসলাম ধর্ম প্রচার শুরু করেন। ওই সময়ে হযরত শাহপীর (রহ.) চট্টগ্রামে আসেন বলে ধারণা করা হয়। ১২ জন সুফী সাধক সমুদ্রপথে চট্টগ্রামে আসেন এবং ইসলাম প্রচার শুরু করেন। পরবর্তীতে অধিকাংশই চট্টগ্রাম থেকে অন্য স্থানে ইসলাম প্রচারে চলে যান। ফলে চট্টগ্রাম শহর ও জেলার অন্য উপজেলার বিভিন্ন স্থানে সুফী ও পীর দরবেশের মাজার পরিলক্ষিত হয়। সুফী ও পীর আউলিয়াদের ঐতিহাসিক আগমনে চট্টগ্রাম বার আউলিয়ার দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান শামসুদ্দিন ফিরুজের শাসনামলে হযরত শাহজালাল (রহ.) তুরস্কের কুনিয়া শহর থেকে ৩১৩ জন শিষ্যসহ এদেশে আসেন। ওই সময়ে বার আউলিয়ার অন্যতম অলি হযরত শাহ ওমর (রহ.) হযরত শাহজালালের সাথে সিলেটে আসেন। তখন সিলেটের রাজা ছিলেন গৌর গোবিন্দ। ড. আবদুল করিমের মতে, বোরহান উদ্দীন নামে এক মুসলমান সিলেটের জঙ্গলে বাস করতেন। বোরহান উদ্দীন তাঁর পুত্রের জন্ম উপলক্ষে একটি গরু জবেহ করেন। একটি চিল গরুর এক টুকরো মাংস নিয়ে রাজা গৌর গোবিন্দের মন্দিরে ফেলে দেয়। এতে রাজা ক্ষিপ্ত হয়ে বোরহান উদ্দীনের ডান হাত কেটে ফেলে এবং তাঁর পুত্রকে হত্যা করে। বোরহান উদ্দীন মর্মাহত হয়ে সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহের দরবারে শরণাপন্ন হয়ে গৌর গোবিন্দের বিচার দাবি করেন। তখন সুলতান তাঁর ভাগ্নে সিকান্দর খান গাজীকে সসৈন্যসহ পাঠায়। এতে সিকান্দর খান গাজী দু'বার যুদ্ধ করে হেরে যান। তখন হযরত শাহজালাল সিকান্দর খান গাজীর সাথে যোগ দেন। সুফী সৈয়দ নাসির উদ্দীনকে সেনাপতি নিযুক্ত করেন। হযরত শাহজালাল সিলেটে গৌর গোবিন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। গৌর গোবিন্দ্র যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সিলেট ত্যাগ করে জঙ্গলে আশ্রয় নেন। ফলে সিলেট মুসলমানদের অধিকারে আসে। ড. আবদুল করিমের মতে, সাতগাঁও (চট্টগ্রাম) ও সিলেট বিজয়ের সঙ্গে দুইজন বিখ্যাত সুফীর নাম জড়িত। সাতগাঁও বিজয়ের সঙ্গে জাফরখান গাজী ও শাহ সফী উদ্দিন এবং সিলেট বিজয়ের সঙ্গে হযরত শাহ জালাল ও সৈয়দ নাসির উদ্দিন জড়িত। হযরত শাহ জালাল (রহ.) প্রথমে চট্টগ্রামে আসেন এবং সেখান থেকে সিলেট যান। ১৩৪০ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ চট্টগ্রাম বিজয়ের সময় সামরিক অভিযানে শাহ ওমর (রহ.) অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়। তখন ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ চাঁদপুর থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ করেন।

ঐতিহাসিকদের মতে, অষ্টম-নবম শতাব্দীতে চট্টগ্রামের সাথে আরব, পারস্য ও বাগদাদের বণিকদের যোগাযোগ ছিল এবং নবম শতাব্দী থেকে চট্টগ্রাম তথা দক্ষিণ চট্টগ্রামে মুসলমানদের আগমন শুরু হয়। হযরত শাহপীর (রহ.) ও শাহ ওমর (রহ.)

এ দু'জন দক্ষিণ চট্টগ্রামে প্রথম ইসলাম ধর্ম প্রচারক পীর-আউলিয়া বলে ধারণা করা হয়। শাহ ওমর (রহ.) কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার কাকরা গ্রামে আসেন। বসতি স্থাপন করে ইসলাম ধর্ম প্রচার শুরু করেন। হযরত শাহপীর (রহ.) লোহাগাড়ার দরবেশ হাট এলাকায় অবস্থান নিয়ে ইসলাম ধর্ম প্রচার শুরু করেন। অন্য তথ্য মতে, হযরত শাহপীর (রহ.) ইরাক থেকে চট্টগ্রাম হয়ে লোহাগাড়ায় আসেন এবং দরবেশ হাট এলাকায় অবস্থান নেন। ওই সময়ে দরবেশ হাট এলাকা বন-জঙ্গলে ভরপুর ছিল। আর বন-জঙ্গলে ছিল হিংস্র পশু। হিংস্র পশুরা হযরত শাহপীর (রহ.)'কে শ্রদ্ধা করতেন। জনশ্রুতি আছে, শাহ ওমর (রহ.) শাহপীর (রহ.) এর ভাগ্নে। মামা-ভাগ্নে একসাথে ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রামে আসেন। হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সাথে হযরত শাহ ওমর (রহ.) সিলেটে আসেন বলে ধারণা করা হয়।

এলাকার প্রবীণ আলেম-ওলামাদের মতে, হযরত শাহপীর (রহ.) এর পূর্ণনাম শাহ মোহাম্মদ আবু ইউসুফ। তিনি হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) এর বংশধর ছিলেন। তিনি বার আউলিয়ার অন্যতম অলি। জনশ্রুতি আছে, তিনি বার আউলিয়ার সর্দার এবং ইরাকের একটি প্রদেশের বাদশা ছিলেন। তিনি ইয়েমেনের বাদশাহর পুত্র ছিলেন। আরেক মতে, ইয়েমেন থেকে তিনি চট্টগ্রাম তথা লোহাগাড়ায় আসেন। বাদশাহী ও রাজকীয় পরিবেশ ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম প্রচারে তিনি এদেশে চলে আসেন। বন-জঙ্গলে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। কারামতের ধারক ছিলেন তিনি। তাঁর বহু কারামতের কথা এখনো লোকমুখে শুনা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি মুহাম্মদ মুকিম তাঁর "গুলে বাকওয়ালী" কাব্য গ্রন্থে আত্ম বিবরণী লিখতে গিয়ে কয়েকজন সুফীর নাম উল্লেখ করেছেন।

"ধার্মিক অতিথিশালা ফকির আম্মান,
সাহা জাহিদ, সাহ পান্তি আর সাহাপীর,
হাদি বাদশা আর সাহা সন্দর ফকির ॥
সাহ সুলতান আর সাহা শেখ ফরিদ,
শহরের, মধ্যে বুরা বদরের স্থিত" ॥

কবি মুহাম্মদ মুকিমের তালিকায় ০৮ জন সুফীর নাম উল্লেখ রয়েছে। যার মধ্যে হযরত শাহপীর (রহ.) এর নাম রয়েছে। বিভিন্ন লেখকগণ বার আউলিয়া সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করেছেন। লেখক ওহীদুল আলম তাঁর **"বাঙলা জীবনী কোষ"** এবং আলহাজ্ব মুফতী অছিয়র রহমানের "যুগ জিজ্ঞাসা" গ্রন্থে ১২ জন আউলিয়ার নাম উল্লেখ করেছেন। যার মধ্যে হযরত শাহপীর (রহ.) এর নাম ১ম স্থানে। এছাড়াও জামাল উদ্দিনের **"বার আউলিয়ার চট্টগ্রাম"** এবং আল্লামা গাজী শেরে বাংলার দেওয়ানে আজিজী" গ্রন্থে চট্টগ্রামের বার আউলিয়ার তালিকায় শাহপীর (রহ.) এর নাম উল্লেখ করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, শাহপীর (রহ.) বার আউলিয়ার অন্যতম অলি ও অলিদের সর্দার ছিলেন।

জনশ্রুতি থেকে আরো জানা যায়, হযরত শাহপীর (রহ.) শেষ বয়সে চিল্লায় পড়ে আল্লাহর ঝিকির ও ইবাদত বন্দেগীতে মগ্ন থাকতেন। ওই সময়ে ভক্তরা তাঁকে দুধ ও

পানি দিতেন। ভক্তদের কাছে তাঁর নির্দেশনা ছিল যেদিন তিনি পানির দুধ গ্রহণ করবেন না সেদিন থেকে তা বন্ধ করে দিতে। একদিন হঠাৎ তিনি দুধ ও পানি পান করা বন্ধ করে দিলেন। চিল্লা থেকে হইজগতে তিনি আর ফিরে আসেন নি। পরবর্তীতে বহু বছর পর তাঁর চিল্লা স্থানকে কেন্দ্র করে ভক্তরা একটি মাজার নির্মাণ করে দেন। প্রতিদিন অসংখ্য ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা তাঁর মাজার জেয়ারতে আসেন। তাঁর মাজারের উত্তর পাশে রয়েছে একটি পুকুর। পুকুরে ছিল অসংখ্য গজাল মাছ। জনশ্রুতি আছে, গজাল মাছ শাহপীর (রহ.) এর অনুগত মাছ। ভক্তরা সন্তুষ্টি লাভের আশায় গজাল মাছকে খাবার দেন। পরবর্তীতে মাজারের পূর্ব পাশের পুকুরে গজাল মাছগুলো স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে এ পুকুরে বহু গজাল মাছ রয়েছে।

মাজারের মতোওয়াল্লীদের মতে, হযরত শাহপীর (রহ.) সংসার করেন নি। আল্লার প্রেমিক একজন সুফী সাধক ছিলেন। হযরত শাহপীর (রহ.) এর তিনজন ব্যক্তিগত খাদেম ছিলেন। তাঁরা হলেন- হযরত বহরম ফকির, হযরত মুকিম ফকির ও হযরত সৈয়দ শাহ ফকির। হযরত বহরম ফকিরের বংশধররা বংশ পরম্পরায় হযরত শাহপীর (রহ.) এর মাজারের দেখাশুনা করছেন।

তথ্যসূত্রঃ ১. বাংলার ইতিহাস, সোলতানী আমল-ড. আবদুল করিম, ২. মোগল সাম্রাজ্যের বিলুপ্ত অধ্যায় দোহাজারী-জামাল উদ্দিন।

হযরত দরবেশ শাহ (রহ.)

হযরত দরবেশ শাহ (রহ.) ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে সুদুর আরব দেশ থেকে চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় আসেন। ১৬ শতকের শুরুর দিকে তিনি ইয়েমেন থেকে দরবেশহাট এলাকায় আসেন বলে ধারণা করা হয়। তিনি দরবেশহাট এলাকায় বসবাস শুরু করেন এবং ইসলাম ধর্মের খেদমতে নিয়োজিত থাকেন। দরবেশহাট এলাকায় তিনি দরবেশীয়া মসজিদ ও মসজিদের সামান্য পূর্বে **"দরবেশ হাট"** নামে একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করেন। তার নামানুসারে এলাকাটির নামকরণ করা হয় দরবেশ হাট। জানা যায়, ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে **"দরবেশ হাট"** প্রতিষ্ঠিত হয়। দরবেশ শাহ (রহ.) এর প্রকৃত নাম হযরত শাহ আজগর ফকির (রহ.)। দরবেশ শাহ (রহ.) এলাকায় এসে প্রথমে বেড়ার মসজিদ ও পরে মাটির তৈরী মসজিদ নির্মাণ করেন । বর্তমানে মসজিদটি নবরূপে নির্মাণ করা হয়। নির্মাণ কাজে এগিয়ে এসেছেন এলাকাবাসীরা। বিশেষ করে মসজিদের নির্মাণকাজে এগিয়ে এসেছেন দেশ বরেণ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান মোস্তফা গ্রুপ অব ইন্ডাষ্ট্রিজের ভাইস-চেয়ারম্যান আলহাজ্ব শফিক উদ্দিন। ২০১১ সালের ১৬ জানুয়ারী চট্টগ্রাম বায়তুশ শরফের পীর আলহাজ্ব মাওলানা কুতুব উদ্দিন মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। বর্তমানে নির্মিত এই দরবেশীয়া মসজিদের নির্মাণশৈলী অত্যন্ত মনোরম। স্থাপত্য শৈল্পিক চেতনাকে প্রাধান্য দিয়ে মসজিদটি নির্মিত হয়েছে। তিন তলা বিশিষ্ট এ মসজিদের দু'টি মিনার ও একটি বড় গম্বুজ রয়েছে। সত্যি! মসজিদটি দেখতে কতই না সুন্দর!!

হযরত মাওলানা আবদুল হাকিম (রহ.)

মোঘল সম্রাট শাহজানের ২য় পুত্র শাহ্ সুজা চট্টগ্রাম হয়ে আরাকান যাচ্ছিলেন। তিনি লোহাগাড়ার চুনতির একটি পাহাড়ে যাত্রা বিরতি করেন। চলে যাওয়ার সময় চিহ্ন স্বরূপ উক্ত পাহাড়ে একটি খুঁটি গেঁড়ে দিয়ে যান। পরবর্তীতে সম্রাট শাহ্জাহানের রাজ দরবারের অন্যতম শিক্ষক হযরত ইব্রাহিম খন্দকার শাহ্ সুজাকে অনুসরণ করে রামু পর্যন্ত গিয়ে সেখান থেকে বাঁশখালীর খানখানাবাদে চলে আসেন। কিছু দিন পর সম্রাট শাহ্জাহানের ঐ শিক্ষক চুনতির চিহ্নিত স্থানে ফিরে এসে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। এ সময়ে আরেক বুজুর্গ বাঁশখালী থেকে চুনতি গ্রামে আসেন। তাঁর নাম মাওলানা আবদুর রহমান মিয়াজী। তাঁরই পুত্র গাজীয়ে বালাকোট হযরত শাহ্ মাওলানা আবদুল হাকিম (রহ.)। তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আনওয়ারুল হক খতিবী **"আধ্যাত্মিক চর্চায় চুনতি"** প্রবন্ধে লিখেছেন ১৮৩১ সালে মাওলানা আবদুল হাকিম (রহ.)'র বয়স হবে ৪৫ বছর। সে হিসেবে তিনি ১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে জন্ম গ্রহন করেন।

মাওলানা আবদুল হাকিম (রহ.) প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠিত মক্তবে। তারপর কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে কৃতিত্বের সাথে লেখাপড়া করেন। তিনি প্রথমে কাজী ও পরে মুন্সেফ পদে নিযুক্ত হন। উত্তর প্রদেশের জজ থাকাকালীন ১৮৩৫ সালে ব্রিটিশ বড়লাট উইলিয়াম বেন্টিংক শরীয়া আইন তুলে নিলে এবং ফার্সির স্থলে ইংরেজী ভাষা চালু করলে তিনি স্ব-ইচ্ছায় চাকুরী ছেড়ে দেন। তিনি হযরত ইসমাইল শহীদ ব্রেলভীর শিষ্যত্ব লাভ করেন। সেই সূত্র ধরে হযরত ছৈয়দ আহমদ শহীদ (রহ.)'র সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। তিনি ভারতের উত্তর সীমান্ত প্রদেশে শিখদের বিরুদ্ধে "সাইদুর" যুদ্ধে অংশ গ্রহন করেন। ১৮৩১ সালে পাঞ্জাবের অন্তর্গত হাজারা জেলার বালাকোটের যুদ্ধেও অংশ গ্রহন করেন। সেজন্য তাঁকে গাজীয়ে বালাকোট বলা হয়। শুকুর আলী মুন্সেফ সাহেবের বড় বোনের সাথে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর আট পুত্র ও তিন মেয়ে। পুত্ররা হলেন- (১) ওয়াজি উল্লাহ (২) হামিদুল্লাহ (৩) মাহমুদুল্লাহ (৪) রফাত উল্লাহ (৫) ওবায়দুল্লাহ (৬) আবদুল হাই (৭) মোহাম্মদ ইসমাইল (৮) মোহাম্মদ ইয়াকুব। তাঁর সন্তানরা সকলেই শিক্ষিত। তাঁর বড় ছেলে ওয়াজি উল্লাহ খান সামি ভারতের উত্তর প্রদেশের এহালাবাদ জেলার সাব জজ ছিলেন। গাজিয়ে বালাকোট মাওলানা আবদুল হাকিম (রহঃ) পরবর্তী সময়ে তাঁর নিজ গ্রাম চুনতিতে আধ্যাত্মিকতা চর্চায় নিয়োজিত থাকেন। ফলে তিনি চুনতিতে বড় মাওলানা হিসেবে খ্যাত ছিলেন। তাঁর পরিবার এখনো চুনতিতে বড় মাওলানা সাহেবের পরিবার হিসেবে পরিচিত। তিনি হযরত আবু বক্কর ছিদ্দিক (রা.)'র বংশধর ছিলেন বিধায় তাদের পরিবারের সদস্যরা নামের পেছনে ছিদ্দিকী যোগ করে থাকেন। ইতিহাস থেকে জানা যায়, মাওলানা আবদুল হাকিম (রহ.) শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ফার্সি ভাষায় কবিতা লিখতেন। কোরআন শরীফও কপি করতেন। ড. মুঈনুদ্দিন আহমদ খান তাঁর কাব্য চর্চা সম্পর্কে বলেন "A first grade a sufi

mystic and a person of dedicated heart. He also wielded his pen to compose poetry of considerable beauty".

তিনি ১৮১০ সালে লোহাগাড়ার প্রাচীন দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে তাঁর বয়স ছিল ২৪ বছর। তাঁর বংশধররা প্রথমে নামকরণ করেন সামিয়া মাদ্রাসা এবং পরে চুনতি হাকিমিয়া মাদ্রাসা হিসেবে। এই প্রসঙ্গে চুনতি হাকিমিয়া মাদ্রাসার সাবেক প্রিন্সিপাল প্রখ্যাত পীর শাহ্ মাওলানা হাবিব আহমদ (রহ.) বলেন-ভারতের বেলভীর বিখ্যাত অলিকুল শিরোমণি হযরত শাহ্ ছৈয়দ আহমদ শহীদ (রহ.)'র সুযোগ্য খলিফা হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুল হাকিম (রহ.) এ দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গোড়া পত্তন করেন। তিনি যতোদিন জীবিত ছিলেন নিজেই তা পরিচালনা করেছেন।

মাওলানা আবদুল হাকিম (রহ.)'র পুত্র ও কন্যা সন্তানদের বংশধরগণ দ্বীনি ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত। তাঁর অনুজ নাছির উদ্দীন খান ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন আমলে ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। তাঁর পরিবার চুনতির ডেপুটি পরিবার হিসেবে খ্যাত। তিনি চুনতি ডেপুটি বাড়ী মসজিদের সামনের কবরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন।

(তথ্যসূত্র: আনজুমন-২০১০, চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্রাসা প্রকাশনা)

হযরত সুফী সৈয়দ ফতেহ আলী ওয়াইসী (রহ.)

হযরত সুফী সৈয়দ ফতেহ আলী ওয়াইসী (রহ.)'র পূর্ব পুরুষ পবিত্র আরব ভূমি মক্কা নগরীতে হলেও তাঁর জন্মস্থান চট্টগ্রামের লোহাগাড়ার আমিরাবাদ এলাকায়। তাঁর পূর্ব পুরুষ সৈয়দ বংশের। তিনি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর বংশধর ছিলেন। সৌদি আরব থেকে তাঁর পূর্ব পুরুষ ইরাকে আসেন। পরবর্তীতে ইরাক হয়ে ইরানে এবং ইরান থেকে তাঁদের বংশের একাংশ দিল্লীতে এসে বসতি স্থাপন করেন। সেখান থেকে তাঁর পূর্ব পুরুষ চট্টগ্রামের আমিরাবাদ এলাকায় আসেন।

সুফী সৈয়দ ফতেহ আলী ওয়াইসী'র জন্ম সন নিয়ে মত-পার্থক্য থাকলেও কোন কোন লেখক বা গবেষক ১৮২৫ বা ১৮২০-২৩ সাল উল্লেখ করেছেন। আবার কেউ কেউ ১৮১৫-১৬ সাল উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি ইন্তেকাল করেন ১৮৮৬ সালের ৬ই ডিসেম্বর। বেশীরভাগ গবেষক মনে করেন হযরত সুফী সৈয়দ ফতেহ আলী ওয়াইসী'র জন্ম ১৮২৫ খ্রিষ্টাব্দে। তাঁর পিতার নাম হযরত সৈয়দ ওয়ারেস আলী (রহ.) এবং মাতার নাম হযরত সৈয়দা সাঈদা খাতুন। হযরত সৈয়দ ওয়ারেস আলীর তিন সন্তান। তারা হলেন, হযরত সৈয়দা সালেহা খাতুন, হযরত সৈয়দ সালেহ আলী ও হযরত সৈয়দ ফতেহ আলী ওয়াইসী। হযরত ওয়াইসী (রহ.)'র প্রপিতামহ হযরত সৈয়দ হারেস আলী (রহ.)। তিনি আরবী-ফার্সী সাহিত্যে জ্ঞানী ও বুজুর্গ ছিলেন।

হযরত ওয়াইসী (রহ.) তাঁর বুজুর্গ পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর পিতা হযরত সৈয়দ ওয়ারেস আলী (রহ.) একজন উঁচু মাপের জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন।

তিনি দেশ প্রেমিক, স্বাধীনচেতা ও একজন আল্লাহর অলি ছিলেন। তিনি হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ (রহ.)'র মুরিদ ছিলেন। হযরত সৈয়দ ওয়ারেস আলী (রহ.) ১৮২৯ সালে পাঞ্জাতারের ধর্মীয় যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। মুহাঃ মুবারক আলী রহমানী সীরাতে ওয়সী গ্রন্থে লিখেছেন হযরত সুফী ফতেহ আলী ওয়াইসী মাতৃলয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন। কেননা তাঁর পিতা ১৮২৬ সালে জিহাদে অংশ গ্রহণের জন্য বের হয়ে আর বাড়ী ফিরেননি। ১৮৩১ সালে তাঁর পিতা বালাকোটের যুদ্ধে শহীদ হন। তখন হযরত সুফী ফতেহ আলী ওয়াইসী'র বয়স প্রায় ৬ বছর। গ্রন্থে তিনি আরো লিখেছেন, সুফী ফতেহ আলী ওয়াইসী মায়ের কোলে লালিত-পালিত হয়ে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন মায়ের কাছে। তিনি হযরত বড় পীর আবদুল কাদের জিলানী (রহ.)-এর বংশধর ছিলেন। তাঁর পূর্ব পুরুষ ইরাকের বাগদাদ শরীফ থেকে আফগানিস্তান হয়ে দিল্লীতে আসেন। বুজুর্গ পিতার ইন্তেকালের পর যুবক হযরত ওয়াইসী'কে নিয়ে তাঁর বুজুর্গ মাতা হযরত সৈয়দা সাঈদা খাতুন সাগর পথে হজ্বের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। হুগলি নদীর মোহনায় জাহাজ ডুবিতে অনেক যাত্রীর মধ্যে হযরত ওয়াইসী (রহ.)'র মাতা ইন্তেকাল করেন। হযরত ওয়াইসী (রহ.) অলৌকিকভাবে বেঁচে গিয়ে সাঁতরিয়ে স্থলভাগে চলে আসেন। তিনি প্রথমে হুগলি নদীর মোহনা থেকে ফুরফুরাতে পৌঁছেন। তারপর দশাগ্রামের পানাউল্লাহ মাদ্রাসায় ভর্তি হন। তিনি হুগলি মোহসেনিয়া মাদ্রাসায় কৃতিত্বের সাথে লেখাপড়া শেষ করেন। তিনি কোরআন, হাদিস, ফিকাহ, আকাইদ, মানতিক ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী হন। আরবী ভাষার পাশপাশি ফার্সী ভাষা, বাংলা ও ইংরেজীতে তাঁর অসাধারণ দখল ছিল।

হযরত ওয়াইসী (রহ.) শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করে কলিকতায় আলীয়া মাদ্রাসাসহ আরো ২/১টি মাদ্রাসায় খণ্ডকালীন শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। তারপর তিনি কলকাতা হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের প্রধান রেজিষ্ট্রারের দায়িত্ব পালন করেন। তারপর নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ'র একান্ত সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। মুর্শিদাবাদের পুনাশি গ্রামের জমিদার বংশের খন্দকার নেজাবত হোসেনের আত্মীয়ের কন্যা হযরত ফাতেমা খাতুনের সাথে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি কাদেরিয়া, চিশতিয়া, নক্শবন্দিয়া ও মোজাদ্দেদিয়া ত্বরিকতে বায়াত হয়ে খেলাফত প্রাপ্ত হন। ফলে তিনি এই চার তরিক্বতের 'পীর' হিসেবে বেশ পরিচিতি লাভ করেন। খেলাফত প্রাপ্তির পর তিনি ক্রমশ সংসার থেকে দূরে এসে আল্লাহ ও নবী প্রেমে নিমগ্ন হয়ে পড়েন। প্রায় ২০ বছর যাবৎ উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে শরীয়ত ও তরিক্বতের তালিম দেন। তরিক্বতের ইমামগণ তাঁকে ওয়াইসী নামে ভূষিত করেন। কলিকাতার আপামর সকলেই তাঁকে হযরত সুফী সাহেব বলে ডাকতেন।

হযরত ওয়াইসী (রহ.) উঁচু মাপের জ্ঞানী ও কবি ছিলেন। তিনি অসংখ্য ধর্মীয় গ্রন্থ রচনা করেন। ফার্সি ভাষায় তাঁর রচিত দিওয়ানে ওয়াইসী ১৭৪টি গজল ও ২৩টি কছিদার সমন্বয়ে মূল্যবান গ্রন্থটি উপমহাদেশে ব্যাপক সাড়া জাগায়। তিনি ১৮৮৬

সালের ৬ ডিসেম্বর ৬১ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। কলিকাতার মানিকতলা এলাকার মুন্সি পাড়ার দিল্লীওয়ালা কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

হযরত ওয়াইসী (রহ.)'র স্মরণে লোহাগাড়া উপজেলার আমিরাবাদের মল্লিক ছোবহান গ্রামে ২০০২ সালে **'মল্লিক ছোবহান সুফী ফতেহ আলী ওয়াইসী (রহ.) মহিলা মাদ্রাসা''** প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১. শানে ওয়াইসী- আহমদুল ইসলাম চৌধুরী রচিত ও ইসলামিক ফাউণ্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত।

২. সীরাতে ওয়সী- মুহাঃ মুবারক আলী রহমানী।

হযরত শাহ সুফী ছৈয়দ আবু মুছা কলিমুল্লাহ (রহ.)

হযরত শাহ সুফী ছৈয়দ আবু মুছা কলিমুল্লাহ (রহ.) আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফের পঞ্চম গদ্দিনশীল হযরত শাহ সুফী ছৈয়দ আজমত উল্লাহ (রহ.)'র পুত্র। তাঁর দুই পুত্র ও এক কন্যা। প্রথম পুত্র সুফী ছৈয়দ দায়েম উল্লাহ (রহ.) চট্টগ্রাম অঞ্চলে অতি পরিচিত ব্যক্তিত্ব। সুফী দায়েস উল্লাহ (রহ.)'র পিতা সুফী ছৈয়দ আবু মুছা কলিমুল্লাহ (রহ.) আমিরাবাদে শায়িত আছেন। হযরত শাহ সুফী ছৈয়দ আবু মুছা কলিমুল্লাহ (রহ.) ১৯২৭ খ্রিঃ মাত্র ৪০/৪২ বছর বয়সে তাঁর পিতার জীবদ্দশায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর পিতা হযরত সুফী ছৈয়দ আজমত উল্লাহ (রহ.) ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে ১১০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

হযরত শাহ সুফী ছৈয়দ আবু মুছা কলিমুল্লাহ (রহ.) মহান ত্যাগী সাধক পুরুষ ছিলেন। তিনি তাঁর চাচাজান হযরত শাহ সুফী ছৈয়দ আবু মুহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ (রহ.)'র নিকট খেলাফত লাভ করেন। তিনি তাঁর পিতার জীবদ্দশায় একটি বিশেষ অধ্যাত্মিক ঘটনা এবং ত্যাগের মহিমায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর চাচাজান একজন মহান ওলীয়ে কামেল ছিলেন। তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়েছে বহু অলৌকিক ঘটনার মধ্য দিয়ে। একদা তাঁর চাচা বার আউলিয়ার সর্দার হযরত শাহপীর (রহ.) এর মাজার জিয়ারতে যান। মাজার শরীফ দরবেশহাট এলাকায় গহীন জঙ্গলে হওয়ায় সন্ধ্যা নেমে আসলে সেখানে হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের আনাগোনা হতো। ফলে সন্ধ্যার পর সেখানে কেউ অবস্থান করত না। প্রতিদিনের ন্যায় মাজারের খাদেম মাগরিবের নামাজ শেষ করে মাজার শরীফ তালাবদ্ধ করে বাড়ি ফিরেন। যাবার পূর্বে তিনি সুফী ওবায়দুল্লাহ (রহ.) কে সেখানকার হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের কথা জানান এবং সুফী সাহেবকে তাঁর সাথে কিংবা অন্য কোথাও চলে যেতে অনুরোধ করেন। সুফী ওবায়দুল্লাহ (রহ.) মাজারের খাদেমকে চলে যেতে ইশারা করেন এবং সেখানে তিনি রাত্রী যাপন করবেন বলে জানান। গভীর রাতে হযরত শাহপীর (রহ.)'র খাদেমের পিতাকে স্বপ্ন দেখান যে, সুফী সাহেবকে জঙ্গলে একা রেখে তোমরা সুখে নিদ্রা যাচ্ছ, তোমরা আমার খাদেম হওয়ার যোগ্য না।

তোমরা এখনই সুফী সাহেবের নিকট মাজার শরীফের চাবি হস্তান্তর কর। এ স্বপ্ন দেখে খাদেমের পিতা লোকজন নিয়ে মশাল জ্বালিয়ে মাজার শরীফে গিয়ে দেখতে পায় সুফী সাহেব একটি গাছের গোড়ায় আল্লাহর ধ্যানে মগ্নে বসে আছেন। আর হিংস্র জন্তুরা সুফী সাহেবকে ঘিরে আছে।

হযরত শাহ সুফী ছৈয়দ কলিমুল্লাহ (রহ.) কে দায়েমিয়া তরিক্বতের সিলসিলা অব্যাহত রাখতে তাঁর চাচা দায়িত্ব দিয়ে তাঁকে আমিরাবাদে পাঠান। অপরদিকে, তাঁর পিতা হযরত শাহ সুফী ছৈয়দ আজমতুল্লাহ (রহ.)'র জীবদ্দশায় একটি বিশেষ আধ্যাত্মিক ঘটনার মধ্য দিয়ে ইন্তেকাল করেন। একদিন চট্টগ্রামের লোহাগাড়ার আমিরাবাদ এলাকায় বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব ছড়ায়। চারিদিকে বসন্ত রোগে আক্রান্ত লাশ আর লাশ। এতে সুফী কলিমুল্লাহ (রহ.)'র হৃদয় কেঁপে উঠে। তিনি মহান আল্লাহর দরবারে হাত তুলে বলেন, হে আল্লাহ আমার জীবনের বিনিময়ে অত্র অঞ্চলের মানুষকে বাঁচিয়ে দাও। দোয়া শেষ হতে না হতেই সুফী কলিমুল্লাহ (রহ.)'র শরীরে বসন্ত রোগ দেখা দেয়। এ বসন্ত রোগে তিনি অল্প বয়সে ইন্তেকাল করেন। তখন থেকে এ পর্যন্ত ওই এলাকায় আর বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়নি।

হযরত শাহসুফী ছৈয়দ কলিমুল্লাহ (রহ.) হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (স.)'র ৩৯ তম বংশধর ছিলেন। তাঁর পুত্র হযরত শাহ সুফী ছৈয়দ দায়েম উল্লাহ (রহ.) তাঁর বুজুর্গ পিতার স্মরণে আমিরাবাদ অঞ্চলে মসজিদ, মাদরাসা ও এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেন। বিশেষ করে তাঁর বুজুর্গ পিতার মাজার সংলগ্ন আমিরাবাদ সুফিয়া আলিয়া মাদরাসা, আমিরাবাদ সুফিয়া দায়েমিয়া শাহী জামে মসজিদ, আমিরাবাদ সুফিয়া দায়েমিয়া মুসলিম এতিমখানা তাঁর অমর কীর্তি। এই এতিমখানার বর্তমান সেক্রেটারী আলহাজ্ব মোহাম্মদ ইসমাইল। এছাড়া হযরত শাহ সুফী ছৈয়দ কলিমুল্লাহ (রহ.)'র স্মরণে উপজেলার চরম্বা পাহাড়ী অঞ্চলে **"আবু মুছা কলিমুল্লাহ এতিমখানা ও দায়েমিয়া শাহ মসজিদ"** প্রতিষ্ঠিত হয়।

(তথ্যসূত্রঃ (১) আজিমপুর দায়রা শরীফ ও দায়েমি কমপ্লেক্সের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস- ড. সুফী সাগর সামস (২) মিলাদে দায়েমি-দায়েমি প্রকাশনা ২০১১ (৩) শানে ওয়াইসী- আহমদুল ইসলাম চৌধুরী)

মাওলানা শাহ আতাউল্লাহ হোসাইনী (রহ.)

মাওলানা শাহ আতাউল্লাহ হোসাইনী (রহ.) মাওলানা শাহ রহমতুল্লাহ (রহ.) এর পুত্র। তিনি দিল্লির প্রখ্যাত আলেম সৈয়দ লাল শাহ (রহ.) এর পৌত্র। তিনি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর ৩৭ তম আওলাদ ছিলেন বলে বংশধররা দাবি করেন। ভারতের দিল্লিতে তাঁর আদি বংশধর। দিল্লি থেকে তিনি প্রথমে উত্তর শুখছড়ি ডেবার কূল এলাকায় অস্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। সেখান থেকে চলে যান সাতকানিয়ার কেরাণীহাটের উত্তর পাশের একটি এলাকায়। এখানে কিছুদিন অবস্থান করে ঐতিহাসিক চুনতির সাতগড় স্থানে এসে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন এবং ইসলাম প্রচার শুরু করেন। সাতগড় পুকুরের পশ্চিম পাশে বসে নিয়মিত কোর-আন তেলাওয়াত করতেন তিনি। তাঁর কোর-আন তেলাওয়াত শুনে সকলেই মুগ্ধ হতেন। জনশ্রুতি আছে, দিল্লি থেকে আসার সময় তিনি সাতগড় এলাকায় আলেম-ওলামা, কুমার, কামার, নাপিত ও ধুপিসহ ৭ শ্রেণির মানুষ সাথে নিয়ে আসেন এবং বসতি স্থাপনের সুযোগ করে দেন। ওই সাত শ্রেণির মানুষের বসতি স্থাপনের ফলে এলাকাটির নামকরণ হয়েছে সাতগড়।

হযরত মাওলানা শাহ আতাউল্লাহ হোসাইনী (রহ.) এলাকায় বুড়ো মাওলানা (রহ.) নামে বেশ পরিচিত। শরীয়ত, ত্বরিকত, হাকিকত এবং মারফতে তাঁর ব্যাপক দখল ছিল। জাহেরী এলমে দক্ষ ও প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তিনি। আল্লাহর ঝিকিরে তিনি সবসময় মগ্ন থাকতেন। ছুফি হিসেবেও তিনি ছিলেন বিখ্যাত। হযরত শাহ সাহেব কেবলার দরবারে সাতগড় থেকে কেউ আসলে সাথে সাথে শাহ সাহেব কেবলা বলতেন তোমার এলাকায় বুড়ো মাওলানা (রহ:) নামের একজন বড় মাপের ছুফি আছেন, তাঁর কাছে যাও। ১২১৮ কিংবা ১২১৯ হিজরীর ২২ শাওয়াল মোতাবেক ১১৬৫ মঘী সনের ২৪ মাঘ শনিবার বুড়ো মাওলানা (রহ.) ইন্তেকাল করেন। ২০১৪ সালে তাঁর ২১৫তম ওরশ মোবারক অনুষ্ঠিত হয়েছে। সে হিসেবে তিনি প্রায় ৩শ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে অনুমান করা যায়। তাঁর ইন্তেকালের দু'দিন পর অর্থাৎ তৃতীয় দিন সোমবার সকালে তাঁকে দাফন করা হয়। জনশ্রুতি আছে, বুড়ো মাওলানা (রহ.) ইন্তেকালের খবর শুনে তৎকালীন রোমের বাদশাহ সাতগড় এলাকায় এসে জানাযায় অংশ নেন। অন্য কিংবদন্তী মতে, বুড়ো মাওলানা (রহ.)'কে রোমের বাদশাহ উপহার স্বরূপ একটি তরবারি উপহার দেন। এ তরবারির গোড়ার একটি অংশ তাঁর বড় ছেলের বংশধরের কাছে রক্ষিত আছে বলে বংশধর সূত্রে জানা গেছে। সাতগড় এলাকায় তাঁর মাজার রয়েছে। ভক্তরা প্রতিনিয়ত তাঁর মাজারে জেয়ারতের উদ্দেশ্যে আসেন। বুড়ো মাওলানা (রহ.) নিজ হাতে মসজিদ-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। কথিত আছে, অরণ্যের হাতিসহ অন্যান্য প্রাণিরা বুড়ো মাওলানার মাজারে এসে শ্রদ্ধা জানাত। অসংখ্য ভক্তরা প্রতিনিয়ত তাঁর মাজারে জিয়ারতের উদ্দেশ্যে আসেন। তাঁর বার্ষিক ওরশের অনুষ্ঠানে অসংখ্য মানুষের সমাগম হয়। সাতগড় এলাকায় শাহ আতাউল্লাহ হোসাইনী (রহ.) এর নামে একটি সড়কের নামকরণ

হয়েছে। বর্তমানে তাঁর বংশধর ও ভক্তরা সম্মিলিতভাবে শাহ আতাউল্লাহ হোসাইনী (রহ.) কমপ্লেক্সের মাধ্যমে মসজিদ, মাদ্‌রাসা, দাতব্য চিকিৎসালয়, মাজার ও বার্ষিক ওরশ পরিচালনা করছেন।

(তথ্যসূত্র: ১। আনজুমন-২০১০, চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা ২শ বছর পূর্তি সংখ্যা, ২। জামালুদ্দীন ইউছুফ, দক্ষিণ হরিণা, আধুনগর, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম)

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)

আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ (রহ.) ১৮৯৮ সালে চট্টগ্রামের জেলার সাতকানিয়া উপজেলার বাবুনগর গ্রামের ঐতিহ্যবাহী মক্কার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ব পুরুষ **"ইয়াসিন মক্কী"** পবিত্র মক্কা নগরী থেকে বাংলাদেশে আগমন করেন। তাঁর পিতা মাওলানা নুরুল হুদা (রহ.) একজন প্রসিদ্ধ আলেম ও আধ্যাত্মিক সাধক ছিলেন। তিনি ভারতের উত্তর প্রদেশস্থ দেওবন্দ মাদ্‌রাসার অন্যতম স্থপতি মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীর (রহ.) শিষ্য বা মুরিদ ছিলেন।

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর স্ত্রীর নাম মরহুমা রহিমা খাতুন। তাঁর ৬ ছেলে ও ৪ মেয়ে। তাঁরা হলেন- (১) আবু ছফা মুহাম্মদ নাজিমুদ্দিন (অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা) (২) মরহুম আবু জিয়া মুহাম্মদ শামসুদ্দিন (মুক্তিযোদ্ধা ও রাজনীতিবিদ) (৩) মোছাম্মৎ জাহানারা বেগম (গৃহিনী) (৪) উম্মুল খাইর জয়নাব বেগম লুলু (গৃহিনী) (৫) মোছাম্মৎ হাফসা বেগম (গৃহিনী) (৬) আবুল ওফা মুহাম্মদ শিহাবুদ্দিন (৭) আবুল 'আতা মুহাম্মদ এমাদুদ্দিন (ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক) (৮) প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী (সংসদ সদস্য) (৯) ড. আবুল আলা মুহাম্মদ হোছামুদ্দিন (শিক্ষাবিদ) (১০) মরহুম উম্মুল ফজল হুমাইরা বেগম। আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) তাঁর পিতার কাছ থেকে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেন। তারপর সাতকানিয়ার তৎকালীন প্রসিদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারোগা স্কুলে ভর্তি হন। ১৯১৯ সালে চট্টগ্রাম মুহসিনিয়া মাদরাসা (বর্তমানে হাজী মুহাম্মদ মহিসন কলেজ) থেকে কৃতিত্বের সাথে ফাজিল পাশ করেন। ১৯২০ সালে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য তিনি ভারত যান। ১৯২৩ সালে তিনি ভারতের প্রসিদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাযাহির উলুম সাহারণপুর থেকে হাদিস, তফসীর, ফিকহ, দর্শন, যুক্তিবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। তিনি আল্লামা আশরাফ আলী থানভী (রহ.), আল্লামা খলিল আহমদ সাহারণপুরী ও আল্লামা আবদুল লতিফ (রহ.)-এর শিষ্যত্ব লাভ করেন। সাহারণপুরে অধ্যয়ন শেষে তাঁর মেধা বিবেচনায় তাঁকে ১৯২৩ সালে কলিকাতা আকড়া আলিয়া মাদ্রাসায় হেড মাওলানা পদে নিয়োগ দেয়া হয়। যোগ্যতা ও দক্ষতাবলে এক বছর পর তিনি ঐ মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ও মুহাদ্দিস পদে নিয়োগ লাভ করেন। ১৯৪৩ সালে ২য় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং লোহাগাড়ার চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্রাসার সুপারিন্টেডেন্ট পদে নিয়োগ লাভ করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি চুনতি ছেড়ে পদুয়া হেমায়তুল ইসলাম মাদ্রাসা ও সাতকানিয়া আলিয়া মাদ্রাসার পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৩ সালে

চুনতি মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ রেক্টর পদ সৃষ্টি করে তাঁকে পুনরায় বরণ করে নেন। ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত তিনি এ পদে বহাল থেকে মাদ্রাসার উন্নয়ন সাধন করেন। তাঁর সময়ে চুনতি মাদ্রাসায় তাঁর রচিত নাটক মঞ্চায়িত হত।

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) আরবী, উর্দু, ফার্সি, বাংলা, ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষায় দক্ষ ছিলেন। তিনি অসাধারণ সাহিত্যিক ও স্বভাব কবি ছিলেন। উর্দু, আরবী, ফার্সি ও বাংলা ভাষায় তিনি বহু কবিতা লিখেছেন। তাঁর কবিতা শ্রেণি বিন্যাস করলে দেখা যায়, তাঁর হরেক রকমের কবিতার সমাবেশ ঘটেছে। যেমন- হামদ, নাত, মর্সিয়া বা শোকগাঁথা, দেশাত্ববোধক ও ইসলামী জাগরণী কবিতা, গজল, শিক্ষামূলক, প্রশংসা গাঁথা এবং উপলক্ষীয় কবিতা ইত্যাদি। নিম্নে তাঁর একটি ইসলামী জাগরণী কবিতা বাংলায় তুলে ধরা হল-

বিশ্ব মুসলমান! বিশ্ব মুসলমান!! বিশ্ব মুসলমান!!!
প্রেম পথের অভিযানে মহানবীর গুলিস্তানে
শরীয়তের সংবিধানে তরীক্বতে হও আগুয়ান
বিশ্ব মুসলমান! বিশ্ব মুসলমান!!
বিশ্ববাজারে তোরা জাতি ছিলে সর্বসেরা
তোদের প্রশংসাতে সারা দুনিয়া ছিল আত্মহারা
আজ কেন এই অন্ধকারে হাবুডুবু মুহ্যমান
বিশ্ব মুসলমান! বিশ্ব মুসলমান!!

তাঁর ফতোয়া ও ফারায়েজ শিক্ষিত মহল এবং সর্বসাধারণের কাছে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য ও সমাদৃত ছিল। জ্যোতির্বিদ্যা,অংকশাস্ত্র ও জ্যামিতিতে পারদর্শী ছিলেন তিনি। অসংখ্য গ্রন্থ রচনা, অনুবাদ ও সংকলন করে তিনি কৃতিত্বের সাক্ষর রেখেছেন। তিনি ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত এদেশের প্রথম সীরতুন্নবী (স.) চুনতি সীরতুন্নবী (স.) মাহফিলের রূপকার ছিলেন। সচেতন রাজনীতিবিদও ছিলেন তিনি। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ১৯৭৯ সালে ৪ই মার্চ রবিবার ফযরের আযানের পর ৮২ বছর বয়সে চুনতি মাদ্রাসায় তিনি ইন্তেকাল করেন। ঐ দিন আছর নামাজের পর চুনতি ঐতিহাসিক সীরতুন্নবী (স.) ময়দানে তাঁর নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় ইমামতি করেন প্রখ্যাত আলেমেদ্বীন হযরত মাওলানা আমীনুল্লাহ (রহ.)। শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী চুনতি ফাতেমা বতুল মহিলা মাদ্রাসার পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)'র এর দীপ্তিমান জীবন স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য তাঁরই সুযোগ্য সন্তান মরহুম আবু জিয়া মুহাম্মদ শামসুদ্দিন, আবুল আতা মুহাম্মদ এমাদুদ্দিন, চট্টগ্রাম-১৫ (সাতকানিয়া-লোহাগাড়া) আসনের সংসদ সদস্য প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী ও ড. আবুল আলা মুহাম্মদ হোছামুদ্দিন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'নাযেমে আলা একাডেমী' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৯৮ সালে এ সংস্থার নাম পরিবর্তন হয়ে **"আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) ফাউন্ডেশন"** নামকরণ হয়। এ

ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে দেশে স্বেচ্ছাসেবামূলক উন্নয়ন কাজ পরিচালিত হচ্ছে।

(তথ্যসূত্রঃ এক নজরে আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)'র জীবনালখ্য- ড. আবুল আলা মুহাম্মদ হোছামুদ্দিন)

আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ মুফাদ্দলুর রহমান (রহ.)

আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ মুফাদ্দলুর রহমান (রহ.) প্রকাশ বড় মাওলানা ১৮২০ সালে চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার আমিরাবাদ সুখছড়ী গ্রামের ঐতিহ্যবাহী মাওলানা হাকিম উদ্দীন (রহ.)'র পরিবারে জন্ম গ্রহন করেন। প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষা তিনি নিজ বাড়ীতে শেষ করে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভারতের হুগলী মাদ্রাসায় ভর্তি হন। উক্ত মাদ্রাসা থেকে তিনি হাদিস,তফসীর ও ফিক্হ শাস্ত্রে কৃতিত্বের সাথে পাশ করেন। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ তাঁর মেধা ও চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে হেড মাওলানা পদে নিয়োগ দেন। সেখানে তিনি শিক্ষকতার পাশাপাশি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা শুরু করেন এবং আধ্যাত্মিক কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। ১৮৯২ সালে উক্ত মাদ্রাসা থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করে নিজ জন্মস্থান সুখছড়ী গ্রামে চলে আসেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। সুখছড়ী গ্রামে তাঁর নানার বাড়ীর অদুরে জায়গা ক্রয় করে থাকার ব্যবস্থা করেন। স্থাপন করেন মসজিদ ও মাদ্রাসা। পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, সাতকানিয়া মির্জাখীল গ্রামের বিখ্যাত সৈয়দ পরিবারের সদস্য মাওলানা সৈয়দ মতিউল্লাহ মিয়াজি (রহ.) ১৮১০ সালে সুখছড়ী গ্রামের খন্দকার পরিবারের যুগ শ্রেষ্ট আলেম মাওলানা হাকিম উদ্দীন (রহ.)'র একমাত্র কন্যার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। সৈয়দ মতি উল্লাহ মিয়াজি (রহ.)'র ওরশজাত তিন সন্তানের মধ্যে সৈয়দ মোহাম্মদ মুফাদ্দলুর রহমান (রহ.) সবার বড় ছিলেন। তিনি সুখছড়ী এলাকায় মানুষের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। আধ্যাত্মিক চর্চা ও ত্বরিকতের মাধ্যমে সুদুর আরাকান থেকে ফেনী পর্যন্ত হাজার হাজার মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন। ইসলাম সম্পর্কিত বিভিন্ন গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে (১) এহছানুল মো'মেনিন (২) ফজলুল মোত্তাকি (৩) ফজলুল ক্বারী (৪) ফতোয়া কিতাব ইত্যাদি।

তিনি এলাকায় সমাজ সংস্কার হিসেবে এবং আধ্যাত্মিকতায় ব্যাপক অবদান রেখেছেন। তিনি এলাকার মুসলিম জনগোষ্ঠিকে অপসংস্কৃতি থেকে বিরত রাখার জন্য ১৮৯৯ সালে ঘোড় দৌড় প্রতিযোগিতাসহ দুই ব্যাপী ওয়াজ মাহফিলের ব্যবস্থা করেন। এ সভা এলাকায় মফজ্জল মাওলানার সভা নামে খ্যাত। এ সভা অদ্যাবধি চালু রয়েছে। এ সভার বিশেষ আকর্ষণ শেষের দিন আছর নামাজ জামাতের সাথে আয়োজন। দক্ষিণ চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজার হাজার মুসল্লি এ জামাতে শরীক হন। তাঁর অনেকগুলো অলৌকিক ঘটনা রয়েছে, যা এখনো লোকমূখে শুনা যায়। তার মধ্যে অন্যতম হল- এক বর্ষায় টংকাবতী খালে ঢলের প্রভাবে খালের ধার চলে যায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত মসজিদের দেয়ালের পাশে। তাঁর রূহানী দোয়ার বদৌলতে রাতারাতি ঐ খালের ধার আধ কিলোমিটার উত্তর দিকে সরে যায়, যা অদ্যাবধি

বহমান। তাছাড়া তিনি বার আউলিয়ার সর্দার হরযত শাহপীর (রহ.)'র সাথে রূহানি যোগাযোগ রক্ষা করতেন। প্রায়ই তিনি ঘোড়ায় চড়ে চলাফেরা করতেন। যখনই তিনি ঘোড়ায় চড়ে শাহ্পীর (রহ.)'র মাজারের কাছাকাছি পৌঁছলে ঘোড়া থেকে নেমে যেতেন এবং কিছুদুর পায়ে হেঁটে গিয়ে ঘোড়ায় চড়তেন। এ ব্যাপারে তাঁর খাদেম তাঁকে প্রশ্ন করলে উত্তর দেন 'শাহ্পীর (রহ.)'র তাঁর সামনে উপস্থিত'।

১৯১৩ সালে ৯৩ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর নির্মিত মসজিদের পাশে তিনি শায়িত আছেন। তাঁর পিতা-মাতার কবরস্থান নানা বাড়ীর পারিবারিক কবরস্থানে। তাঁর নানাজান মাওলানা হাকিম উদ্দীন (রহ.), মাওলানা মুহাম্মদ হাসান রউফীর প্রপিতামহের আব্বাজান ছিলেন। উল্লেখ্য, মাওলানা হাকিম উদ্দীন (রহ.)'র পূর্ব পুরুষ ১৬ শতকের শুরুর দিকে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে সুখছড়ী গ্রামে আসেন। (তথ্যসূত্র: মাওলানা মুহাম্মদ হাসান রউফী, সুখছড়ী, আমিরাবাদ, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম)

হযরত শাহ ছুফি পেঠান শাহ (রহ.)

হযরত শাহ ছুফি পেঠান শাহ (রহ.) একজন অলিকুল শিরোমণি ছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলার পদুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জিন্নাত আলী শাহ এবং মাতার নাম লাতু বিবি। শৈশবে তিনি পিতাকে হারান। মায়ের অফুরন্ত স্নেহে তিনি প্রতিপালিত হন। তাঁর জন্মতারিখ নিয়ে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া না গেলেও এলাকার প্রবীণ লোকদের মতে, তিনি ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪১ সালের ২ অক্টোবর (১৭ আশ্বিন, ১৯ রমজান) সোমবার ৬১ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন।

শাহ ছুফি পেঠান শাহ (রহ.) কৈশোরকাল থেকে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের আশায় নিজ বাড়ির পূর্ব দিকে গভীর জঙ্গলে গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। দিনের বেলায় বাড়িতে থাকতেন না তিনি। গভীর রাতে বাড়ি ফিরে মায়ের বুকে ঘুমাতেন। তাঁর এই কার্যক্রম মানুষের মনে কৌতুহলের সৃষ্টি করে। ফলে মানুষরা তাঁকে **"পেঠান পাগলা"** নামে সম্বোধন করতেন। সকলের নিকট তিনি **"পেঠান পাগল"** নামে বেশ পরিচিত ছিলেন। জনশ্রুতি আছে, শাহ ছুফি পেঠান শাহ (রহ.) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় গভীর জঙ্গলের একটি গাব গাছের নিচে বসে আল্লাহর ধ্যানে মশগুল থাকতেন। এ অবস্থায় তাঁর চারিপাশে বনের পশু বাঘ, হাতি, ভাল্লুক ইত্যাদি হিংস্র পশুরা তাঁকে পাহারা দিতেন। সময়ে সময়ে তিনি বাঘের পিঠে চড়ে গভীর বন-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন। এ রকম তাঁর বহু কারামতের কথা এখনো লোকমুখে শুনা যায়।

হযরত শাহ ছুফি পেঠান শাহ (রহ.) এর বড় ভাই হামিদ আলী রেঙ্গুনে (বর্তমান মিয়ানমার) থাকতেন। হামিদ আলী রেঙ্গুনের এক মহিলাকে বিবাহ করে বসবাস করতে থাকেন। তাঁর মা ও ছোট ভাই পেঠান শাহ (রহ.) এর সাথে ছিল না কোন

যোগাযোগ। এ অবস্থায় তাঁর মা সবসময় বড় পুত্রের জন্য কান্নাকাটি করতেন। পেঠান শাহ (রহ.) মায়ের কান্নাকাটি থামানোর চেষ্টা করতেন। একদিন রাগের বশে পেঠান শাহ (রহ.) তাঁর মায়ের সামনে একটি বাঘ এনে উপস্থিত করায়। মা তখন ভয় পেয়ে যায়। তখন মা বুঝতে পেরেছেন তাঁর পুত্র পেঠান শাহ আল্লাহর সান্নিধ্যে স্বীকৃতি লাভে সক্ষম হয়েছেন। একদিন পেঠান শাহ তাঁর মাকে বললেন, রেঙ্গুনে যাব বড় ভাইয়ের সাথে দেখা করতে। সকালে ভাতের মুচা বেঁধে দিও। ছেলের কথা বিশ্বাস করতে না পারলেও মা ভাতের মুচা বেঁধে দিলেন। পেঠান শাহ (রহ.) মায়ের হাত থেকে ভাতের মুচাটি নিয়ে রেঙ্গুনে যাচ্ছি বলে ঘরের ছাদে ওঠে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। রেঙ্গুনে গিয়ে বড় ভাইয়ের সাথে দেখা করে মায়ের দেয়া ভাতের মুচাটি দিলেন এবং বললেন, বাড়িতে গিয়ে মায়ের সাথে দেখা কর। মা তোমার জন্য সবসময় কান্নাকাটি করছে। এ কথা বলে তিনি আবার অদৃশ্য হয়ে গেলেন। মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে পদুয়ার ঘরের ছাদ থেকে নেমে এসে মাকে বললেন, আমি রেঙ্গুনে তোমার ছেলের সাথে দেখা করেছি। তোমার ছেলে আগামী শুক্রবার আসবে। এ কথা মা বিশ্বাস করতে পারলেন না। বড় ছেলে হামিদ আলী ঠিক সময়ে ফিরে আসায় মা অবাক হয়ে গেলেন। তখন মা পরিষ্কার বুঝতে পারলেন তাঁর ছোট ছেলে পেঠান শাহ (রহ.) একজন পীর-আউলিয়া। পেঠান শাহ (রহ.) এর বহু কারামতের মধ্যে নিম্নের কারামতটি বহুল আলোচিত। তিনি একদিন দুপুরে পুকুরে গোসল করতে যান। পানিতে ডুব দিয়ে তিনি আর ওঠে আসেন নি। তাঁর পরিবারের সদস্য ও ভক্তরা পুকুরে নেমে অনেকবার অনুসন্ধান করেও তাঁর কোন হদিস পাননি। অবশেষে স্থানীয় একজন ডুবুরী (জলদাশ)'কে দিয়ে পুনরায় তাঁর হদিস নেয়া হল। ডুবুরির বর্ণনা মতে, পেঠান শাহ (রহ.) গভীর পানিতে বসে ধ্যানে মগ্ন রয়েছেন। এ কথা শুনে তাঁর পরিবারের সদস্য ও ভক্তরা আনন্দিত হয়ে ওঠে। তক্ষণে তিনি সকলের অগোচরে পুকুর থেকে ওঠে আসলেন।

অলিকুল শিরোমণি হযরত শাহ ছুফি পেঠান শাহ (রহ.) অসংখ্য ভক্তদের ছেড়ে চিরবিদায় নিলেন ১৯৪১ সালের ২ অক্টোবর। বড় ভাই হামিদ আলীর বাম পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর নামে সৃষ্টি হয় মাজার। প্রতিবছর ১ চৈত্র ও ১৭ আশ্বিন তাঁর ওরশ মোবারক অনুষ্ঠিত হয়। দূর-দূরান্ত থেকে হাজার হাজার ভক্ত এবং বিপুল সংখ্যক নারী-পুরুষ ও শিশুসহ সকল বয়সী মানুষ মাজার প্রাঙ্গণে জড়ো হয়। মাজার জেয়ারত, জিকির, কোরআন তেলাওয়াত এবং নানা মরমী গানে মুখরিত হয়ে ওঠে মাজার প্রাঙ্গণ।

তথ্যসূত্র: ১। অলিকুল শিরোমণি হযরত শাহ ছুফি পেঠান শাহ (রহ.) এর জীবনী ও কারামত, ২। দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ জুলাই ২০১৫।

হযরত মাওলানা শাহ হাফেজ আহমদ (রহ.)

হযরত মাওলানা শাহ হাফেজ আহমদ (রহ.) যিনি শাহ সাহেব কেবলা চুনতি নামে পরিচিত। শাহ সাহেব কেবলা ১৯০৪ সালে চুনতি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মাওলানা সৈয়দ আহমদ (রহ.) এবং মাতার নাম হাজেরা খাতুন। তাঁর পূর্ব পুরুষরা আরব দেশ থেকে এখানে আসেন। তাঁর পূর্ব পুরুষ হযরত শাহ আলম খন্দকার আরব দেশ হতে স্থল পথে দিল্লীতে আসেন। দিল্লী হতে নৌপথে চট্টগ্রামের অনোয়ারা আসেন। সেখান থেকে বাঁশখালী উপজেলার কালীপুর গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। পরবর্তীতে তাঁর পুত্র ইব্রাহীম খন্দকার চুনতিতে এসে বসতি স্থাপন করেন। বিখ্যাত আলেম ও দরবেশ কাজী মুহাম্মদ ইউসুফ আলী (রহ.) হযরত শাহ সাহেব কেবলার দাদাজান। কাজী ইউসুফ আলী আরাকানের জমিদার ছিলেন।

হযরত শাহ সাহেব কেবলা বাঁশখালীর ছনুয়া মাদ্রাসা, চট্টগ্রামের চন্দনপুরা দারুল উলুম আলীয়া মাদরাসা ও কলিকাতা আলীয়া মাদরাসায় পড়ালেখা করেন। কলিকাতা আলীয়া মাদরাসা থেকে ফাজিল ডিগ্রী অর্জন করেন। কলিকাতা আলীয়া মাদরাসা থেকে অসুস্থ অবস্থায় দেশে ফিরে আসেন। তারপর দাদার জমিদারী দেখার জন্য আকিয়াবের (বর্তমান মিয়ানমার) চলে যান। সেখানে তিনি মসজিদের ইমাম ও খতিবের দায়িত্ব পালন করেন। কিছুদিন পর ইমামতির দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে তিনি পাহাড়-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এভাবে ২০/২২ বছর তিনি পাহাড়-জঙ্গলে, শহরে-বন্দরে, ঝড়-বৃষ্টিতে আল্লাহর জিকির ও হযরত মুহাম্মদ (স.) এর প্রশংসা করে বেড়াতেন। মাঝে-মধ্যে তিনি চুনতিতেও আসতেন। তাঁর অনেক কারামতের কথা এখনো লোকমুখে শুনা যায়। আরকান সড়কের গাড়ি চালকদের নিকট তাঁর প্রথম কারামত প্রকাশ পায়। ওই সময়ে আরকান সড়ক কাঁচা থাকায় চালকদের গাড়ি চলাচলে কষ্ট হত। চালকদের সাহায্যার্থে শাহ সাহেব কেবলা উপস্থিত হতেন। ফলে দক্ষিণ চট্টগ্রাম সাধারণ মানুষের কাছে তিনি চুনতির **"হাফেজ মামু"** নামে পরিচিতি লাভ করেন। জনশ্রুতি আছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্রবাহিনীর গাড়ি বহর আরকান সড়কের ঢালায় আটকা পড়েছিল। এমন সময় পাশের গভীর জঙ্গলে মানুষের উপস্থিতি দেখে মিত্রবাহিনী গুলি চালালেন। কিছুক্ষণ পর এক লোক কিছু গুলি হাতে নিয়ে গাড়ির নিকট আসল। তখন মেজর তাঁকে সম্মান করে গাড়িতে তুলে নিলেন এবং সীটে বসালেন। লোকটি চালককে গাড়ি চালাতে বললেন। গাড়ি সচল হয়ে গেল। সেই লোকটি হল শাহ সাহেব কেবলা। ফলে আরকান সড়কে গাড়ি চালকদের নিকট শাহ সাহেব কেবলা একজন অলি ও দরবেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এরকম অনেক কারামতের ঘটনা শাহ সাহেব কেবলা দেখিয়েছেন।

শাহ সাহেব কেবলা ১৯৭২ সালের ১১ রবিউল আউয়াল ঐতিহাসিক চুনতি সীরতুন্নবী (স:) মাহফিল প্রবর্তন করেন। এই মাহফিল ১৯৭৩ সালে ২ দিন, ১৯৭৪ সালে ৩ দিন, ১৯৭৫ সালে ৫ দিন, ১৯৭৬ সালে ১০ দিন, ১৯৭৭ সালে ১২ দিন, ১৯৭৮ সালে ১২ দিন, ১৯৭৯ সালে ১৫ দিন, ১৯৮০ সালে ১৯ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়ে

আসছে। এর পর থেকে ধারাবাহিকভাবে ১৯ দিন ব্যাপী সীরতুন্নবী (স.) মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ১৯৮৩ সালে মাহফিলের ১৯ দিন আগে শাহ সাহেব কেবলা ইন্তেকাল করেন। চুনতি সীরত ময়দানের পাশে তাঁর মাজার রয়েছে। অসংখ্য ভক্তরা প্রতিনিয়ত তাঁর মাজার জেয়ারতে আসেন।

(তথ্যসূত্র: স্মৃতির পাতায় হযরত শাহ সাহেব কেবলা চুনতি- মিঞা মোহাম্মদ গোলাম কবির)

হযরত আল্লামা শাহ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)

খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হতে অনেক আরব বণিক ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রামে আসেন এবং স্থায়ী-অস্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে অনেক সুফী সাধকও এদেশে আসেন। আগত সুফী সাধকের দ্বারা দেশে পরিবারের উদ্ভব ঘটে। তার মধ্যে মিয়াজি পরিবার অন্যতম। সে মিয়াজি পরিবারের একজন ছিলেন মাওলানা ওয়াছি উদ্দীন মিয়াজি। চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার বড়হাতিয়া ইউনিয়নের মিয়াজি পাড়ায় তাঁর স্থায়ী নিবাস। তাঁর বংশগত উপাধি ছিল মিয়াজি। বংশীয় নামানুসারে পাড়ার নামকরণ হয় মিয়াজি পাড়া। মাওলানা ওয়াছি উদ্দীন মিয়াজির মেজো সন্তান হযরত আল্লামা শাহ মাওলানা আবদুল জব্বার (রহ.) পীর সাহেব কেবলা বায়তুশ শরফ চট্টগ্রাম। তাঁর আরেক নাম মাওলানা। মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে কামিল আল হাদিস পাস করেন বলেই তাঁর শিক্ষাগত উপাধি হয়েছে মাওলানা। ঐতিহাসিকদের মতে, পীর সাহেব কেবলার পূর্বপুরুষ আরব বংশোদ্ভূত। ১৮৫২ সালে আরাকানসহ দক্ষিণ বার্মা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্তির পর সামুদ্রিক জাহাজে মাঝি-মাল্লা, সারেং প্রভৃতি পদে চট্টগ্রামের মুসলমানদের নিয়োগ দেয়া হতো। ফলে বর্তমান মিয়ানমারের আকিয়াবে চট্টগ্রাম অঞ্চল হতে মুসলমান গমনের হিড়িক পড়ে যায়। সে সুবাদে মাওলানা ওয়াছি উদ্দীন মিয়াজির বিয়ের আড়াই বছর পর প্রথম পুত্র আবদুল কুদ্দুসসহ সস্ত্রীক বার্মায় গমন করেন। ১৯৩৩ সালের ১ ফেব্রুয়ারী বর্তমান মিয়ানমারের থাংগু জেলার কালাবস্তি বাঙালি কলোনিতে মাওলানা আবদুল জব্বার (রহ.) এশার নামাজের জামাত চলাকালীন সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। মাওলানা আবদুল জব্বার (রহ.) এর মাতার নাম ফিরোজা খাতুন। মাওলানার মাতা ফিরোজা খাতুন বড়হাতিয়া ইউনিয়নের ইয়াছিন পাড়ার আমতলী গ্রামের সিকদার বংশের এক ভাগ্যবতী মহিলা ছিলেন।

শাহ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)'র বয়স যখন আড়াই বছর তখন তাঁর পিতা এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। সুচিকিৎসার জন্য বার্মার রেঙ্গুন হাসপাতালে ভর্তি হন। সুস্থ না হওয়ায় তিনি ১৯৩৬ সালে নিজ এলাকা বড়হাতিয়ার মিয়াজি পাড়ায় চলে আসেন। রোগে আক্রান্ত অবস্থায় ২/৩ মাস পর তিনি নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেন। পিতার মৃত্যুর পর অসহায় কিশোর আবদুল জব্বার (রহ.) এর মাতা ফিরোজা খাতুন তাঁর একমাত্র অভিভাবকে পরিণত হলেন। মাত্র ৫ বছর বয়সে প্রতিবেশি মাওলানা আবদুল করিমের বাড়িতে আবদুল জব্বার (রহ.) কে কুরআন শিক্ষার জন্য দেন। এক বছরের মধ্যে মাওলানা কুরআন শরীফ শুদ্ধভাবে মুখস্থ করে ফেলেন। ১৯৪০ সালে

আবদুল জব্বার (রহ.) কে ৭ বছর বয়সে সাতকানিয়া গারাঙ্গিয়া ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসায় ভর্তি করানো হয়। ১৯৪৭ সালে তিনি কৃতিত্বের সাথে ওদ্মাদ্‌রাসা থেকে দাখিল পাস করেন। ১৯৪৯ সালে আলিম এবং ১৯৫১ সালে ফাজিল কৃতিত্বের সাথে পাস করেন। ১৯৫১ সালে চট্টগ্রামের দারুল উলুম আলীয়া মাদ্‌রাসায় কামিলে ভর্তি হন। ১৯৫৩ সালে এ মাদরাসা থেকে হাদিস বিভাগ হতে কামিল ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৫৪ সালের জানুয়ারী মাসে পাঁচলাইশ ওয়াজেদিয়া আলীয়া মাদরাসায় তিনি ইলমুল হাদিসের শিক্ষক হিসেবে মোফাচ্ছির পদে যোগদান করেন। এ মাদ্‌রাসায় একটানা ১৪ বছর পর্যন্ত শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৫৩ সালের ১০ মার্চ তিনি আমিরাবাদ ইউনিয়নের মল্লিক ছোবহান গ্রামের ঠান্ডা মিয়ার কন্যা মনছুরা বেগমের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

আল্লামা আবদুল জব্বার (রহ.)'র বয়স যখন ২ মাস ৩ সপ্তাহ তখন তাঁর মা স্বপ্ন দেখলেন তাঁর সন্তান দুধ পান করছে। হঠাৎ মাওলানা দুধ ছেড়ে দিয়ে চোখ বড় বড় করে উপরের দিকে তাকিয়ে আল্লাহ, আল্লাহ শব্দটি খুবই স্পষ্টভাবে বলছেন। অপরদিকে, মাওলানা (রহ.)'র বয়স ঠিক ৩ মাস পূর্ণ হয় তখন উঠানে দোলনায় থাকা মাওলানা দোলনায় কাৎ হয়ে আল্লাহ, আল্লাহ বলে জিকির করেছেন। এ জিকির তাঁর মা ও আমিরাবাদের নুরুদ্দিন ফকির স্পষ্টভাবে শুনতে পায়। ৬ মাস বয়স পর্যন্ত আল্লাহ, আল্লাহ বলে জিকির করতেন তিনি। তারপর থেকে তাঁর এই জিকির আর শোনা যায়নি। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। আরবী, ফার্সী, উর্দু ও বাংলা ভাষায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন তিনি। তাঁর মুর্শিদ ছিলেন কুতুবুল আলম শাহ সুফী হযরত মাওলানা মীর আখতার (রহ.)। মাওলানার মুর্শিদ একজন আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন কামেল মানুষ ছিলেন। মাওলানা যখন আলিম ক্লাসের ছাত্র ছিলেন তখন তাঁর মুর্শিদ গারাঙ্গিয়া মাদরাসার বার্ষিক সভায় প্রধান মেহমান হিসেবে আসেন। ঐ সভায় মাওলানার পরিবেশিত না'ত শুনে তাঁর মুর্শিদ তাঁকে পূর্ণ স্নেহের মায়াবন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলেন। যখন তাঁর মুর্শিদ বড়হাতিয়ার কুমিরাঘোনায় এসেছেন তখনও মাওলানাকে খুঁজেছেন। শুনতেন তাঁর না'ত। আরেক দিন মাওলানার না'ত শুনে তাঁর মুর্শিদের চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে অন্যরূপ ধারণ করে। বেঁহুশ অবস্থায় মাটিতে পড়ে যান। মাওলানার সাথে তাঁর মুর্শিদের সাক্ষাতের পর থেকে সময়ে-অসময়ে মাওলানার না'ত শুনে মাওলানার নিজের অজান্তে মুর্শিদের সুনজরে আসেন। এমনকি সাতকানিয়া গারাঙ্গিয়ার হযরত শাহ মাওলানা আবদুল মজিদ (রহ.) সাহেব প্রকাশ বড় হুজুর, চট্টগ্রাম শাহী জামে মসজিদের পেশ ইমাম আওলাদে রসুল (স.) ছৈয়দ আবদুল আহাদ আল মাদানীও মাওলানাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। অবশেষে ১৯৪৮ সালে আলিম প্রথম বর্ষে অধ্যয়নকালে পবিত্র শবে-বরাত'র রজনীতে তাঁর মুর্শিদ মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতার (রহ.) তাঁকে বায়াত করান। চট্টগ্রাম ষ্টেশন মসজিদে মুর্শিদের হুজরাখানায় মুর্শিদের নির্দেশে মাওলানা না'ত শুনালেন। তখন মাওলানার মুর্শিদ মাওলানাকে বুকে জড়িয়ে ধরে দোয়া করেন। বিদায় দেওয়ার প্রাক্কালে মাওলানার মুর্শিদ বুকে জড়িয়ে ধরে প্রাণভরে দোয়া করলেন। উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করে বললেন তোমরা সকলে

আবদুল জব্বার (রহ.) কে সম্মান করবে। লোহাগাড়া উপজেলার দরবেশহাটের উত্তর পাশে মাওলানা মুর্শিদ এক মাহফিলে যাচ্ছিলেন। যাত্রাপথে মাগরিবের নামাজ আদায়ের পর হযরত শাহপীর (রহ.)'র মাজার জিয়ারত করেন। তাঁর সাথে মাওলানাও ছিলেন (মাওলানা তখন অল্প বয়স্ক ছাত্র)। জিয়ারতের এক পর্যায়ে মাওলানার মুর্শিদ উপস্থিত সকলকে বললেন শাহপীর আউলিয়ার মধ্যস্থতায় সাইয়্যেদুনা হযরত গৌছে পাকের পক্ষ থেকে বাতেনী সংবাদ-তোমাদের নিকট আবদুল জব্বার নামের যে ছেলে দাঁড়িয়েছে আছে সে আমার রূহানি ছেলে। মুর্শিদের নির্দেশে পাঁচলাইশ ওয়াজেদিয়া মাদ্‌রাসায় মোহাদ্দেসের চাকুরী ছেড়ে চট্টগ্রামের কদমতলীতে মুর্শিদের সান্নিধ্যে চলে আসে মাওলানা। তখন থেকে মুর্শিদের সাথে মাওলানার প্রকৃত ভাব বিনিময় শুরু হয়। শুরু হয় মাওলানার কঠোর অনুশীলন। সমগ্র রজনী মাওলানা আল্লাহর জিকির ও ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে অতিবাহিত করতেন। এভাবে তিনি কঠোর সাধনায় মারফতের প্রগাঢ় জ্ঞানের অধিকারী হয়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভে সমর্থন হয়েছিলেন। হযরত মীর মোহাম্মদ আখতার (রহ.) তাঁর খেলাফতের দায়িত্ব অর্পণের জন্য মাওলানা আবদুল জব্বার (রহ.) কে গড়ে তুললেন। তাঁর মুর্শিদ তাঁকে কুতুবুল আখতার অর্থাৎ কুতুবদের কুতুব বলেছেন। মাওলানার মুর্শিদ উপস্থিত সকলকে মাওলনার পিছনে মোনাজাত করতে বলতেন। বলতেন ভবিষ্যতে সবাইকে মাওলানার পেছনে থাকতে হবে। মাওলানার মুর্শিদ চট্টগ্রামের মাদার বাড়িতে তাঁরই কাছের মসজিদে পবিত্র জুমার নামাজ আদায় করতেন। প্রতি বৃহস্পতিবার মাগরিবের নামাজের পর তাঁর মুর্শিদ কর্তৃক জিকির ও দীর্ঘ মুনাজাত হত। মাওলানার মুর্শিদ ভক্তদের অভিপ্রায়ে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিলেন। ১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু হয় এবং ২১ নভেম্বর বৃহস্পতিবার রাতে উক্ত মসজিদে বায়তুশ শরফে প্রথম তারাবি শুরু হয়। ২২ নভেম্বর মাওলানার মুর্শিদের ইমামতিতে প্রথম জুমা হয়। সেদিই তাঁর মুর্শিদ মসজিদের নাম ঘোষণা করেন মসজিদে বায়তুশ শরফ। মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা কুতুবুল আলম শাহ সুফী হযরত মাওলানা মীর আখতার (রহ.) ১৯৭১ সালের ৫ ফেব্রুয়ারী সৌদি আরবে পবিত্র হজ্ব পালনকালে ইন্তেকাল করেন। ইন্তেকালের পূর্বে তিনি খেলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করেন হযরত আল্লামা শাহ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)'র উপর। দায়িত্ব পেয়ে মাওলানা মুজাদ্দেদে আলফেসানী কিংবা শাহ মুখদুমের ন্যায় ইসলামের মশাল নিয়ে ধর্মসংস্কারক হিসেবে এগিয়ে যান। তিনি সমাজে মদ-জুয়া, ব্যভিচার-শিরক বিদআতের বিরুদ্ধে সবসময় সোচ্চার ছিলেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়- লোহাগাড়া উপজেলার দরবেশহাট এলাকায় অবস্থিত চট্টগ্রাম বার আউলিয়ার এক অলী হযরত শাহপীর (রহ.)'র মাজার। দীর্ঘদিন যাবৎ ঐ মাজারকে কেন্দ্র করে ওরশের নামে অশালীন নাচ-গানের আসর হতো। অনেকে শরীয়ত বিরোধী কর্মকান্ডে লিপ্ত থাকত। মাওলানা স্বীয় জাগতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে সে অনৈসলামিক কর্মকান্ড উচ্ছেদ করলেন। ওয়াজ-নছিয়ত ও মিলাদ- মাহফিলের ব্যবস্থা করলেন। বড়হাতিয়ায় প্রতিবছর ১২-১৩ বৈশাখ বলি খেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছিল। দীর্ঘ ৪০ বছর যাবৎ এ বলি খেলা হয়ে আসছে। স্থানীয়

প্রভাবশালী মরহুম ছিদ্দিক আহমদ চৌধুরী এ খেলার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মাওলানা ১৯৭৭ সালে বলি খেলা বন্ধ করলেন। বলি খেলার স্থানে প্রতি বছর ১১-১২ বৈশাখ (১৯৭৭ সাল হতে) সীরত মাহফিলের আয়োজন করলেন। জাবালে সীরত বা সীরাতের পাহাড় হিসেবে বেশ পরিচিতি লাভ করল এটি।

হযরত মাওলানা আবদুল জব্বার (রহ.) তথাকথিত কোন পীর ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন সংস্কারক ও মহৎ প্রাণ আলেম ব্যক্তিত্ব। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে ব্যয় করেছেন। জীবদ্দশায় তিনি অসংখ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। শুধু মসজিদ, মাদরাসা ও এতিমখানা নয়, অনেক দাতব্য চিকিৎসালয়, সেবা ও কর্মসংস্থানমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। তিনি ইসলামী ব্যাংক, চট্টগ্রাম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অবদান রেখেছেন। তিনি রচনা করেছেন অনেক গ্রন্থ। বায়তুশ শরফ চট্টগ্রামের এ পীর-আউলিয়া ১৯৯৮ সালের ২৫ মার্চ সকালে ইন্তেকাল করেন। পরদিন ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসে চট্টগ্রাম পলোগ্রাউন্ড মাঠে সকাল সাড়ে ১০ টায় লাখ লাখ ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদের উপস্থিতিতে তাঁর নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানার সাহেবজাদা আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী জানাযায় ইমামতি করেন। মাওলানার হাতে গড়া চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় বায়তুশ শরফ মসজিদ ও বায়তুশ শরফ আদর্শ আলীয়া মাদরাসার মধ্যবর্তী ফুল বাগানের সামনে মাওলানাকে চিরন্তন শয্যায় শায়িত করা হয়।

(তথ্যসূত্রঃ হযরত আল্লামা শাহ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)'র জীবন ও আদর্শ-মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী ও জাকিয়া সুফিয়ান)।

মাওলানা শাহ হাবিব আহমদ (রহ.), পীর সাহেব কেবলা চুনতি

উপমহাদেশের প্রখ্যাত আধ্যাত্মিক সুফী সাধক হযরত শাহ হাফেজ হামেদ হাসান আলভী আজমগড়ী (রহ.)'র অন্যতম খলিফা হযরত শাহ মাওলানা নজির আহমদ (রহ.)'র একমাত্র পুত্র শাহ মাওলানা হাবিব আহমদ (রহ.)। তিনি চুনতি পীর সাহেব কেবলা নামে পরিচিত। চুনতি পীর সাহেব কেবলা ১৯২২ সালে ঐতিহাসিক চুনতি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হযরত শাহ মাওলানা নজির আহমদ (রহ.) চুনতির বিখ্যাত মুফতি মাওলানা হাজী ইউসুফ (রহ.)'র দৌহিত্র ছিলেন। তাঁর মাতা মোছাম্মৎ খাইরুন্নেছা বেগম চুনতির দুই আধ্যাত্মিক সাধক হযরত মাওলানা আবদুল হাকিম (রহ.) ও হযরত মাওলানা শুকুর আলী মুন্সেফ (রহ.)'র প্রপৌত্রী ছিলেন।

পীর সাহেব কেবলা চুনতি প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ফাজিল পর্যন্ত চট্টগ্রামের দারুল উলুম আলীয়া মাদরাসায় সম্পন্ন করেন। ঐ সময়ে তাঁর পিতা ঐ মাদরাসার হেড মাওলানা ছিলেন। পরবর্তীতে ১৯৪৪ সালে কলিকাতা সরকারি আলীয়া মাদরাসা থেকে কামিল (হাদিস) ডিগ্রী অর্জন করেন। আলিম-ফাজিল কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় অবিভক্ত বাংলায় তিনি দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন। কামিল পাস করে তিনি যখন কর্মজীবনে প্রবেশের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখন তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন। পিতার ইন্তেকালে পারিবারিক

শূন্যতা সৃষ্টি হলে এলাকার মুরব্বিদের অনুরোধে তিনি চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৭১ সালে তাঁকে ওই মাদ্‌রাসায় অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ দেয়া হয়। ১০/১২ বছর অধ্যক্ষ পদে থেকে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৮২ কিংবা ১৯৮৩ সালের দিকে মাওলানা শফিক আহমদকে অধ্যক্ষের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন। ১৯৭৬ সালে মাওলানা হাবিব আহমদ (রহ.) মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ থাকাকালীন মাদ্‌রাসা কামিল পর্যায়ে স্বীকৃতি লাভ করে।

শাহ মাওলানা হাবিব আহমদ (রহ.) পারিবারিকভাবে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক চেতনার ছিলেন। তাঁর কাছে কেউ ত্বরীকতের ছবক নিতে আসলে তিনি বলতেন আমি আমার পীর থেকে যা শিখেছি তা প্রচার ও শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছি। ১৯৪৪ সালে তাঁর পিতার ইন্তেকালের পূর্বে একদিন রাতে তিনি স্বপ্নে দেখলেন তাঁর পিতার পীর শাহ ছৈয়দ হাফেজ হামেদ হাসান আলভী আজমগড়ী (রহ.) তাঁকে হাত ধরে বড় পীর সাহেবের সম্মানে নিয়ে গেলেন। বড় পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) তাঁর হাত ধরে হুজুর (স.) এর সামনে নিয়ে গেছেন। সেখানে তিনি দেখতে পেলেন আসমান পর্যন্ত পরিষ্কার এক অসাধারণ নূরের জ্যোতি। এমতাবস্থায় তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। পুরো ঘটনা তিনি অসুস্থ পিতাকে জানালেন। তখন তাঁর পিতা বললেন এটি খুবই ভালো স্বপ্ন। তোমাকে ত্বরীকতে প্রবেশ করার জন্য ইশারা করা হয়েছে। তুমি শাহ মাওলানা আবদুস সালাম আরকানী (রহ.)'র কাছে বায়াত গ্রহণ করবে। চুনতি পীর সাহেব ২০০৬ সালের ২৬ নভেম্বর ইন্তেকাল করেন। তাঁর ইন্তেকালের দিনে একটি অলৌকিক ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হলো। চুনতি চান্দা গ্রামের একজন বয়স্ক লোক যিনি পীর সাহেবের মুরিদ ছিলেন। ওই দিন সকালে লোকটি কাঠ কাটার জন্য পাহাড়ে যান। গভীর অরণ্যে লোকটি বাঁশ কাটছিলেন, এমন সময় দেখতে পেলেন হযরত শাহ সাহেব কেবলা ও চুনতি পীর সাহেব কেবলা তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। এ থেকে বুঝা যায় চুনতি পীর সাহেব কেবলা একজন পীর আউলিয়া ছিল। বার্ধিক্যজনিত কারণে পীর সাহেব কেবলা ত্বরিকতের কার্যক্রমকে সচল রাখার জন্য তাঁর আস্থাভাজন ও ত্বরিকতের দীর্ঘদিনের সাথী মাওলানা মোঃ ওবায়দুর রহমানকে ১৯৯৮ সালে খেলাফতের দায়িত্ব প্রদান করেন। মাওলানা মোঃ ওবায়দুর রহমান শুকুর আলী মুন্সেফের ছোট ভাই এনায়েত আলী উকিল পরিবারের সন্তান। এছাড়া তিনি চট্টগ্রাম নাছিরাবাদ সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান ধর্মীয় শিক্ষক ছিলেন। (তথ্যঃ আল্লামা শাহ হাবিব আহমদ (রহ.)'র বর্ণাঢ্য জীবন ও কর্ম স্মরণে মুযাক্কিরা, প্রকাশ কাল-২০১০।

লোহাগাড়ার হযরত আজমগড়ী (রহ.)'র খলিফাগণ

হযরত হাফেজ হামেদ হাসান আলভী আজমগড়ী (রহ.) ভারতের উত্তর প্রদেশের আজমগড় জেলার কোহান্ডী গ্রামে ১৮৭২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হযরত শেখ করিম বখশ (রহ.)। তাঁর পিতা চিশতীয়া নেজামিয়া ত্বরীকার পীর ছিলেন। তাঁর পিতার সাথে আল্লাহর অন্যতম অলী হযরত সৈয়দ আবদুল বারী (রহ.)

এর সুসম্পর্ক ছিল। সে সুবাদে হযরত আজমগড়ী (রহ.) হযরত ছৈয়দ আবদুলবারী (রহ.) এর হাতে মুরিদ হন। হযরত ছৈয়দ আবদুল বারী (রহ.)'র ইন্তেকালের পূর্বে হযরত আজমগড়ী (রহ.) খেলাফত প্রাপ্ত হন। তাঁর পীর হযরত ছৈয়দ আবদুল বারী (রহ.)'র কবর জিয়ারতের মাধ্যমে নিজেকে ত্বরীকতে আত্মনিয়োগ করেন।

হযরত আজমগড়ী (রহ.) বছরে একবার শরীয়ত ও ত্বরীকতের খেদমতের উদ্দেশ্যে বার্মা (মিয়ানমার) ও চট্টগ্রাম সফর করতেন। তিনি চট্টগ্রাম শহর থেকে নদী পথে চুনতি গমন করতেন। চট্টগ্রাম শহরের চাকতাই থেকে নৌকাযোগে সাতকানিয়া গাটিয়াডেঙ্গাস্থ বাহারহাট ষ্টেশনে পৌঁছতেন। সেখান থেকে ছোট নৌকাযোগে আধুনগর খান হাটে পৌঁছতেন। এখান থেকে ঘোড়া, পালকি ইত্যাদি যোগে চুনতিতে আসতেন। এ মহান আল্লাহর অলী উত্তর প্রদেশের বিভাগীয় শহর ঘোন্ডানগরীতে শায়িত আছেন। ভারত, পাকিস্তান, মিয়ানমার, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার অঞ্চলে হযরত আজমগড়ী (রহ.)'র ৪৪ জন খলিফা রয়েছেন। তিনি তাঁর খলিফাগণকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। কুতুবুল আলম সুলতানুল আউলিয়া হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মজিদ (রহ.) বড় হুজুর গারাঙ্গিয়া হযরত আজমগড়ী (রহ.)'র খলিফাগণকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে মূল্যায়ন করতেন। হযরত আজমগড়ী (রহ.)'র ৪৪ জন খলিফার মধ্যে চট্টগ্রামের লোহাগাড়ার খলিফাগণ হলেন হযরত মাওলানা নজির আহমদ (রহ.) চুনতি, হযরত মাওলানা ফজলুল হক (রহ.) চুনতি, হযরত হাকিম ক্বারী মাওলানা মুনির আহমদ (রহ.) চুনতি ও হযরত হাফেজ ওজি উল্লাহ (রহ.) পুটিবিলা।

হযরত মাওলানা ফজলুল হক (রহ.)

হযরত মাওলানা ফজলুল হক (রহ.) হযরত আজমগড়ী (রহ.)'র এতদাঞ্চলের প্রথম খলিফা। হযরত আজমগড়ী (রহ.)'র চেয়ে তিনি বয়সে ১০ বছরের বড়। চট্টগ্রাম অঞ্চলের এ ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব আকিয়াব ও রেঙ্গুন থেকে দেশে ফিরে এসে শরীয়ত ও ত্বরীকতে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ১৮৬১ সালে চট্টগ্রামের লোহাগাড়ার চুনতি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৪ সালের ৩১ মে নিজ গ্রামে ইন্তেকাল করেন। চুনতির কেন্দ্রীয় শাহী জামে মসজিদের উত্তর পাশে এবং ঈদগাহ ময়দানের দক্ষিণ পাশে চুনতি সমাজের বড় কবরস্থানে তিনি শায়িত আছেন। তিনি হযরত মাওলানা ছৈয়দ আহমদ বেরলভী (রহ.)'র অন্যতম খলিফা হযরত মাওলানা আবদুল হাকিম (রহ.)'র নাতি।

হযরত মাওলানা ফজলুল হক (রহ.) প্রাথমিক শিক্ষা নিজ গ্রামে শেষ করেন। পরবর্তীতে তাঁর মামা হযরত মাওলানা খান বাহাদুর ওয়াজি উল্লাহ ছিদ্দিকী (সাব-জজ) এর ভারতের উত্তর প্রদেশের কর্মস্থলে অবস্থান করে শিক্ষালাভ করেন। মামার মৃত্যুতে চাচা মাওলানা আবদুর রশিদের সহযোগিতায় কলিকাতা আলীয়া মাদ্‌রাসা থেকে উচ্চ শিক্ষা শেষ করেন। ১৮৮৪ সালে দেশে ফিরে এসে নিজ গ্রামের চুনতি সামিয়া মাদরাসার (বর্তমান নাম চুনতি হাকিমিয়া মাদ্‌রাসা) প্রধানের দায়িত্ব নেন।

১৮৯৭ সালে রেঙ্গুনের একটি মাদরাসার প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। অতি অল্প সময়ে তিনি গ্রান্ড মুফতি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। ১৯১০ সালে আকিয়াবে হযরত আজমগড়ী (রহ.)'র সাথে সান্নিধ্য লাভের মাধ্যমে তিনি খেলাফত লাভ করেন। হযরত আজমগড়ী (রহ.) তাঁকে ফজলে হক সম্বোধন করতেন।

হযরত মাওলানা নজির আহমদ (রহ.)

হযরত মাওলানা নজির আহমদ (রহ.) জগত বাছা অলীয়ে কামেল হযরত আজমগড়ী (রহ.)'র উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন খলিফা ছিলেন। তিনি বিখ্যাত আলেম, বুজুর্গ, পীর ও শিক্ষাবিদ ছিলেন। যাঁকে **'হুজুর'** নামে সবাই চেনেন। যাঁর পরিবার **'হুজুর পরিবার'** হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। তিনি ১৯৪৪ সালে মাত্র ৫৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। সে হিসেবে এ মহান অলী জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯০ সালে। শৈশবেই তিনি তাঁর পিতাকে হারান। মায়ের কাছে এবং তাঁর নানা হযরত মাওলানা কাজী ইউসুফ (রহ.)'র এর তত্ত্বাবধানে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন। তাঁরপর চট্টগ্রাম শহরস্থ মুহসেনিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। ঐ মাদরাসা থেকে ফাজিল পাস করে চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলীয়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা পেশায় যোগ দেন। তিনি কবিরাজ হেকিমী ফর্মূলার সংমিশ্রণে **"বরশ"** নামে ওষুধ তৈরি করেন। যাঁর এ ওষুধ গ্রাম ও শহরে সেবা প্রদানে বিখ্যাত ছিল।

হযরত মাওলানা নজির আহমদ (রহ.) বৃহত্তর চট্টগ্রামের আলেম সমাজসহ সর্বমহলে উঁচু মাপের শ্রদ্ধাভাজন আলেম ছিলেন। জীবনের শেষ সময়ে অসুস্থ অবস্থায় গ্রামে চলে আসেন। নিজ গ্রামে তিনি ইন্তেকাল করেন। চুনতি কেন্দ্রীয় শাহী জামে মসজিদের উত্তর পাশের বড় কবরস্থানে তিনি শায়িত আছেন। তাঁর দুই পুত্র ও দুই কন্যা। এক কন্যা মরিয়ন বেগম ৫ বছর বয়সে এবং এক পুত্র আনিছ আহমদ ১৮ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তাঁর অন্য পুত্র মাওলানা হাবিব আহমদ (রহ.) পীর সাহেব কেবলা চুনতি।

লোহাগাড়ায় হযরত আজমগড়ী (রহ.)'র আরো দুই জন খলিফা ছিলেন তাঁরা হলেন- হযরত হাকিম ক্বারী মাওলানা মুনির আহমদ (রহ.)। তিনি ১৮৯৭ সালে চুনতি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৮১ সালে ইন্তেকাল করেন। এ খলিফা চুনতি কেন্দ্রীয় শাহী জামে মসজিদের উত্তর পাশে এবং চুনতি ঈদগাহ ময়দানের দক্ষিণ পাশে বড় কবরস্থানে শায়িত আছেন। অন্যজন হলেন- হযরত মাওলানা হাফেজ ক্বারী ওয়াজি উল্লাহ (রহ.)। তিনি লোহাগাড়ার পুটিবিলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৫ সালে ৯২ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। পুটিবিলা হামিদিয়া মাদরাসার ২ কিলোমিটার দক্ষিণে পুটিবিলা খোন্দকার পাড়ার নিজ বাড়ির কবরস্থানে শায়িত আছেন। (তথ্য সূত্রঃ ১। শানে ওয়াইসী- আহমদুল ইসলাম চৌধুরী ২। হযরত মাওলানা আবদুল মজিদ (রহ.)- আহমদুল ইসলাম চৌধুরী ৩। আঞ্জুমন প্রকাশনা-২০১০, ৪। মাওলানা মুহাম্মদ হাফিজুল হক নিজামী- অধ্যক্ষ, চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা)।

শাহ সুফী মাওলানা মোহাম্মদ কুতুব উদ্দীন (ম.জি.আ.)

আলহাজ্ব শাহ মাওলানা মোহাম্মদ কুতুব উদ্দীন (ম.জি.আ.) ১৯৪২ সালে চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলার আধুনগরের সুফী মিয়াজি পাড়ার প্রসিদ্ধ ফারুকী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হযরত মাওলানা মুসলেহ উদ্দীন (রহ.) এবং মাতার নাম রায়হানা খাতুন। পিতার কাছে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর তিনি ঐতিহ্যবাহী চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। এখান থেকে ১৯৫১ সালে দাখিল, ১৯৫৫ সালে আলিম (১৫তম স্থান) এবং ১৯৫৭ সালে ফাজিল (৫ম তম স্থান) পাস করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি কামিল (হাদিস) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন। এ জন্য ইষ্ট পাকিস্তান মাদরাসা বোর্ড তাঁকে স্বর্ণ পদকে ভূষিত করেন। সাতকানিয়া উপজেলার রসুলাবাদ ইসলামীয়া মাদরাসায় হেড মাওলানা পদে যোগদানের মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু। পরবর্তীতে তিনি ওই মাদরাসার সুপারিন্টেনডেন্ট পদে নিয়োগ লাভ করেন। এশিয়া মহাদেশের সুপ্রসিদ্ধ আধ্যাত্মিক শিক্ষা নিকেতন আঞ্জুমানে ইত্তেহাদ'র প্রতিষ্ঠাতা কুতুবুল আলম হযরত মাওলানা মীর আখতার (রহ.)'র নির্দেশে তিনি ১৯৬৬ সালের শেষের দিকে রসুলাবাদ মাদরাসার চাকুরী ছেড়ে দিয়ে চট্টগ্রাম শহরে চলে যান। বায়তুশ শরফ দরবারের একনিষ্ঠ খাদেম হিসেবে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। তাঁর পীর-মুর্শিদ আখতার (রহ.) এর ইন্তেকালের পর বায়তুশ শরফের রূপকার আলহাজ্ব হযরত শাহ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)'র সাথে তাঁর জীবদ্দশায় চট্টগ্রাম বায়তুশ শরফ মাদরাসার উপাধ্যক্ষ ও পরে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। হযরত আবদুল জব্বার শাহ (রহ.) এর ইন্তেকালের পর বায়তুশ শরফের দরবারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আঞ্জুমানে ইত্তেহাদ প্রতিষ্ঠানটি আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে দেশে-বিদেশে বিশেষভাবে সমাদৃত। এ প্রতিষ্ঠানের গৌরব গাঁথার নায়ক শেখুল আরব ওয়াল আজম বলে খ্যাত বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী স্বরের বুলবুল এবং বাহারুল উলুম শাহ সুফী মাওলানা মোহাম্মদ কুতুব উদ্দীন। তিনি স্বভাবজাত কবি। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে স্বরচিত কবিতা পাঠ করে তিনি প্রশংসিত হয়েছেন। তিনি সহস্রাধিক উর্দু কবিতা ও একাধিক বই রচনা করেছেন। তাঁর বইয়ের মধ্যে জান্নাতী ও জাহান্নামী যারা, দোয়ারে মুসতাজাবুদ দাওয়াত, কাশফে হাজত ইত্যাদি পাঠক সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। একজন সুবক্তা হিসেবে দেশে-বিদেশে তিনি অত্যন্ত সুপরিচিত। বংশগতভাবে তিনি হযরত ওমর ফারুক (রা.)'র ৩৮ তম পোস্ট বংশধর। তাঁর দাদী হযরত ছৈয়দ আহমদ (রহ.)'র অন্যতম খলিফা গাজীয়ে বালাকোট হযরত আলহাজ্ব শাহ আবদুল হাকিম ছিদ্দিকী (রহ.)'র আপন ছোট ভাই আলহাজ্ব শাহ মাওলানা নাছির উদ্দীন ডেপুটির কন্যা জোহরা খাতুন। তাঁর নানা যুগশ্রেষ্ঠ আলেম বিশিষ্ট জমিদার আলহাজ্ব শাহ মাওলানা মনির আহমদ (রহ.)। হযরত মাওলানা মুসলেহ উদ্দীন (রহ.)'র তিন সন্তান (১) মুজিব উদ্দীন (২) হাফেজ মাওলানা হামিদ উদ্দীন (৩) কুতুব উদ্দীন। (তথ্য সূত্রঃ আঞ্জুমন প্রকাশনা-২০১০)।

হযরত মাওলানা মোহাম্মদুর রহমান (রহ.)

হযরত মাওলানা মোহাম্মদুর রহমান (রহ.) ১৯০৮ সালের চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার তেওয়ারীখীল সুফী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মাওলানা সুফী আবদুর রহমান ও মাতার নাম আবেদা খাতুন। তিনি পিতার তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে চট্টগ্রামস্থ সরকারী মোহসীনীয়া মাদরাসায় এবং শেষে চন্দনপুরা দারুল উলুম আলীয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। উক্ত মাদরাসাদ্বয় থেকে পড়াশোনা শেষ করে ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দ ও কলিকাতা আলীয়া মাদরাসা থেকে হাদিস শাস্ত্রে কৃতিত্বের সাথে পাস করে স্বর্ণ পদকসহ ফখরুল মোহাদ্দেসীন উপাধিতে ভূষিত হন। কর্মজীবনে তিনি নিজের গড়া প্রতিষ্ঠান মোহসীনীয়া মাদরাসায় আরবী সাহিত্যে অধ্যাপনা করেন। রাজনৈতিক জীবনে প্রথমে তিনি মুসলিমলীগের দক্ষিণ চট্টগ্রামের সভাপতিসহ জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলীমলীগ আওয়ামীলীগে রূপান্তরিত হলে তিনি মাওলানা আতাহার আলীর নেতৃত্বে নেজামে ইসলাম পার্টিতে যোগ দেন। এ পার্টি থেকে তিনি ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে সাতকানিয়া-বান্দরবান নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রাদেশিক পরিষদের এমএলএ নির্বাচিত হন।

তিনি তাঁর জীবনের এক মূল্যাবান অংশ চট্টগ্রামস্থ আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদের খেদমতে অতিবাহিত করেন। প্রায় দুই দশক কাল মসজিদের এন্তেজামিয়া কমিটির সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন। মসজিদের বেহাত হওয়া সম্পত্তি মামলা-মোকদ্দমা করে তিনি উদ্ধারে ভূমিকা রাখেন। তিনি ছিলেন কাদেরিয়া ত্বরিকার অনুসারী। বক্তা হিসেবেও তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল ব্যাপক। তিনি বাংলা, উর্দু, আরবী ও ফার্সীতে ঘন্টার পর ঘন্টা বক্তৃতা করে শ্রোতাদেরকে মুগ্ধ করতে পারতেন। ১৯৭১ সালের ৬ই জানুয়ারী তিনি ইন্তেকাল করেন। পদুয়া তেওয়ারীখীলের সুফী বাড়ির পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে শায়িত করা হয়। তাঁর তিন পুত্র ও এক কন্যা। তাঁরা হলেন মাওলানা মুহাম্মদ ছফিউর রহমান, প্রিন্সিপল মুহাম্মদ আমিনুর রহমান, ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ আজিজুর রহমান ও নুরজাহান বেগম। (তথ্য সূত্রঃ ১। ফখরুল মোহাদ্দেসীন মাওলানা মুহাম্মদুর রহমান- পরিবেশনায় মোহাম্মদীয়া কুতুবখানা, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ২। আন্দরকিল্লা শাহী মসজিদের সেকাল-একাল-রায়হান আজাদ)।

হযরত শাহপীর (রহ.) ও হযরত শাহ ছুফি পেঠান শাহ (রহ.) স্মরণে মরমী গান

হযরত শাহপীর (রহ.) ও হযরত শাহ ছুফি পেঠান শাহ (রহ.) স্মরণে বর্তমান প্রজন্মের মরমী শিল্পী মৃদুল শীল মরমী গানের বেশ কয়েকটি অ্যালবাম করেছেন। এসব গানের গীতিকার ছিলেন বেলাল উদ্দীন হৃদয়, মৃত সোনা মিয়া, এম.এ গণি, নুরুল আলম চৌং, সেকান্দর আলকরনী, সুনিল শীল, মৃত মাসুদ হাসান টকন ও আহমদ নুর আমেরী। গানের অ্যালবামগুলো হচ্ছে- পেঠান বাবার প্রেমের কারখানা (গান সংখ্যা-১১টি), দয়ার সাগর পেঠান শাহ (গান সংখ্যা- ১০টি), পদুয়ার পেঠান বাবা (গান সংখ্যা- ১১টি), জিয়ারতে পেঠান শাহ (গান সংখ্যা- ১১টি), আশেকের পেঠান শাহ (গান সংখ্যা- ১১টি) এবং শানে পেঠান শাহ (গান সংখ্যা- ১১টি)। স্থানীয় মরমী শিল্পী মৃদুল শীল পেঠান বাবার প্রেমের কারখানায় অ্যালবামে হযরত শাহপীর (রহ.) স্মরণে তাঁর গাওয়া একটি গান রয়েছে। এখানে ২/১ টি গান তুলে ধরা হল:

নিম্নের আঞ্চলিক গানটির গীতিকার নুরুল আলম নুরী

ফুলের মালা গাঁথি রাক্কি পেঠান বাবাল্লায়
হত্তে আইব পেঠান বাবা গলাত দিবল্লায়
এন ভাবে রাক্কি মালারে
কেয়াই যেনে লইত নপারে (২)
কেঁচা ফুলর মালা রাক্কি
সুন্দর চাইবল্লায় (ঐ)
এই ফুলতো খুশব ভরা
গাঁথি রাক্কি ওগ্‌গ্যা ছারা (২)
যেনে এনে চাইদ্দে বাবার
মননান পাইবল্লায় (ঐ)
রাঙ্গুনিয়ার আলম নুরী
তোঁয়ার বলে ঘুরি ফিরি (২)
যেনে এনে চাইদ্দে বাবার
আপন অইবল্লায় (ঐ)

নিচের গানটির গীতিকার বেলাল উদ্দীন হৃদয়

বার আউলিয়ার সর্দার আশেকের পরান
মুক্তিরও দিশারী আমার শাহপীর অলি বাবাজান
শাহপীর বাবা দরবেশ হাটে
আছেন জিন্দা শুইয়া
অনাবাদী আবাদ করল
ঈমানী জোর লইয়া (২)
ইরান হইতে এসেছিলেন (২)
কায়েম করিতে ইসলাম (ঐ)
বেলায়তের দরজা খোদায়
রাখিলো খুলিয়া
কেউ জানে না কোন মায়ের
গর্ভে আসবেন আউলিয়া (২)
কেয়ামতেরই মাঠে যাবেন (২)
লইয়া ভক্ত আশেকান (ঐ)
আল্লাহর অলির হয় না মরণ
অদৃশ্য হই থাকে
কার ছুরতে সামনে আসে
কেউ চিনে না তাঁকে (২)
বেলাল উদ্দীন হৃদয় বলে
চিনতে যদি পারিতাম
জড়ায় ধরি কাঁন্দি কাঁন্দি
মনের ব্যথা কইতাম (ঐ)

নিচের গানটির গীতিকার বেলাল উদ্দীন হৃদয়

আমার পেঠান বাবার প্রেমের কারখানায়
ভর্তি চলে দিবা-রাত্রি কারো জন্য মানা নাই (২)
সে কারখানার নিজেই মালিক
নিজেই দেয়রে প্রশিক্ষণ
গুণগত মান ঠিক রাখি প্রেম
তৈয়ার করে সর্বক্ষণ (২)
মাতোয়ারা দেশবাসী (২) বাবার ঐশী মহিমায় (ঐ)
নুরের তৈরি বাবার এই প্রেম
যার কলবে ফিট করে
দেশান্তরী হইতে সে জন
পরোয়া আর না করে (২)
গনার দিনতো যাইরে চলি (২)
সময় বেশি দেরি নাই (ঐ)
সেই প্রেমেতে এত মধু
আছেরে এত শক্তি
ক্ষণে ক্ষণে দূর্বল হইয়া
যায়রে খোদার প্রতি (২)
বেলাল উদ্দীন হৃদয় বলে (২)
বাবার প্রেমের জুড়ি নাই (ঐ)

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সেক্টর কমান্ডার শহীদ মেজর নাজমুল হক

শহীদ মেজর নাজমুল হক ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ৭নং সেক্টরের প্রথম কমান্ডার ছিলেন। তিনি লোহাগাড়া উপজেলার আমিরাবাদে ১৯৩৮ সালের ১১ আগষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা এডভোকেট হাফেজ আহমদ ছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। ঢাকা আহসান উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (বর্তমান বুয়েট) দ্বিতীয় বর্ষে পড়া অবস্থায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। ১৯৬২ সালের ১৪ অক্টোবর তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে আর্টিলারি কোরে কমিশন প্রাপ্ত হন।

স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়ার কয়েকদিন আগে তিনি নওগাঁয় ৭ ইপিআর'র অধিনায়ক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ নিরস্ত্র বাঙালির উপর পাক বাহিনীর হামলা শুরু হলে বগুড়া ও নওগাঁর যুব সমাজকে মুক্তিযুদ্ধে উজ্জীবিত করেন তিনি। অধিনায়ক হিসেবে প্রথমে তিনি বগুড়ার পাক বাহিনী ক্যাম্প দখল করে শত্রুমুক্ত করেন। ২৮ মার্চ তাঁর নেতৃত্বে ইপিআর ও গণমানুষকে সাথে নিয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জকে শত্রুমুক্ত করেন। তাঁর নেতৃত্বে নওগাঁ থেকে নাটোর হয়ে রাজশাহী এবং নবাবগঞ্জ থেকে রাজশাহী দ্বিমুখী আক্রমণ পরিচালিত হতো। তিনি বৃহত্তর রাজশাহী, দিনাজপুর, বগুড়া ও পাবনা জেলা নিয়ে গঠিত ৭নং সেক্টরের কমান্ডার হিসেবে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। ১৯৭১ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর মাসে মিত্রবাহিনীর সাথে উচ্চ পর্যায়ের এক বৈঠক শেষে শিলিগুড়ি ক্যান্টমেন্ট থেকে ফেরার পথে সড়ক দূর্ঘটনায় তিনি শহীদ হন। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে চাঁপাইনবাবগঞ্জের ঐতিহাসিক সোনা মসজিদ প্রাঙ্গণে সমাহিত করা হয়। মসজিদের প্রবেশ পথে দুটি কবর ঘিরে এ সমাধি। সমাধি স্তম্ভের গায়ে লেখা রয়েছে মেজর নাজমুল হক।

এ মহান বীর মুক্তিযোদ্ধার স্মরণে তাঁর নিজ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শহীদ মেজর নাজমুল হক প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং উপজেলা পরিষদ চত্বরে প্রতিষ্ঠিত হয় সেক্টর কমান্ডার শহীদ মেজর নাজমুল হক স্মৃতি পাঠাগার।

(তথ্যসূত্র: স্মৃতি-লোহাগাড়া প্রেস ক্লাব ফাউন্ডেশন প্রকাশনা-২০০৯)

লোহাগাড়ায় বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের কয়েকজন ব্যক্তিত্ব

লোহাগাড়ায় বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে অনেকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হল।

শাহ মাওলানা নজির আহমদ, হযরত নুরুদ্দিন ফকির (রহ.), হাজী আবদুল ছোবহান প্রকাশ আ-কোম্পানি, হযরত মাওলানা সৈয়দ মোফাদ্দলুর রহমান, হযরত মাওলানা আবুল খায়ের (রহ.), ডা. খায়ের আহমদ, গোলাম ছোবহান কোম্পানি, গোলাম রসুল প্রকাশ বাঘ কোম্পানি, সৈয়দ সুলতান ও আলী আহমদ সিকদার।

কবি বেগম সুফিয়া কামাল ও তাঁর চুনতির বংশধর

কবি বেগম সুফিয়া কামাল ১৯১১ সালের ২০ জুন বরিশাল জেলার শায়েস্তাবাদের রাহাত মঞ্জিলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক বাড়ি কুমিল্লা জেলার শিলাউরে। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ আবদুল বারী। মাতার নাম সৈয়দা সাবেরা খাতুন। তাঁর পিতা সুফি মতাদর্শের ছিলেন। বেগম সুফিয়া কামাল মায়ের কোলে থাকাকালে তাঁর পিতা নিরুদ্দেশ হন। ১৯২৩ সালে মামাতো ভাই সৈয়দ নেহাল হোসেনের সাথে সুফিয়া কামালের বিবাহ হয়। ১৯৩২ সালে তাঁর স্বামীর অকাল মৃত্যু হয়। এই সংসারে জন্ম নেয় কন্যা আমেনা খাতুন দুলু। ১৯৩৩ সালে সুফিয়া কামাল কলিকাতা কর্পোরেশন স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন এবং সেখানে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন। ১৯৩৭ সালে তাঁর প্রথম গল্প গ্রন্থ **'কেয়ার কাঁটা'** ও ১৯৩৮ সালে প্রথম কাব্য গ্রন্থ 'সাঁঝের মায়া' প্রকাশ হয়। 'সাঁঝের মায়া' সম্পর্কে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্তব্য করেছিলেন- তোমার কবিত্ব আমাকে বিস্মিত করে। বাংলা সাহিত্যে তোমার স্থান উচ্চে।

কবি সুফিয়া কামাল ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা সংগ্রামে অনন্য ভূমিকা রেখেছেন। তিনি নারী সমাজের নেত্রী হিসেবে নারী সমাজকে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে সাহস যুগিয়েছিলেন। ভাষা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিরোধী সব রকম ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তিনি সবসময় সোচ্চার ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর দু'মেয়ে সুলতানা কামাল লুলু ও সাঈদা কামাল টুলু ভারতে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের হাসপাতালে স্বেচ্ছায় সেবিকার দায়িত্ব পালন করেন। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। তিনি শুধু কবি হিসেবে শ্রেষ্ঠ নন, বিবেকবান মানুষের সাহসী ঠিকানা ছিলেন তিনি। অনেক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হন সুফিয়া কামাল। সাহিত্যে অসামান্য অবদানের জন্য বাংলা একাডেমী পুরস্কার, একুশ পদক, রোকেয়া পদকসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৯৩৯ সালে তিনি চট্টগ্রামের লোহাগাড়ার ঐতিহাসিক চুনতি গ্রামের খান ছিদ্দিকী পরিবারের কামাল উদ্দীন আহমদ খানের সাথে পুনর্বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর স্বামীর জন্ম ১৯০৮ সালে। তাঁর স্বামী মেধাবী ছাত্র ছিলেন। স্কুলের প্রতিটি শ্রেণিতে তিনি প্রথম স্থান অর্জনসহ বৃত্তিধারী ছাত্র ছিলেন। মেট্রিক পাস করেন স্টার মার্ক নিয়ে। সরকারি বৃত্তি নিয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। সাহিত্যিক, সুবক্তা ও ছাত্রনেতা ছিলেন তিনি। কর্মময় জীবনে তিনি কিছুদিন শিক্ষকতা ও একাউন্টস অফিসে কাজ করেছেন। পরে ফ্রাঙ্কলিং পাবলিকেশনে এডিটরের কাজে যোগ দেন। তাঁর ৩ পুত্র ও ২ মেয়ে। পুত্ররা হলেন শাহেদ কামাল শামীম, শোয়েব আহমদ কামাল, সাজেদ কামাল শাব্বির এবং মেয়েরা হলেন সুলতানা কামাল লুলু ও সাঈদা কামাল টুলু। তাঁর ছেলেমেয়েরা উচ্চ শিক্ষিত ও প্রজ্ঞাবান। শাহেদ কামাল শামীম সাংবাদিকতায় এমএ পাস করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে খন্ডকালীন সাংবাদিকতার শিক্ষক এবং বাসস (বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা)'র উচ্চতর কর্মকর্তা

ছিলেন। সাজেদ কামাল শাব্বির আমেরিকার বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এডুকেশনাল সাইকোলজিতে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি আমেরিকায় বসবাসরত। তাঁর মেয়ে সুলতানা কামাল দেশ-বিদেশে সুপরিচিত আজন্ম সংগ্রামী এক মানুষ। তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা ও খ্যাতিমান মানবাধিকার কর্মী। ১৯৫০ সালের ২২ জানুয়ারী ঢাকায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

সুলতানা কামালের শিক্ষা জীবন শুরু হয় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে জড়িত সংগ্রামী নারীদের প্রতিষ্ঠিত লীলানাগ নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। তারপর তিনি ঢাকার আজিমপুর গালর্স স্কুল থেকে মেট্রিক, হলিক্রস কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে সম্মানসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৭৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন শাস্ত্রে স্নাতক পাস এবং ১৯৮১ সালে নেদারল্যান্ড ইনষ্টিটিউট অব সোস্যাল স্টাডিজ থেকে মাস্টার্স ইন ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ ডিগ্রী অর্জন করেন। কৈশোরে ৬২'র শিক্ষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ৬৬'র ছয় দফা আন্দোলন, ৬৯'র গণঅভ্যুত্থান, অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালে ছুটে যান মহান মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনে। মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ও তাঁর বোন সাঈদা কামাল সিএনসি'র স্পেশাল কমেন্ডেশন লাভ করেন। তিনি নারী ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। নারী অধিকার প্রশ্নে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। স্বাধীনতাত্তোরকালে তিনি বিদগ্ধ রমণীকুল, সৎ মানুষের খোঁজে প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করে অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বাংলাদেশের মানুষের মানবাধিকার রক্ষায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও তথ্য কমিশন গঠনে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। ২০১১ সাল থেকে তিনি বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান মানবাধিকার ও আইন সহায়তাদানকারী প্রতিষ্ঠান **"আইন ও সালিশ"** কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। ২০১১ সালের এপ্রিল মাসে তিনি ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)'র চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হন। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের দায়িত্ব পালনকালে তিনি ২০০৬ সালে অন্তবর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে যোগ দেন। মানবাধিকার ও নারী মুক্তি আন্দোলনে অবদান রাখায় ১৯৯৬ সালে কানাডার ইনষ্টিটিউট অব হিউম্যান রাইটস এন্ড ডেমোক্রেটিক ডেভেলপমেন্ট তাঁকে **"জনহামফ্রে স্বাধীনতা"** পুরষ্কারে ভূষিত করে। ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অবদানের জন্য তিনি **"অনন্য সেরা দশ"** পুরষ্কারে ভূষিত হন। পড়াশোনা শেষে তিনি মিউজিক কলেজে শিক্ষকতা করেছেন। তিনি পাবলিক সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও সরকারি চাকুরিতে যোগদান করেননি। তিনি ১৯৮২ সালে আইনকর আইনজীবী ও ক্রীড়া সংগঠক সুপ্রিয় চক্রবর্তীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর একমাত্র মেয়ে দিয়া সুদেষ্ণা অমৃতা যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন শাস্ত্রে অধ্যয়ন করে বার-এট-ল সমাপ্ত করেন।

সুফিয়া কামালের আরেক মেয়ে সাঈদা কামাল একজন শিল্পী। তিনি ১৯৭১ সালে ব্যাচেলর অব ফাইন আর্টস ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি বাংলাদেশের বলিষ্ঠ শিল্পীদের একজন।

এখানে উল্লেখ করা যায়, খান ছিদ্দিকী বংশের ৮ প্রজন্ম আরব দেশে, ৯ম-১৮তম প্রজন্ম বাগদাদে, ২৭-২৮তম প্রজন্ম লাহোরে, ২৯-৩৩তম প্রজন্ম সুলতানী বাংলার রাজধানী গৌড়ে, ৩৭-৪৫তম প্রজন্ম লোহাগাড়ার চুনতি গ্রামে বসবাস করেন। এই বংশের ৩৩তম পুরুষ শাহ মুহাম্মদ তাহেরের পুত্র মাওলানা হাফেজ খান মজলিশ মোঘল সুবেদার শাহ সুজার পীর ছিলেন। তিনি প্রধান বিচারপতিও ছিলেন। ১৬৬০ সালে শাহ সুজা আরাকান অভিমুখে পলায়নের সময় ২০০ জন অনুচরের মধ্যে ২২ জন অনুগামী আলেম ছিলেন। মাওলানা হাফেজ খান মজলিশ ২২ জনের মধ্যে অন্যতম। ১৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে আরাকান রাজার সাথে সংঘর্ষে শাহ সুজা নিহত হন। সে সময় মাওলানা হাফেজ খান মজলিশ চট্টগ্রামের বাঁশখালীর বানিগ্রামে চলে যান। মাওলানার হাফেজ খাঁ'র পুত্র শাহ আব্বাস। শাহ আব্বাস'র পুত্র শেখ আবদুল্লাহ। চুনতির শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব শাহ শরীফ মিয়াজি বানিগ্রামে গিয়ে শেখ আবদুল্লাহকে চুনতি গ্রামে নিয়ে আসেন। শেখ আবদুল্লাহ চুনতি গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং নিজ পরিবারের এক মেয়ের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এভাবে খান ছিদ্দিকী বংশের শেখ আবদুল্লাহ'র আবাসস্থল চুনতিতে হয়। চুনতির মিয়াজি মসজিদের পাহাড়ের দক্ষিণ পশ্চিম ঢালুতে তাঁর কবর রয়েছে।

এ খান ছিদ্দিকী পরিবারের বংশধর কামাল উদ্দীন আহমদ খান ১৯৭৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন। আর তাঁর স্ত্রী কবি সুফিয়া কামাল মৃত্যুবরণ করেন ১৯৯৯ সালের ২০ নভেম্বর।

তথ্যসূত্র:

১। রাজপথে জনপথে সুফিয়া কামাল-মালেকা বেগম।
২। ছিদ্দিকী বংশের একটি পারিবারিক ইতিহাস- ড. মুঈনুদ্দীন আহমদ খান।

চতুর্দশ অধ্যায়

প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

Chunati.com
Pioneer in village based website

মন, দেহ ও আত্মার সুসমন্বিত উন্নয়ন হচ্ছে শিক্ষা।

- বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জন মিল্টন

প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান:
চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা

চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা লোহাগাড়া উপজেলার প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ইতিহাসের ঐতিহ্যমন্ডিত ও মহিমান্বিত দ্বীনি শিক্ষা কেন্দ্র। প্রতিষ্ঠানটির গোড়াপত্তন হয়েছে ১৮১০ সালে। এই প্রতিষ্ঠানটি ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, সম্রাট শাহজাহানের রাজদরবারের অন্যতম শিক্ষক হযরত ইব্রাহীম খোন্দকার শাহ সুজাকে অনুসরণ করে রামু পর্যন্ত যান। সেখান থেকে তিনি ফিরে বাঁশখালীর খানখানাবাদে এসে কিছুদিন অবস্থান নিয়ে চুনতিতে ফিরে আসেন। স্থায়ীভাবে চুনতিতে বসতি স্থাপন করেন। জনশ্রুতি আছে, বর্তমান চুনতি জামে মসজিদের উত্তর পার্শ্বে ঈদগাহ পাহাড়ে ইব্রাহীম খোন্দকার বসতি স্থাপন করেন। ওই সময় আবদুর রহমান মিয়াজী নামে এক বুজুর্গ বাঁশখালী থেকে চুনতিতে আসেন। তদ্বীয় পুত্র হযরত মাওলানা আবদুল হাকীম (রহ.) ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসার গোড়াপত্তন করেন। যিনি বড় মাওলানা নামে পরিচিত ছিলেন।

মাওলানা আবদুল হাকীম (রহ.) একজন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। ১৭৮০-১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে তিনি টিপু সোলতানের পুত্র সোলতান শুকরুল্লাহ এর সন্তানদের গৃহশিক্ষক ছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৩০ বছরের মধ্যে। ইব্রাহিম খোন্দকারের একমাত্র ছেলে আবদুর রশিদ তালুকদারের প্রথম পুত্র আবদুল গণি সিকদারের ওয়ারিশ ও মাওলানা আবদুর রহমান মিয়াজির পরবর্তী ওয়ারিশগণ চুনতির এ শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষা-দীক্ষা নিয়েছেন। এই ধারাবাহিকতায় ১৮৮৩ সালে বড় মাওলানা হযরত আবদুল হাকীম (রহ.) এর জ্যেষ্ঠ পুত্র চুনতির প্রখ্যাত জমিদার মাওলানা খান বাহাদুর ওয়াজিউল্লাহ সামী (তিনি দিল্লীর এলাহাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন) প্রতিষ্ঠানের জন্য ৯০ হাজার টাকা প্রদান করে মাদ্‌রাসা আলিয়া নামে পিতার প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসার নামকরণ করেন। তাঁর ইন্তেকালের পর তদ্বীয় পুত্র মাওলানা ফৌজুল কবির খান ছিদ্দিকী মাদরাসার পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। পর্যায়ক্রমে মাদ্‌রাসা ফাজিল পর্যন্ত উন্নীত হয়। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড়ে মাদরাসা ধ্বংস হয়ে যায়। বর্তমান মুন্সেফ বাজারের পাশে এক খন্ড জমির উপর মাদরাসা স্থানান্তরিত হয়। এখানে কোনমতে ৫ বছর পর্যন্ত চালু থাকে। তারপর মাদরাসা আগুনে পুড়ে যায়। মাদরাসার এই দুঃসময়ে এগিয়ে এসেছিলেন মাওলানা আব্দুচ ছালাম, মাওলানা বজলুর রহমান, মাষ্টার সিরাজুল হক ও মাওলানা আব্দুচ ছোবহান।

১৯৩৭ সালে এটি হাকিমিয়া মাদ্‌রাসায় উন্নীত হয়। এ সময়ে শাহ মাওলানা নজির

আহমদ (রহ.) মাদ্‌রাসার জন্য বিরাট ভূমিকা পালন করেন। তাঁর সময়ে বহু আরাকানী ছাত্র এখানে পড়ালেখা করত এবং তাঁর বহু ছাত্র এ মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতাও করতেন। ১৯৪৫ সালে চট্টগ্রাম বায়তুশ শরফের প্রাণপুরুষ হযরত মাওলানা মীর মুহাম্মদ আখতার (রহ.) মাদ্‌রাসার পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ করেন। মাদ্‌রাসা পরিচালনায় বহু টাকা অনুদান দেন। ১৯৭১ সালে হযরত শাহ্ সাহেব কেবলা চুনতির উদ্যোগে প্রথম কামিল ক্লাস শুরু হয়। ২শ বছরের অধিক পুরানো এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি আজ উপজেলায় প্রাচীন ও নন্দিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত।

(তথ্যসূত্র: আনজুমন-২০১০, চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা ২০০ বছর পূর্তি সংখ্যা)

দক্ষিণ সাতকানিয়া গোলামবারী মডেল উচ্চ বিদ্যালয়

চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার আমিরাবাদ মাষ্টার হাট এলাকায় দক্ষিণ সাতকানিয়া গোলামবারী মডেল উচ্চ বিদ্যালয় অবস্থিত। অবিভক্ত সাতকানিয়ায় ইংরেজ শাসনামলে আমিরাবাদ গ্রামের বসরত আলী মুন্সী বাড়ির শিক্ষানুরাগী ব্যাক্তিত্ব মরহুম আশরাফ আলী চৌধুরী ১৯৩৭ সলে তাঁর পিতার নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করেন। উপজেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে এটি প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রয়েছে বহু ইতিহাস।

অবিভক্ত সাতকানিয়ার আমিরাবাদ মাষ্টার হাট এলাকায় শিক্ষানুরাগী আশরাফ আলী চৌধুরী (যিনি এলাকায় মাষ্টার নামে বেশ পরিচিত ছিলেন এবং যাঁর নামে নামকরণ হয় মাষ্টার হাট।) ১৯২৫ সালে এলাকায় শিক্ষা বিস্তারে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহন করেন। প্রথমে বর্তমান স্থানে মাটির ঘরে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত স্কুলের কার্যক্রম শুরু করে। মাটির ঘরে দীর্ঘ ১১ বছর স্কুলের কার্যক্রম চলার পর ১৯৩৭ সালে পৈত্রিক জায়গার উপর দক্ষিণ সাতকানিয়া গোলামবারী উচ্চ বিদ্যালয় পুরোদমে চালু করেন। বিদ্যালয়ের জন্য দান করা হয় প্রায় ৪ একর জায়গা। ১৯৩৭ সালে বিদ্যালয়ের প্রথম সেক্রেটারী ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা আশরাফ আলী চৌধুরী। ১৯৩৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উক্ত বিদ্যালয়কে স্বীকৃতি প্রদান করে। বিদ্যালয়ের একক প্রতিষ্ঠাতা মরহুম গোলামবারী চৌধুরীর একমাত্র পুত্র মরহুম আশরাফ আলী চৌধুরী আজীবন বিদ্যালয়ের সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন। ঐ সময়ে বিদ্যালয়ের সভাপতি ছিলেন এসডিও (দক্ষিণ)। ১৯৬৪ সালে আশরাফ আলী চৌধুরীর অসুস্থতাজনিত কারণে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি তাঁর সুযোগ্য পুত্র অলি উল্লাহ চৌধুরীকে প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করেন। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতা পরিবারের সদস্য অলি উল্লাহ চৌধুরী পরবর্তীতে বিদ্যালয়ের সহ-সভাপতি ও সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। অন্যান্য সময়ে এলাকার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিরাও বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। বিদ্যালয়টিতে ১৯৮০ সালে এসএসসি ও প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা কেন্দ্র এবং পরবর্তীতে জেএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হয়।

২০১২ সালে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি দক্ষিণ সাতকানিয়া গোলামবারী মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। ফলে এটি লোহাগাড়ার একমাত্র মডেল উচ্চ বিদ্যালয় হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৯২ সালে সরকার উপজেলা ভিত্তিক যে একটি সরকারি বিদ্যালয় ঘোষণার জন্য নির্বাচন করে তার মধ্যে এটি একটি।

২০১৫সালে পুনরায় এটিকে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ঘোষণার জন্য নির্বাচন করা হয়। বর্তমানে উপজেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে এটি অন্যতম। প্রতি বছর প্রতিষ্ঠানটি জেএসসি ও এসএসটি পর্যায়ে ভাল ফলাফল অর্জন করে। ১৮ জন এমপিও ভূক্ত ও ৭ জন নন এমপিও ভূক্ত শিক্ষক পাঠদান কার্যক্রমে রয়েছে। কর্মচারী রয়েছেন ৫ জন। বর্তমানে (২০১৫ সালের অক্টোবর)

প্রতিষ্ঠাতা মরহুম আশরাফ আলী চৌধুরীর দৌহিত্র ও অলি উল্লাহ চৌধুরীর সুযোগ্য পুত্র মোহাম্মদ ফোরকান উল্লাহ চৌধুরী বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি।

(তথ্যসূত্র: অলি উল্লাহ চৌধুরী, আমিরাবাদ, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।)

Chunati.com Pioneer in village based website

পঞ্চদশ অধ্যায়

সফল ব্যক্তিত্ব

প্রতিটি মানুষই সৃষ্টির অনন্য সৃষ্টি। আপনার ইতিহাস আপনাকেই রচনা করতে হবে। আপনাকে আপনিই আবিষ্কার করবেন। আপনি অনন্য হবেন সেটা নির্ভর করবে আপনি নিজেকে কত প্রতিষ্ঠা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে উন্মেচিত করেছেন তার উপর।

- নোবেল বিজয়ী প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনুস

Chunati.com
Pioneer in village based website

আলহাজ্ব মোস্তাফিজুর রহমান সওদাগর

আলহাজ্ব মোস্তাফিজুর রহমান সওদাগর ১৯২৪ সালে বার আউলিয়ার পূণ্যভূমি চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার সদর ইউনিয়ন লোহাগাড়ার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম আলহাজ্ব খলিলুর রহমান সওদাগর। মাতার নাম মরহুমা নবিজা খাতুন।

লোহাগাড়ার আমিরাবাদ বটতলীস্থ মাওলানা আবুল খায়ের পাঠশালায় (প্রকাশ আনজু মাষ্টারের স্কুল) প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর দক্ষিণ সাতকানিয়া গোলামবারী মডেল হাই স্কুল সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করে গোলামবারী মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এ স্কুলে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। পরবর্তীতে সাতকানিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে সেখান থেকে ১৯৪৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর চাকুরীর উদ্দেশ্যে কলিকাতায় চলে যান। সেখানে আয়কর অফিসে ২ মাস চাকুরী করে নিজ দেশে ফিরে আসেন। ১৯৪৪ সালে লোহাগাড়ার ঐতিহাসিক দরবেশহাটে মুদি ও কাপড়ের দোকান দিয়ে ব্যবসা শুরু করেন তিনি। কলিকাতায় চাকুরীরত অবস্থায় এক দোকান থেকে তিনি কাপড়ের ব্যবসার ধারণা নেন। কলিকাতা থেকে কাপড় ক্রয় করে এনে দরবেশ হাটে নিয়ে আসতেন। দক্ষিণ চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকা থেকে ক্রেতারা এসে তাঁর থেকে কাপড় ক্রয় করে নিয়ে যেত। পাশাপাশি দরবেশ হাটে তিনি মুদি ও তেলের ব্যবসা করতেন। ১৯৫২ সালে তিনি চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জ আমির মার্কেটে বসে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারিত করার কাজে হাত দেন। ব্যবসায়িক সফলতার এক পর্যায়ে ১৯৭৪ সালে চট্টগ্রামে রহমান রেক্সিন ইন্ডাষ্ট্রিজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিল্প প্রসারে হাত দেন। ১৯৭৮ সালে ব্যবসায়িক কাজে প্রথমে সিঙ্গাপুর পরবর্তীতে রেঙ্গুন, জাপানসহ পৃথিবীর উন্নত দেশে যান। তাঁর অসাধারণ নেতৃত্ব ও ব্যবসায়িক কারিশমায় এবং দূরদর্শী চিন্তাধারায় অল্প সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান। যে শিল্প প্রতিষ্ঠানে হাজার হাজার লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। এ শিল্প প্রতিষ্ঠান নিয়ে তিনি ১৯৮৩ সালে "মোস্তফা গ্রুপ অব ইন্ডাষ্ট্রিজ" প্রতিষ্ঠা করেন। শিল্প উন্নয়ন ছাড়াও শিক্ষা বিস্তার ও সমাজসেবায় তিনি স্মরণীয়-বরণীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

আলহাজ্ব মোস্তাফিজুর রহমান সওদাগর দেশে ৪০টির অধিক শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠা করেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসাসেবা কেন্দ্র। তিনি চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলা সদরে ১৯৯৫ সালে ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে দৃষ্টিনন্দন আলহাজ্ব মোস্তফিজুর রহমান কলেজ ও পরবর্তীতে মোস্তফা বেগম গার্লস হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। চিটাগাং চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজসহ তিনি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বাণিজ্য সংস্থার সাথে জড়িত ছিলেন। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সাতকানিয়ার পশ্চিম ঢেমশার চুন্নু মিয়া মাষ্টারের বাড়ির চুন্নু মিয়া (যিনি ডেমশা

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন) এর কন্যা মোস্তফা বেগমের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। [redacted] ১৯৬৫ সালে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তিনি প্রথম লোহাগাড়া ইউপি কার্যালয় নির্মাণ করেন। এছাড়াও তিনি শাহপীর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি, গোলামবারী উচ্চ বিদ্যালয় ও ছমদিয়া মাদরাসা পরিচালনা পরিষদের সাথে জড়িত ছিলেন। ২০০৫ সালের ১০ ডিসেম্বর ৮১ বছর বয়সে এ আলোকিত ব্যক্তিত্ব ইন্তেকাল করেন। তাঁর সাত ছেলে ও চার মেয়ে। তাঁরা হলেন- হেফাজতুর রহমান, কামাল উদ্দীন, কফিল উদ্দীন, রফিক উদ্দীন, শফিক উদ্দীন, জসিম উদ্দীন, জহির উদ্দীন, জান্নাত আরা বেগম, সুলতানা শামীমা, জুসিয়া সুলতানা ও জাসিয়া সুলতানা। তাঁর সন্তানেরা শিল্প কান্ডারি হিসেবে দেশে খুবই পরিচিত। ছেলেরা শিল্প প্রসারের পাশাপাশি শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন। তাঁর সুযোগ্য পুত্র আলহাজ্ব শফিক উদ্দীন লোহাগাড়া উপজেলা সদরে মোস্তফা বেগম গালর্স হাই স্কুল এন্ড কলেজ, মোস্তফা বেগম গার্লস টেকনোলজি এন্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ, মোস্তফা বেগম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ইব্রাহীম মেমোরিয়াল কিন্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠা করেন। উপজেলা সদরের এক বাউন্ডারিতে ৫টি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা দেশের ইতিহাসে বিরল ঘটনা। ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত বাউন্ডারি এলাকা **"নলেজ সিটি"** নামে পরিচিত। তাঁর সন্তানরা পার্বত্য জেলা বান্দরবানের লামা এলাকায় আলহাজ্ব শফিক উদ্দীন উচ্চ বিদ্যালয় ও আলহাজ্ব হেফাজতুর রহমান কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

(তথ্যসূত্র: আলোকিত ব্যক্তিত্ব আলহাজ্ব মোস্তাফিজুর রহমান-অধ্যাপক মোহাম্মদ ইলিয়াছ)

আলহাজ্ব মো: নুরুল ইসলাম

দেশের সফল ব্যবসায়িক ব্যক্তিত্ব আলহাজ্ব মো: নুরুল ইসলাম। তিনি দেশের স্বনামধন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান নোমান গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। এ শিল্প প্রতিষ্ঠান দেশের সর্ববৃহৎ টেক্সটাইল গ্রুপ হিসেবে পরিচিত।

আলহাজ্ব মো: নুরুল ইসলাম চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার আধুনগর গ্রামের ঐতিহ্যবাহী ব্যবসায়িক পরিবারে ১৯৫০ সালের জানুয়ারি মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম মো: ইসমাঈল। মাতার নাম মরহুমা আঞ্জুমান আরা খাতুন। ৬ বছর বয়সে তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন। ফলে তিনিসহ তাঁর ৫ বোনের সংসারে নেমে আসে অভাব-অনটন। এতো দুঃখ-দুর্দশার মাঝেও তিনি মনোবল হারাননি। নিজ এলাকার আধুনগর উচ্চ বিদ্যালয়ে লেখাপড়া চালিয়ে যান। সংসারের অভাব দূর করতে লেখাপড়ার পাশাপাশি তিনি ছোটখাট ব্যবসা করতেন। পরবর্তীতে তিনি কিছু টাকা জমিয়ে ১৯৬৮ সালে ঢাকায় চলে যান এবং ট্রেডিং ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েন। তারপর তিনি ডাইস কেমিক্যাল ব্যবসার সাথে যুক্ত হন। এ ধারাবাহিকতায় দেশে

যখন বেশির ভাগ ওয়ার্প নিটিং ফ্যাক্টরীগুলো বন্ধ তখন তিনি কিছু মেশিন ভাড়া নিয়ে মশারী উৎপাদনের কাজ শুরু করেন। এ ব্যবসায় ব্যাপক সাফল্য আসলে ১৯৭২ সালের দিকে বিদেশ থেকে তিনি মেশিনারিজ আমদানী করে নিজেই ওয়ার্প নিটিং ইন্ডাষ্ট্রিজ গড়ে তোলেন। মেধা, শ্রম, সততা ও নিষ্ঠায় একের পর এক তিনি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ১৯৯০ সালে জাবের এন্ড জোবায়ের ফেব্রিক্স লিঃ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাঁর ব্যবসার ব্যাপক প্রসার ঘটে। যার ফলশ্রুতিতে বর্তমানে দেশের স্বনামধন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নোমান গ্রুপ অব ইন্ডাষ্টিজ। এ শিল্প প্রতিষ্ঠান দেশে নয়, বিদেশেও সুপরিচিত। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠান একদিকে দেশে বেকার সমস্যার সমাধান করছে, অন্যদিকে দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখছে।

আলহাজ্ব মোঃ নুরুল ইসলাম, শুধু দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেননি, একজন দানবীর ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্ব হিসেবেও পরিচিত। তিনি ১৯৮০ সালে ৪ তলা বিশিষ্ট আধুনগর ইসলামিয়া ফাজিল মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। দক্ষিণ চট্টগ্রামের সেরা বাণিজ্যিক কেন্দ্র বটতলী শহরস্থ চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের পাশে তিনি তিন তলা বিশিষ্ট বটতলী জামে মসজিদ তৈরি করে দেন। তাঁর শৈশবকালের স্কুল আধুনগর উচ্চ বিদ্যালয়কে কলেজে উন্নীতকরণের লক্ষে নিজস্ব অর্থায়নে বিদ্যালয় এলাকায় ৪ তলা বিশিষ্ট একটি ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এছাড়াও তিনি এলাকায় ও দেশের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ, মাদরাসা, স্কুল-কলেজ ও মকতব প্রতিষ্ঠায় অবদান রেখেছেন এবং রেখে যাচ্ছেন। এলাকার গরীব দুঃখীদের সুচিকিৎসার সুবিধার্থে ফ্রি অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করেছেন। আর্তমানবতার সেবায় পিতা-মাতার স্মরণে **"ইসমাঈল আঞ্জুমান আরা ওয়েল ফেয়ার ট্রাষ্ট"** নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন।

তিনি সফল একজন মানুষ। তাঁর চার ছেলে ও এক মেয়ে। শৈশবকালে পিতা হারানো এ মানুষটি মেধা, পরিশ্রম ও সততার সিঁড়ি বেঁয়ে দেশের একজন আলোকিত ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন। এলাকাবাসী ও দেশের কাছে তিনি হয়ে থাকবেন স্মরণীয় ও বরণীয়।

মেজর জেনারেল মিয়া মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন বীর বিক্রম, পিএসসি

চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার সুপ্রসিদ্ধ চুনতি গ্রামে ১৯৬০ সালের ১ জানুয়ারি মেজর জেনারেল মিয়া মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন বীর বিক্রম, পিএসসি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম মোঃ ইসহাক মিয়া এবং মাতার নাম মরহুমা মেহেরুন্নেছা। লোহাগাড়ার প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঐতিহ্যবাহী চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় তিনি দাখিল পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। ১৯৭০ সালে তিনি ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। এ প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি ১৯৭৫ সালে এসএসসি এবং ১৯৭৭ সালে এইচএসসি কৃতিত্বের সাথে পাস করেন।

১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ২ বছর পর বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমীতে প্রশিক্ষণ শেষে ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কমিশন প্রাপ্ত হন। সেনাবাহিনীতে তিনি মেধাবী, সাহসী ও নিষ্ঠাবান একজন অফিসার হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৯৫-৯৬ সালে গোলযোগপূর্ণ পার্বত্য চট্টগ্রামে দায়িত্ব পালনকালে তিনি বুদ্ধিমত্তা ও বহুমুখী প্রতিভার সাক্ষর রাখেন। তাঁর বিচক্ষণতায় সেখানে অনেক জটিল ও কঠিন সমস্যা শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান হয়েছে। এসব বীরত্বপূর্ণ সাহসিক কর্মকান্ডের জন্য তিনি **"বীর বিক্রম"** খেতাবে ভূষিত হন। জাতিসংঘ শান্তি মিশনের দায়িত্ব থাকাকালীন সময়ে তিনি একজন বিচক্ষণ সেনা কর্মকর্তা হিসেবে প্রশংসিত হয়েছেন। জাতিসংঘ শান্তি মিশন থেকে দেশে ফিরে আসার পর তাঁকে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদে পদোন্নতি দেয়া হয়। একজন বিচক্ষণ, মেধাবী ও বিশ্বস্ত সেনা কর্মকর্তা হিসেবে তিনি সরকারের আস্থাভাজন হয়ে উঠেন। যার ফলে ২০০৯ সালের জানুয়ারী মাসে তাঁকে এসএসএফ'র মহা-পরিচালক পদে নিযুক্ত করা হয়। ঐ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁকে মেজর জেনারেল পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়। পরবর্তীতে তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সামরিক সচিব নিযুক্ত হন। তিনি এলাকায় তাঁর মা'র স্মরণে চুনতি মেহেরুন্নেছা প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। চুনতিসহ লোহাগাড়ার উন্নয়নের তিনি অবদান রেখেছেন।

শিল্পী হালিমা খান (বেলা খান)

হালিমা খান (বেলা খান) ১৯৪৮ সালে চট্টগ্রাম জেলার কোতোয়ালী থানার দেওয়ান বাজারস্থ রুমঘাটায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক বাড়ি লোহাগাড়ার ঐতিহাসিক চুনতি গ্রামে। তাঁর পিতার নাম মাওলানা হেফাজতুর রহমান খান (বি.এ, বিএল) এবং মাতার নাম খোদেজা খানম। ঐতিহাসিক চুনতি খান ছিদ্দিকী পরিবারের বংশধর বেলা খানের শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচএসসি। ১৯৬৭ সালে তিনি আমিরাবাদ মল্লিক ছোবহান এলাকার নুরুল আলম চৌধুরীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর স্বামী এম এইচ নুরুল আলম চৌধুরী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁদের সংসারে এক ছেলে ও এক মেয়ে। ছেলের নাম নিজাম উদ্দীন আহমদ চৌধুরী ও মেয়ের নাম নুছরত শারমিন মমতা চৌধুরী।

বর্তমানে বেলা খান তাঁর স্বামীর প্রতিষ্ঠিত এমএইচ নুরুল আলম চৌধুরী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও মাদারস চাইল্ড কেয়ার'র উপদেষ্টা। বেলা খান চতুর্থ শ্রেণিতে পড়াবস্থায় তাঁর শিল্পী জীবনের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৬২ সালে দেশের একজন শিল্পী হিসেবে তিনি গান পরিবেশন করেন। ১৯৬৮ সালে চট্টগ্রাম ও ঢাকা বেতারে এবং ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ বেতারে অনেকগুলো আধুনিক বাংলা গান ও পল্লীগীতি গেয়েছেন। ভারতের কলিকাতায় "His Masters Voice"-এ তাঁর ১২টি পল্লীগীতি গান রেকর্ড হয়। তাঁর বিবাহের আগেই এসব গান রেকর্ড হয়। ঐ

সময়ে কলিকাতা ও বাংলাদেশে গানগুলো বেতারে বেশি প্রচারিত হতো। বর্তমানে দেশে চট্টগ্রাম বেতার ও সিটিভি-তে মাঝে মধ্যে গানগুলো প্রচার হয়। চট্টগ্রাম বেতারে ও সিটিভি-তে হামদ্, নাত ও ইসলামী সংগীতও তিনি গেয়েছেন। তাঁর পল্লীগীতি গানগুলো বেশ জনপ্রিয়। এখনো তাঁর কণ্ঠ শ্রুতিমধুর। অনুরোধের প্রেক্ষিতে এলাকার সামাজিক অনুষ্ঠানে তিনি গান গেয়ে থাকেন। তাঁর পল্লীগীতি গানগুলোর গীতিকার ছিলেন তাঁর বাবা মাওলানা হেফাজতুর রহমান খান। নিম্নে তাঁর কয়েকটি গানের অংশবিশেষ তুলে ধরা হলো-

১. "কেমন কইর‍্যা যাইতাম শ্বশুর বাড়ি
ষোল বছর পরে আমার মা-বাপের ছাড়ি।"

- গীতিকার মাওলানা হেফাজতুর রহমান খান

২. "আরে ও পরানের মাঝি রে
আমার চাঁটগা কত সুন্দর।"

- গীতিকার মরিয়ম বেগম

৩. "শুনতে আসি তোমার বাঁশি
হল এ কি দায়।"

৪. "গাছের ডালে রইস্যা কোকিল
কুহু কুহু করে।"

Chunati.com
Pioneer in village based website

ষোড়শ অধ্যায়

চুনতি ডট কম

চুনতি কেবল একটি গ্রাম নয়, একটি সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক জনপদ। চুনতি হচ্ছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, শিক্ষা- সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, সভ্যতা ও আধ্যাত্মিকতার সংমিশ্রণে এক শিল্পিত মোহনা। এমন একটি স্বাতন্ত্র্যসূচক গ্রামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা এবং বিশ্বের কাছে চুনতিকে তুলে ধরার জন্য চুনতি ডট কম'র যাত্রা। এছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা চুনতিবাসীদের নিজদের মধ্যে ভাব আদান-প্রদান ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে সুদৃঢ় করার নিমিত্তে গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয় চুনতি ডট কম'র। কিছু উদ্যমী তরুণ ও প্রবীণদের অদম্য আকাঙ্খা- নিরলস পরিশ্রম এবং চুনতিবাসীর অনুপ্রেরণা ও অফুরন্ত ভালোবাসা নিয়ে ২০০৬ সালে মার্চ মাসে চুনতি ডট কম'র কাজ শুরু হয়। চুনতি ডট কম'র প্রতিষ্ঠাতারা হলেন- কাজী লতিফুল ইসলাম ও কাজী শরিফুল ইসলাম।

চুনতি গ্রামের লোক শিক্ষিত। অন্যদিকে চুনতি ইতিহাস-ঐতিহ্য সমৃদ্ধ একটি গ্রাম। তাই গ্রামটিকে নিয়ে ওয়েবসাইটের কাজ করতে হয় যথেষ্ট শুদ্ধতা ও সতর্কতার সাথে। ওয়েবসাইট গঠনের কাজটি অত্যন্ত নির্ভুল ও সঠিকভাবে করার জন্য সব ধরণের পদক্ষেপ নেয়া হয়। এলাকার ইতিহাস গবেষক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও এলাকার ক্লাবসমূহের নেতৃবৃন্দের সাথে করা হয় বৈঠক। চুনতির প্রয়াত বুর্জুগানেদ্বীন ও মহৎ ব্যক্তিদের জীবনী সংগ্রহ করতে সহযোগিতা নেয়া হয় লেখক ও গবেষকদের। এভাবে করে সবার সহযোগিতা ও নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে চুনতি ডট কম'র কাজ সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। প্রখর মেধাবী নবীন চিত্র শিল্পী হালিম দক্ষতার সাথে তৈরি করে পেজ ব্যানার। যা সার্ভারে আপলোড করা হয়। অবশেষে ২০০৬ সালের ১ জুন চুনতি ডট কম'র আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। এ সময়ে বাংলাদেশে আর কোন গ্রামকে নিয়ে ওয়েবসাইট তৈরি হয়েছিল কিনা তার কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। ফলে ইতিহাসের পাতায় স্থান পায় চুনতি ডট কম। বাংলাদেশের প্রথম গ্রাম ভিত্তিক ওয়েবসাইট হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

চুনতি ডট কম'র সুনাম ক্রমান্বয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। বর্তমানে এ ওয়েবসাইট একটি নিরপেক্ষ মঞ্চ হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। সারা দেশসহ সমগ্র পৃথিবীতে চুনতি ডট কম উচ্চ মর্যাদার আসনে সমাসীন হয়েছে। যাঁদের প্রচেষ্টা ও অনুপ্রেরণায় চুনতি ডট কম সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। তাঁরা হলেন- আবুল বাসেত (দুলাল), ছাইফুল হুদা ছিদ্দিকী, কাসসাফুল হক শেহজাদ, জাহেদুর রহমান, আশিকুর রহমান, কাজী আরিফুল ইসলাম, আছিমুল্লাহ নাবিল, মায়মুনা মুসারাত, গালিব ইমতিয়াজ, ইসহাক খান মুকুট, আব্দুল হালিম, কাজী রাকিবুল ইসলাম, মোঃ ইসমাইল মানিক, নাইম নিমু, মিজান উদ্দীন বাবু, ইঞ্জিনিয়ার মিনহাজুল আরেফীন, মরহুম আজিজুল ওয়াদুদ (হেলাল), শাহাদাত খান ছিদ্দিকী, রবিউল হাসান (আশিক) ও কবি আদনান সাকিবসহ অনেকেই। এর মধ্যে চুনতি ডট কম'র তথ্য ভান্ডার ভরপুর হয়ে যায়। এ

অবস্থায় ২০০৬ সালের ২২ ডিসেম্বর চুনতি মুন্সেফ বাজারে প্রজেক্টরে দেখানোর মধ্য দিয়ে চুনতি ডট কম'র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন চুনতি ডট কম'র প্রতিষ্ঠাতাদ্বয়ের পিতা কাজী বশির আহমেদ।

সহায়ক গ্রন্থ

১. ভারতবর্ষের ইতিহাস, প্রগতি প্রকাশনা, মস্কো।
২. বাংলার ইতিহাস- সুলতানী আমল- প্রফেসর আবদুল করিম।
৩. বাংলার ইতিহাস- ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান।
৪. বাংলাদেশের ইতিহাস, নতুন সংস্করণ, ড. মুহাম্মদ আবদুর রহিম, ড. আবদুল মমিন চৌধুরী, ড. এ. বি. এম. মাহমুদ, ড. সিরাজুল ইসলাম।
৫. চট্টগ্রামের ইতিহাস- ড. আবদুল করিম।
৬. চট্টগ্রাম পরিক্রমা- নভেম্বর ২০১২, ইতিহাস, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও সাহিত্য বিষয়ক ষান্মাসিক পত্রিকা- সম্পাদক আহমদ মমতাজ।
০৭. চট্টগ্রামের ইতিহাস- জামাল উদ্দিন।
০৮. মোঘল সাম্রাজ্যের বিলুপ্ত অধ্যায় দোহাজারি- জামাল উদ্দিন।
০৯. Land Zoning Report, Lohagara Upazilla-2011.
১০. বাফা প্রকাশনা- ২০০১, ২০০৬ ও ২০১০ ইং।
১১. আনজুমন- ২০১০, ২০০ বছর পূর্তি সংখ্যা- চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদরাসা।
১২. রশ্মি-সাতকানিয়া সরকারি কলেজ বার্ষিকী-২০০১।
১৩. প্রচেয়, দীপিত প্রকাশনা, চুনতি, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
১৪. ভূমি ও মৃত্রিকা সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম সম্পাদক- মো: মুস্তাফিজুর রহমান।
১৫. ঐক্য- সাতকানিয়া-লোহাগাড়া বৌদ্ধ ঐক্য পরিষদ, সংবর্ধনা স্মারক-২০০৪, ২০০৮ ও ২০১৫।
১৬. জেলা তথ্য: চট্টগ্রাম, জুলাই-২০০৫ইং।
১৭. বিজয়বোধি স্মারক-২০১৪ইং।
১৮. অলিকুল শিরোমণি হযরত শাহ ছুফি পেঠান শাহ (রহ:) এর জীবনী ও কারামত। প্রকাশনায়: মাজার পরিচালনা কমিটি, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
১৯. হযরত আল্লামা শাহ মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার (রহ.)'র জীবন ও আদর্শ-মুহাম্মদ আবদুল হাই নদবী ও জাকিয়া সুফিয়ান।
২০. শানে ওয়াইসী-আহমুদুল ইসলাম চৌধুরী।
২১. আলোকিত ব্যাক্তিত্ব- আলহাজ্ব মোস্তাফিজুর রহমান- অধ্যাপক মোহাম্মদ ইলিয়াছ।

সপ্তদশ অধ্যায়

চিত্রে লোহাগাড়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য

Chunati.com

চিত্রে লোহাগাড়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য

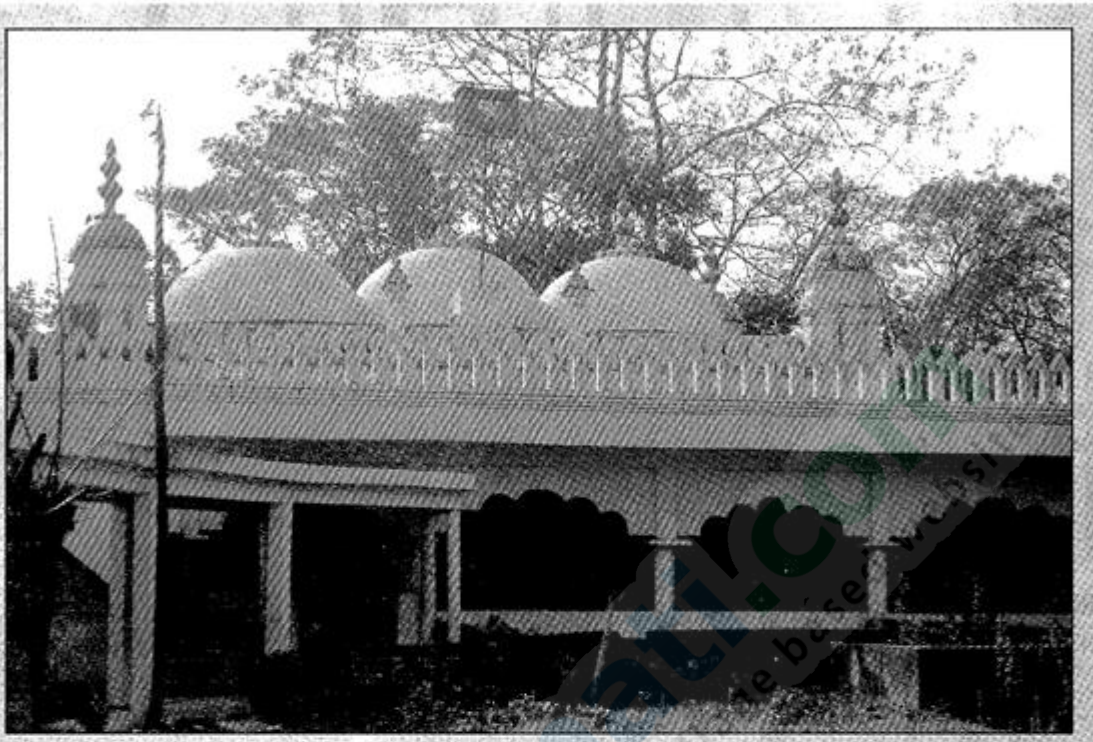

মল্লিক ছোবহান মো: খান নায়েব উজির জামে মসজিদ

চুনতি খান মসজিদ

চিত্রে লোহাগাড়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য

আধুনগর সংস্কারকৃত খাঁ'র মসজিদ

সাতগড় মাওলানা শাহ আতাউল্লাহ হোসাইনী (রহ.) প্রকাশ বুড়ো মাওলানার মাজার

চিত্রে লোহাগাড়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য

দরবেশ হাট এলাকায় অবস্থিত হযরত শাহপীর (রহ:) এর মাজার

চুনতি শাহ সাহেব কেবলা (রহ:) এর মাজার

চিত্রে লোহাগাড়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য

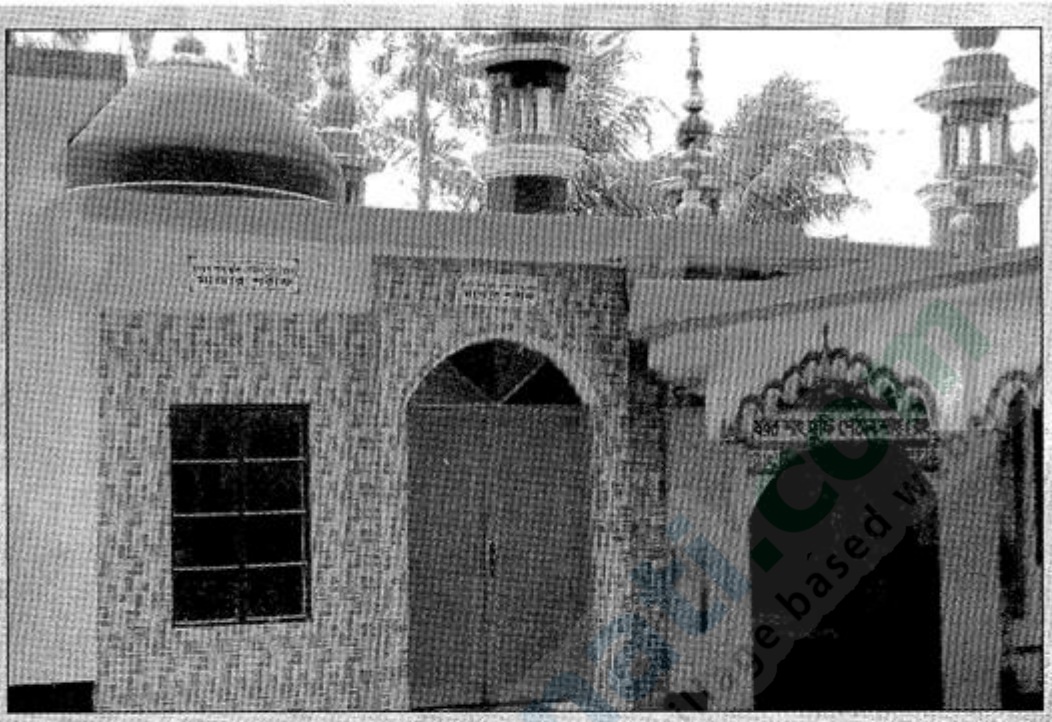

পদুয়া পেঠান শাহ (রহ:) এর মাজার

প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদরাসা

চিত্রে লোহাগাড়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য

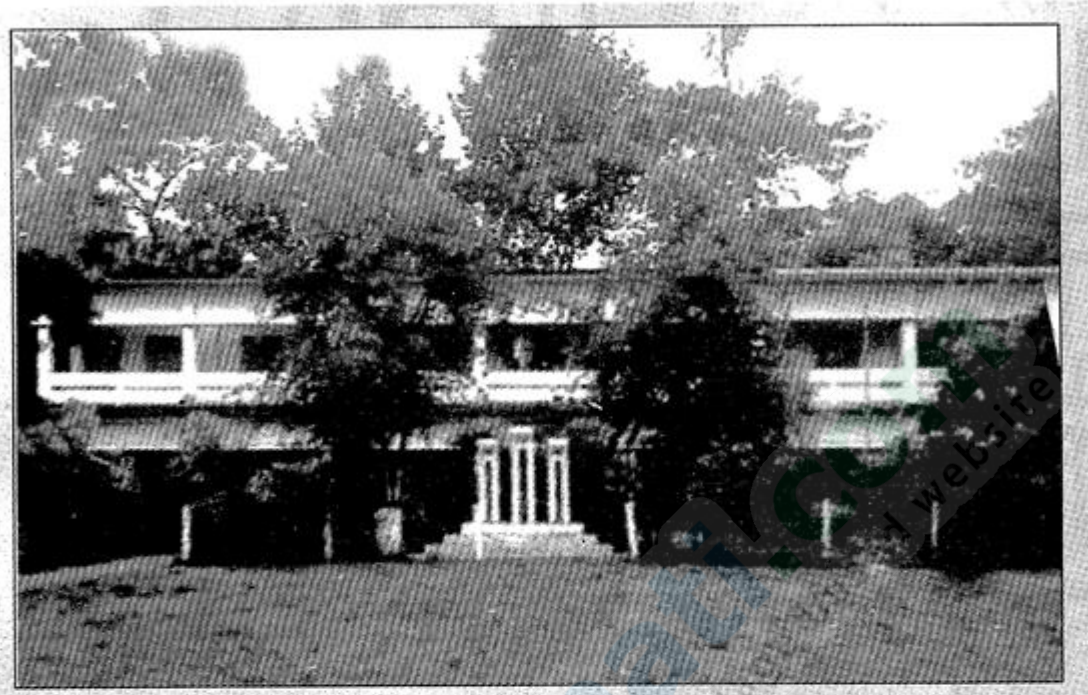

দক্ষিণ সাতকানিয়া গোলামবারী মডেল উচ্চ বিদ্যালয়

আধুনগর মছদিয়া জ্ঞান বিকাশ বিহার

চিত্রে লোহাগাড়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য

বড়হাতিয়া মগধেশ্বরী মন্দির

পূর্ব কলাউজান লক্ষণেরখীল ঠাকুর বিহার

চিত্রে লোহাগাড়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য

পূর্ব কলাউজান লক্ষণেরখীল ঠাকুর পাহাড়

আমিরাবাদ মুল্লুক শাহ (রহ:) দিঘি

চিত্রে লোহাগাড়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য

বড়হাতিয়া মগদিঘি

পুটিবিলা গৌড়স্থানে গৌড় সাম্রাজ্যের পুকুর

চিত্রে লোহাগাড়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য

পুটিবিলা কংসনালা দিঘি

লোহাগাড়ার লোহার দিঘির পাড়সহ অংশ

চিত্রে লোহাগাড়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য

পূর্ব কলাউজানের প্রায় ৪শ বছরের অধিক বয়সী গাব গাছ

লোহাগাড়ার ডলু খাল

চিত্রে লোহাগাড়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য

লোহাগাড়ার টংকা খাল

গৌড়স্থানের গৌড় সাম্রাজ্যের ঝিদিঘি

চিত্রে লোহাগাড়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য

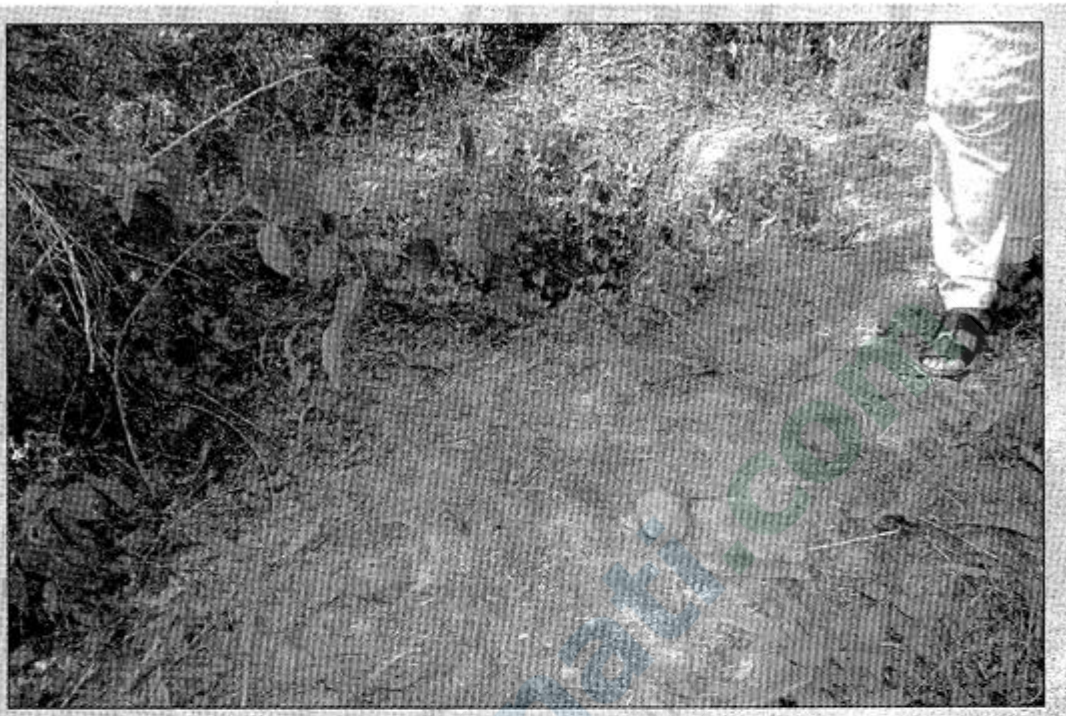

গৌড়স্থানের গৌড় রাজার দুর্গের স্থানের অংশ

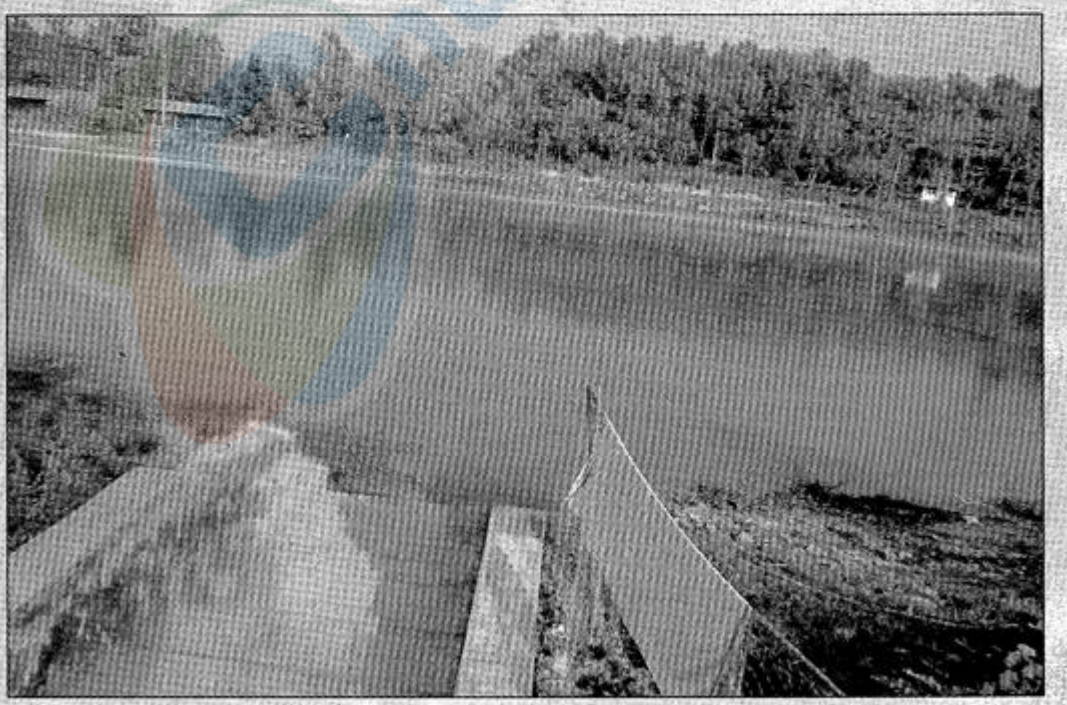

চুনতির খাঁ'র দিঘি

চিত্রে লোহাগাড়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য

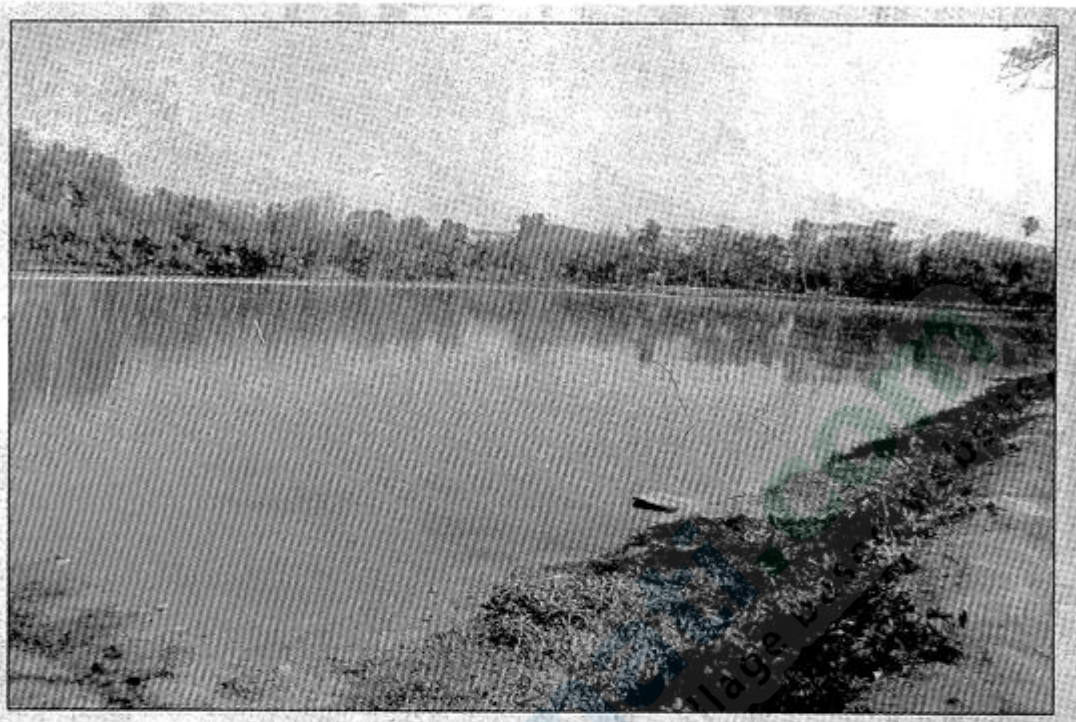

মছদিয়া খাঁ'র দিঘি

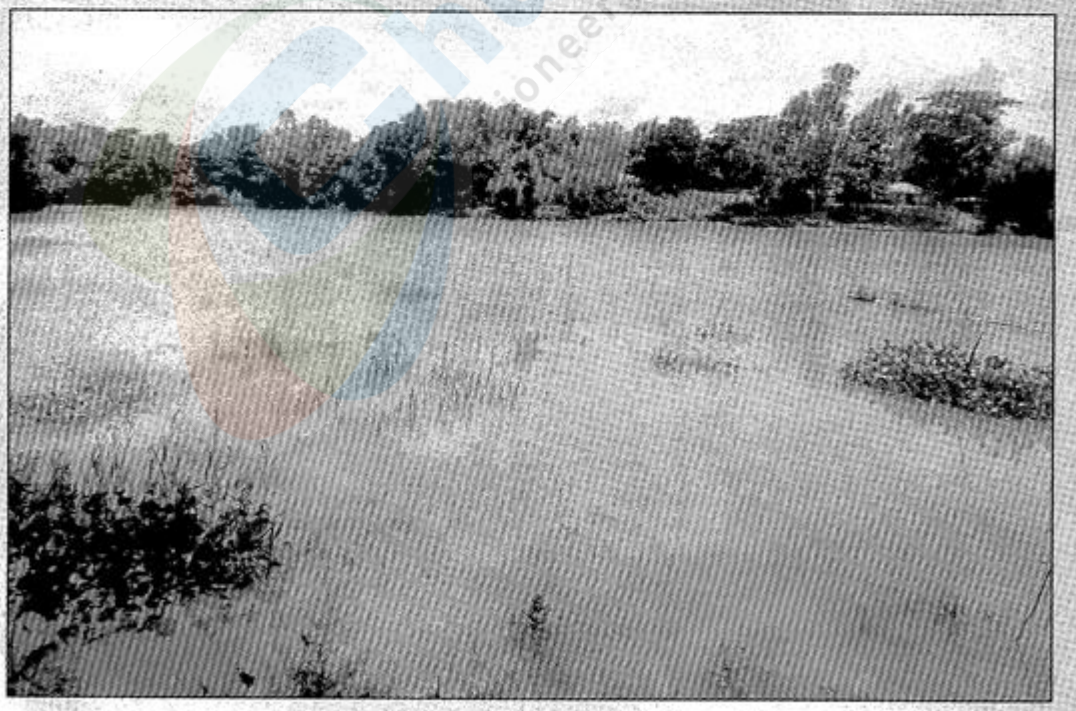

আধুনগর ও চুনতির সংযোগস্থলে অবস্থিত কাজীর ডেবা

চিত্রে লোহাগাড়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য

চুনতি হাজী রাস্তার ঐতিহাসিক রাফিয়া মুড়া

চুনতি বন্য প্রাণী অভয়ারণ্য

চিত্রে লোহাগাড়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য

আমিরাবাদস্থ চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহসড়কের পাশে হযরত শাহ সুফী ফতেহ আলী ওয়াইসী (রহ:)'র তোরণ

চুনতি বড় ও ছোট মিয়াজি মসজিদ

চিত্রে লোহাগাড়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য

চুনতি আউলিয়া মসজিদ

হযরত মাওলানা আবদুল হাকিম (রহ:)'র মাজার সংলগ্ন মসজিদ

চিত্রে লোহাগাড়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য

হযরত মাওলানা আবদুল হাকিম (রহ:) ও নাছির উদ্দিন খান ডেপুটির মাজার শরীফ

আমিরাবাদে অবস্থিত হযরত শাহ সুফী মাওলানা মুছা কলিমুল্লাহ (রহ:)'র মাজার

চিত্রে লোহাগাড়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য

রাজকুমার শাহ সুজা চুনতির এ পাহাড়ে অবস্থান নেন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে
কবি সুফিয়া কামাল, ১৯৭০

দ্বিতীয় স্বামী কামাল উদ্দিন আহমদ খানের সাথে
কবি সুফিয়া কামাল, ১৯৩৯

চিত্রে লোহাগাড়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য

হযরত শাহ সুফী পেঠান শাহ (রহ:)

হযরত মাওলানা শাহ হাফেজ আহমদ (রহ:)

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ:)

হযরত শাহ সুফী মাওলানা আবদুল জব্বার (রহ:)

মাওলানা হাবিব আহমদ (রহ:)

হযরত শাহ সুফী মাওলানা মো: কুতুব উদ্দীন

চিত্রে লোহাগাড়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য

সেক্টর কমান্ডার মেজর শহীদ নাজমুল হক

আলহাজ্ব মোস্তাফিজুর রহমান সওদাগর

আলহাজ্ব মো: নুরুল ইসলাম

মেজর জেনারেল মিয়া মো: জয়নাল আবেদীন
বীর বিক্রম, পিএসসি

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

০১. উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসন, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

০২. আলহাজ্ব মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী
সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

০৩. প্রতিপদ দেওয়ান
উপজেলা প্রকৌশলী, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

০৪. মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম
উপজেলা কৃষি অফিসার, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

০৫. গবেষক ও কলামিস্ট আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী, চট্টগ্রাম

০৬. আলহাজ্ব শফিক উদ্দিন
ভাইস চেয়ারম্যান মোস্তফা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ, চট্টগ্রাম

০৭. আলহাজ্ব হেলাল হুমায়ূন
ব্যুরো চীফ দৈনিক নয়া দিগন্ত ও প্রতিষ্ঠাতা আল হেলাল আদর্শ ডিগ্রী কলেজ সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম

০৮. ড. আবুল আলা মুহাম্মদ হোছামুদ্দিন
আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন, চট্টগ্রাম

০৯. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী
সহ-সম্পাদক মাসিক দ্বীন দুনিয়া, বায়তুশ শরফ, চ...

১০. আলহাজ্ব মর্তূজা সিদ্দিক চৌধুরী, চেয়ারম্যান ম...
পরিচালক, ফাস্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক ও ই... ...াংক লিমিটেড

১১. মাওলানা মুহাম্মদ হাফিজুল হক নিজামী
অধ্যক্ষ, চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, লোহাগাড়া, ...গ্রাম

১২. আলহাজ্ব মাহমুদুল হক পেয়ারু
চেয়ারম্যান, হক ইন্টারন্যাশনাল, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

১৩. মোহাম্মদ ফোরকান উল্লাহ চৌধুরী
সভাপতি দক্ষিণ সাতকানিয়া গোলামবারী মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম ও পরিচালক Unity Style & Accessories Ltd.

১৪. মাওলানা মুহাম্মদ হাসান রউফী
ভাইস চেয়ারম্যান, লোহাগাড়া সিটি হাসপাতাল লিঃ, চট্টগ্রাম

১৫. আলহাজ্ব মোহাম্মদ ইসমাইল
সাধারণ সম্পাদক, আমিরাবাদ দায়েমিয়া মুসলিম এতিমখানা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

১৬. মো: জাহেদুর রহমান
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, আইআইইউসি, চট্টগ্রাম

১৭. অধ্যাপক আমিন আহমদ খান জুনু মিয়া
ডেপুটি বাড়ি, চুনতি, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

১৮ মো: নাছির উদ্দিন কবির
চুনতি, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

১৯. কাজী আরিফুল ইসলাম
প্রোপাইটর, ইসলামাবাদ ট্রান্সপোর্ট এন্ড ট্রেডিং এজেন্সি, চট্টগ্রাম

২০. গোপাল কান্তি বড়ুয়া
সাধারণ সম্পাদক, সাতকানিয়া-লোহাগাড়া বৌদ্ধ ঐক্য পরিষদ, চট্টগ্রাম

২১. মুহাম্মদ জুনাইদ
চেয়ারম্যান ১নং বড়হাতিয়া ইউনিয়ন পরিষদ, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

২২. লিয়াকত আলী চৌধুরী
চেয়ারম্যান ৩নং পদুয়া ইউনিয়ন পরিষদ, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

২৩. অধ্যাপক মো. সাদত উল্লাহ
চেয়ারম্যান, ৪নং চরম্বা ইউনিয়ন পরিষদ, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

২৪. আবদুল ওয়াহেদ
চেয়ারম্যান, ৫নং কলাউজান ইউনিয়ন পরিষদ, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

২৫. আলহাজ্ব নুরুচ্ছাফা চৌধুরী
চেয়ারম্যান, ৬নং লোহাগাড়া ইউনিয়ন পরিষদ, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

২৬. ফরিদুল আলম
চেয়ারম্যান, ৭নং পুটিবিলা ইউনিয়ন পরিষদ, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

২৭. মো: জয়নুল আবেদীন
চেয়ারম্যান, ৮নং চুনতি ইউনিয়ন পরিষদ, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

২৮. মো: আইয়ুব মিয়া
চেয়ারম্যান, ৯নং আধুনগর ইউনিয়ন পরিষদ, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

২৯. ইসমাঈল আনজুমান আরা ওয়েল ফেয়ার ট্রাষ্ট
আধুনগর, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

৩০. বিসিআইসি ও বিএডিসি সার ডিলার
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

লেখক পরিচিতি

মোহাম্মদ ইলিয়াছ ১৯৬৯ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার বাঁশখালী পৌরসভার উত্তর জলদী নেয়াজর পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম মাওলানা মোজাহেরুল হক ও মাতার নাম তামান্নাহার। তিনি বাঁশখালীর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা, বাঁশখালী বহুমুখী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এস.এস.সি, সাতকানিয়া সরকারি কলেজ থেকে এইচ.এস.সি এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এসসি (অনার্স) ও এম.এসসি ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৯৫ সালে চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলা সদরস্থ আলহাজ্ব মোস্তফিজুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে গণিত বিষয়ে প্রভাষক পদে কর্মস্থলে যোগদান করেন। বর্তমানে ওই কলেজের সহযোগী অধ্যাপক। ১৯৯৯ সালে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে, ২০০৯ সালে ঢাকার বিএসবি ফাউন্ডেশন কর্তৃক ও ২০১৪ সালে উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচিত হন। কুমিল্লার কোটবাড়িতে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে A+ পেয়ে ২য় স্থান অর্জন করেন। ব্যবসায়িক গণিত ও পরিসংখ্যান বই, আলোকিত ব্যক্তিত্ব আলহাজ্ব মোস্তাফিজুর রহমান স্মারক গ্রন্থ, লোহাগাড়া উপজেলার ২০১৪ সালের কৃতি শিক্ষার্থী প্রকাশনা "স্মরণপট" বইয়ের লেখক।

লেখক মোহাম্মদ ইলিয়াছ চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিষয়ের পরীক্ষক এবং এলজিএসপি-২'র লোহাগাড়া উপজেলার প্রশিক্ষক। ২০০৩ সালে বাঁশখালী উপজেলা পর্যায়ে বৃক্ষরোপন আন্দোলনে ১ম স্থান অর্জন করেন। এছাড়াও তিনি চট্টগ্রামের দৈনিক পূর্বকোণ, সাপ্তাহিক রোববার ও দৈনিক ইত্তেফাকসহ বিভিন্ন স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকার নিয়মিত লেখক। অন্যদিকে পরিবেশবাদী সংস্থা গ্রীণ পিস ও হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ বাংলাদেশসহ বিভিন্ন সামাজিক ও মানবাধিকার সংস্থার সাথে জড়িত।

লোহাগাড়া দক্ষিণ সাতকানিয়া গোলামবারী মডেল উচ্চবিদ্যালয় ও লোহাগাড়া নজুমুন্নিছা আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির সদস্য ছিলেন তিনি। বর্তমানে লোহাগাড়া উপজেলা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি দুই কন্যা ও দুই পুত্র সন্তানের জনক।